আধুনিক বাংলা কবিতায় নগর এবং নাগরিকতা ঃ তিনজন বাংলা কবি

তপতী বর্মণ

[illegible]

গবেষণা পরিচালক ঃ ড. ক্ষেত্র গুপ্ত

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ. ডি.
ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

১৯৯৩

Ref
80.1
ಎಸ್/ಎಸ್ಟ

148827

31 OCT 2002

STOCK TAKING - 2011

॥ মুখবন্ধ ॥

আধুনিক কালের বাংলা কবিতার একটি প্রধান লক্ষণ নাগরিকতা। এই নাগরিকতার দুটি দিক - ১। কবিদের বিশিষ্ট নাগরিক মনোভাব। ২। বিষয়বস্তু হিসেবে নগর (নাগরিক প্রকৃতি, পরিবেশ, জীবনযাত্রা প্রভৃতি)কে অবলম্বন করা। নাগরিক মনোভাব পুরোনো দিনের কবিতায়ও দুষ্প্রাপ্য ছিল না–উদাহরণ হিসেবে রাজসভার কবি বিদ্যাপতি বা ভারতচন্দ্র রায়ের নাম করা যেতে পারে। একালেও প্রমথ চৌধুরী তাঁর কবিতার বিষয়বস্তুতে সুনির্দিষ্টভাবে নাগরিক উপাদান ব্যবহার না করলেও নাগরিক দৃষ্টিভঙ্গী সর্বত্র বজায় রেখেছেন।

উনবিংশ শতাব্দী থেকেই একালের কবিরা বিশেষভাবে নগর সভ্যতার লোক বলে অল্পাধিক নাগরিক মনোভাবে বশীভূত। রোমান্টিক লিরিকের কবিরা প্রথম পল্লীবিষয়ে ব্যাকুলতা অনুভব করেছিলেন, এটা ক্রমে বেড়ে যায় এবং বাংলা কবিতার আন্তরিক উপলব্ধি হিসেবে যেমন, তেমনি ফ্যাসন হিসেবেও নগর বিমুখ পল্লীময় নিসর্গবোধ ব্যাপকতা পেতে থাকে। রবীন্দ্র পরবর্তী আধুনিকেরা প্রায় দলবদ্ধ ভাবে এই পল্লীব্যাকুলতার বিরুদ্ধে দাঁড়ান। অবশ্যই সবাই সমান ভাবে নয়।

এই ভাবনার পটভূমিতে আমরা বর্তমান শতাব্দীর চার থেকে সাতের দশকের বিশেষ তিনজন কবিকে নির্বাচন করেছি। তাঁদের কবিতায় নাগরিক বোধ এবং বিষয়বস্তু হিসেবে নগরের ব্যবহার বিশেষ ভূমিকা নিয়ে দেখা দিয়েছে। সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এই তিনজন কবির রচনার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আমরা একালের বাংলা কবিতার একটি বিশেষ প্রবণতার পাঠ গ্রহণ করব এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি বিশেষ

:: ::

প্রবণতা ভিন্ন ভিন্ন কবির ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়ে কিভাবে নব নব রূপ ধারণ করে তারও পরিচয় নেব। কবিতার শিল্প সাফল্য তথা এসথেটিক মূল্য নিরূপণ করা আমাদের বর্তমান গবেষণার লক্ষ্য নয়। কবিদের বিশিষ্ট প্রবণতা তথা সমাজচৈতন্য সময়ের এবং তাঁদের ব্যক্তি-সত্তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় কি রূপ ধারণ করে তাই আমাদের সন্ধানের বিষয়॥

.....

॥ সূচীপত্র ॥

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

:: ভূমিকা ::..... ১

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

:: সমর সেন :: ১৫

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

:: সুভাষ মুখোপাধ্যায় :: ১৮

॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥

:: নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী :: ১৭৬

॥ পঞ্চম অধ্যায় ॥

তিন কবি : একটি তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ :... ২৩৭

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥ ২৪৫

.....

।। প্রথম অধ্যায় ।।

:: ভূমিকা ::

॥ এক ॥

:: বাংলা কবিতায় নগর ও গ্রাম : ঐতিহ্যের বিচার ::

আধুনিক পূর্ব বাংলা কবিতার নগর এবং নাগরিক মানসিকতার স্থান আলোচনা করতে গেলে তাকে দুটি যুগে ভাগ করে দেখা সংগত। ১। পুরাতন কবিতার যুগ ২। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত একালের কবিতা। এখানে উল্লেখ থাকে যে আধুনিক শব্দটি বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা রবীন্দ্রোত্তর যুগের সঙ্গে সমার্থক করে দেখছি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আধুনিক শব্দটি দুরকম অর্থেই প্রচলিত। তুর্কী বিজয় থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ; উনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু করে সাহিত্যের ইতিহাসের আধুনিক পর্যায়। এইভাবে দুই যুগে ভাগ করে দেখবার রীতি প্রচলিত আছে। কিন্তু পাশাপাশি আধুনিক শব্দটি অন্য একটি তাৎপর্য বহন করে — রবীন্দ্র প্রভাব পরবর্তী বাংলা সাহিত্যকে আধুনিক যুগের সাহিত্য বলা হয়। অবশ্যই মধুসূদন এবং জীবনানন্দ দুজনে একই অর্থে আধুনিক নয়। আমরা বর্তমান আলোচনা-সন্দর্ভে আধুনিক বাংলা সাহিত্য বলতে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যকে বুঝিয়েছি। শব্দটির এই অর্থ তাৎপর্য সুবিদিত এবং সুপ্রচলিত। কাজেই বিস্তৃত ভাবে কারণ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

বাংলা কবিতার রবীন্দ্রোত্তর কালে একটি বিশেষ প্রবণতা কয়েকজন কবির মধ্যে কি রূপ ধারণ করেছে সে বিষয়ে যথার্থ পরিচয় গ্রহণ করতে হলে শুরুতে পশ্চাত-দৃষ্টি প্রয়োজন। মধ্যযুগে বাংলা কবিতার এই বিশেষ প্রবণতা অর্থাৎ নগর প্রসঙ্গ এবং নগর মনস্কতা ছিল কিনা এবং থাকলে তার স্বরূপ কি সেই বিষয়টির পর্যালোচনা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত

উনবিংশ শতাব্দী থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত উক্ত বিষয় এবং মনোভাব বাংলা কবিতায় কি ধরণের স্থান লাভ করেছে তাও ভেবে দেখা দরকার।

তুর্কী বিজয় পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের যে আয়োজন তার মধ্যে রামায়ণ-মহাভারতাদির অনুবাদ, মঙ্গলকাব্য এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রাধান্য। আমরা এই জাতীয় রচনাগুলির মধ্যেই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখব। সে যুগে সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন রাজসভা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং জনমণ্ডল। ছোট বড় ভূস্বামীরা কাব্য রচনায় কবিদের উৎসাহিত করেছেন, অর্থনৈতিক আনুকূল্য দেখিয়েছেন। কৃত্তিবাস কোন গৌড়েশ্বরের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন, মালাধর বসু রুকনুদ্দিন বরবক শাহর আনুকূল্য পেয়েছিলেন, পরাগল খাঁ এবং ছুটি খাঁর রাজসভার কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং শ্রীকর নন্দী। আরাকানের মগ রাজাদের অমাত্যরা দৌলত কাজী-আলাওলের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। মৈথিল কবি বিদ্যাপতি মিথিলায় একাধিক রাজার রাজসভায় অবস্থান করেছেন। ভূস্বামী বাঁকুড়া রায়- রঘুনাথ রায়ের আনুকূল্যে মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল রচিত। কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাকবি ছিলেন ভারতচন্দ্র। এরূপ আরো উল্লেখ করা সম্ভব।

রাজসভাকে কেন্দ্র করে সেকালীন নগর গড়ে উঠত। একারণে রাজসভার কবিদের রচনায় নাগরিকতা কিছুটা থাকা সম্ভব বলে মনে হয়। অবশ্য বড় রাজার বড় রাজধানীর কথা বাদ দিলে ক্ষুদ্র ভূস্বামীর অবস্থানকে নগর বলে মনে করা যেত না। সেগুলো গ্রাম-গঞ্জেরই বৃহৎ সংস্করণ ছিল। মুকুন্দ চক্রবর্তীর অবস্থান কোন আঞ্চলিক ভূস্বামীর

তথাকথিত নগরোপম গ্রামে হলেও তাঁর লেখায় অন্য পাঁচজন মঙ্গলকাব্যের কবিদের তুলনায় নাগরিক মনোভাবের আধিক্য নেই। অবশ্য কালকেতুর গুজরাট নগর নির্মাণ প্রসঙ্গে বা হাটের বর্ণনায় সেকালীন নগরের একটি চিত্র তিনি কাব্যমধ্যে স্থাপিত করেছেন। ভারতচন্দ্রের প্রতিপালক কৃষ্ণচন্দ্র তুলনায় বড় মাপের ভূস্বামী ছিলেন কিনা বলা যায় না কিন্তু মোগল যুগের বিলাস ব্যসন, আদব-কায়দা সেই সভায় পড়েছিল এবং ভারতচন্দ্রের মনের মধ্যে পরিশীলিত নাগরিকতা এমন একটা মাত্রা এনে দিয়েছিল যা মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে খুব সুলভ ছিল না। অধিকাংশ সমালোচকই তাঁর পরিশীলিত ভাষারীতিতে এবং অলংকার ব্যবহারে নাগরিক মেজাজের প্রতিফলন লক্ষ করেছেন। তাঁর কাব্যে বর্ধমান রাজ্যের এবং দিল্লী নগরীর যে প্রাসঙ্গিক বর্ণনা আছে তার মধ্যেও কিন্তু নগরজীবনের বস্তুনিষ্ঠ রূপ অনেকখানি ধরা পড়েছে।

তুলনামূলকভাবে অনুবাদ কাব্যের কবিরা বড়রাজাদের আনুকূল্য লাভ করেছিলেন। অনুবাদ কর্মে তাঁদের অনেকেরই নিপুণতা তথা পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে। মালাধর বসু থেকে শুরু করে সৈয়দ আলাওল পর্যন্ত কাউকেই প্রায় জনমনোহারী কবি বলা যায় না। মালাধর বসু মূল ভাগবতের খুব কাছে তাঁর অনুবাদকে রেখেছিলেন। কবীন্দ্র ও শ্রীকরণ মুসলমান সেনাপতিদের মনোরঞ্জনের জন্য কাব্যানুবাদ করেছিলেন। দৌলত-কাজী আলাওলে উচ্চতর শিল্পমনের যে পরিচয় আছে তা মগন ঠাকুর প্রমুখ আমাত্যদের ও অন্যান্য সভাসদদের মনোরঞ্জনের জন্যেই পরিকল্পিত। কৃত্তিবাসের প্রসঙ্গ আনা হোল না একটাই কারণে অসাধারণ জনপ্রিয়তার জন্য তাঁর রচনার যে নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে, তাতে জনসাধারণের জীবন, বিশ্বাস ও সংস্কারের প্রভূত উপকরণ স্থান পেয়েছে– উচ্চস্তরের নাগরিক বৈদগ্ধ্য প্রায় কোথাও অবশিষ্ট নেই।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি অংশ জুড়ে এই ভাবে যে নাগরিক ও অর্ধ-নাগরিক মানসিকতার প্রকাশ দেখি তার স্বাতন্ত্র্য আরো ভাল ভাবে অনুভব করা যায় মঙ্গলকাব্যের গ্রামীণতার সঙ্গে তুলনা করলে। অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যেই বাংলার গ্রাম জীবনের সরল বাস্তবতা প্রতিফলিত। পৌত্তলিক আচার-আচরণে, পারিবারিক বন্ধনে, জীবনের জাত কর্ম থেকে প্রেত কর্ম পর্যন্ত সর্বত্র, নারীর পতিনিন্দা থেকে বিবাহবাসর পর্যন্ত প্রতি স্তরে গ্রাম জীবনের সত্য ছবি আছে।

বৈষ্ণব পদাবলীতে গ্রামের প্রকৃতি ও জীবন যেমন সত্য, তেমনি সত্য বৈষ্ণব ধর্ম সাধনার পান্ডিত্য পূর্ণ উৎকর্ষের প্রভাব। এ অনেক বৈষ্ণব কবি তত্ত্ববিদ ছিলেন এবং অজস্র বৈষ্ণব আখড়া ও আশ্রমে দেশ পূর্ণ ছিল। সাধারণ ভাবে গ্রামীণ পরিবেশে অবস্থিত হলেও শাস্ত্রানুচর্চায় ও সাধন ভজনের বিশিষ্টতার জন্য এগুলি নিজেদের চারপাশে পান্ডিত্যের একটি স্বতন্ত্র চৌহদ্দি তৈরী করেছিল।

বৈষ্ণব পদাবলীর অনেক কবি সাধক পন্ডিত ছিলেন- যেমন জ্ঞানদাস প্রমুখ, অনেকে ছিলেন না — যেমন চৈতন্য পূর্ব চন্ডীদাস প্রমুখ, কিন্তু কবিতা রচনার ক্ষেত্রে গ্রাম্য প্রকৃতি ভাব-ব্যাকুলতা, সরলতা এঁদের রচনায় পরিস্ফুট। আবার গোবিন্দ দাস প্রমুখ আরেক শ্রেণীর কবিতায় ভাষার পরিশীলিত রূপ-সৌকর্য–যার সঙ্গে নাগরিক বৈদগ্ধের সম্পর্ক বেশী তার নিদর্শন পাওয়া যায়। বৈষ্ণব মোহান্তরা এবং প্রধান সাধকবৃন্দ পুরী বৃন্দাবনের মত তীর্থকেন্দ্রিক নগরে বাস করতেন। এঁদের তত্ত্বভাবনার পেছনে এই নাগরিক অবস্থানের কিছু প্রভাব পড়েছিল বলে মনে হয়। প্রসঙ্গত: উল্লেখ থাকে যে চৈতন্য ভাগবতের কবি বৃন্দাবন দাস সেকালের বাংলার সমৃদ্ধ নগর ও বিদ্যাকেন্দ্র নবদ্বীপের বর্ণনায় উল্লাস প্রকাশ করেছেন।

মিথিলার বিদ্যাপতি বাংলার কবি ছিলেন না, কিন্তু বাঙালীর অতিপ্রিয় কবি ছিলেন। বড়ু চণ্ডীদাস সম্ভবতঃ তাঁর অল্প পরের লোক—বড়ুর পাত্র-পাত্রীর বর্ণনায়, পরিস্থিতির উদ্ভাবনে, বাংলার গ্রাম জন মাটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বিদ্যাপতির পদাবলী কিন্তু নাগরিক জীবন ও মনের পটভূমিতে অবস্থিত— বিদ্যাপতির কৃষ্ণ যেন রাজসভার অভিজাত নাগরিক, অপরপক্ষে বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ সমস্তরের ইন্দ্রিয়দুর্বল হলেও এক পল্লী যুবক।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক পরিচয় বিশ্লেষণ করে নগর ও পল্লীর পারস্পরিক ভূমিকাটি দেখিয়ে দেওয়া আমাদের বর্তমান আলোচনার লক্ষ্য নয়। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শনের সাহায্যে আমরা দেখাবার চেষ্টা করলাম যে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পল্লীজীবনের পাশাপাশি নগর জীবনের প্রকাশ বড় কম ছিল না। পল্লী কবির সরল প্রত্যক্ষ মনোভাবের পাশাপাশি নাগরিক পরিমার্জনা এবং বৈদগ্ধ বারংবার লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি কথা মনে হয় যে অভিজাত রাজসভা-আশ্রয়ী বিদগ্ধ কবিমণ্ডলী অথবা ধর্ম কেন্দ্র নির্ভর পণ্ডিতসাধক কবিরা কেউই গ্রামীণ সাধারণ মানুষের থেকে বহুদূরবর্তী ছিলেন না। যারাই কথকতার মধ্য দিয়ে পালাকীর্তনের আসরে, গেটমঙ্গলা বা ভাসানের গানে জনসাধারণের কাছে পৌঁছুতেন তাদেরই নাগরিক সীমাবদ্ধতা অনেক পরিমাণে মুক্ত হত। কীর্তনের আসরের মধ্য দিয়ে বিদ্যাপতি বা কথকতার মাধ্যমে কৃত্তিবাস নগর-গ্রাম নিরপেক্ষ সর্বস্তরের কবি হয়ে উঠেছিলেন। অবশ্য ভারতচন্দ্রের মত কবিকে সহজে আয়ত্ত করা গ্রামীণ শ্রোতাদের পক্ষে তত সহজ ছিল না—একারণে গোপাল উড়েদের যাত্রার মাধ্যমে তাঁকে তরল করে নিতে হয়েছিল।

এবারে আমরা বৃটিশ শাসন কালের বাংলা কবিতার কথায় আসছি। মোটামুটি ভাবে ১৮০০ সাল থেকে নব্য বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব ধরে নেওয়া যায়, অবশ্য তা সৃজনশীল সাহিত্য নয়। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার আগে যা লেখা হয়েছে তাকে ঠিক নব্য কবিতায় শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। নব্য কবিতার জন্মের আগেই কিন্তু বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে একটা গুরুতর পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। আমরা এখানে ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে নব্যযুগের সূচনা হল তার সাধারণ বৈশিষ্ট্য গুলি নিয়ে আলোচনা করছি না। কারণ আমাদের অভিসন্দর্ভের পক্ষে তার কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই। সে বিষয়ে আমাদের কোন নতুন পর্যবেক্ষণ নেই। এই পরিবর্তনের একটি মাত্র অর্থনৈতিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক ফলের দিকে আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করছি — তা হল কোলকাতা মহানগরীর অভ্যুত্থান। বৃটিশ যুগে কোলকাতা মহানগরীর অভ্যুত্থানের সঙ্গে পূর্ব পূর্ব যুগের নগর ও শহরের জন্মের কোন তুলনা হয় না। যদি আমরা বঙ্গদেশের দিকে লক্ষ করি তো দেখব মধ্যযুগ পর্যন্ত সারা বাংলাই সাহিত্যের উৎসভূমি ছিল। যেসব নগরকেন্দ্রিক সাহিত্যিকদের কথা বলেছি তাঁরাও গৌড়ের, চট্টগ্রামের কৃষ্ণনগরের, সীমানার বাইরেকার-মিথিলার বা রোসাঙে ছড়িয়ে ছিলেন। কতকগুলি ছিল রাজার রাজধানী নগরী, কতকগুলি ছিল তীর্থনগরী, কতকগুলি ভূস্বামীর অবস্থান কেন্দ্র। তাছাড়া অজস্র ধর্মকেন্দ্র সারাদেশ জুড়ে ছড়িয়ে ছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করে সাহিত্য-সৃষ্টির উৎসস্থল গুলি আর সেভাবে জীবন্ত রইল না। লোক কবিরা মাঠে ঘাটে গান ছড়া তখনও লিখে চলেছেন কিন্তু লিখিত শিষ্ট-সাহিত্যের সৃষ্টি-ভূমি দ্রুত কেন্দ্রভূত হতে লাগল মহানগরী কোলকাতার দিকে। নব্য বাঙালী জাতীয় অভ্যুত্থান এবং কোলকাতা মহানগরীর উৎপত্তি ও বিকাশ একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। কোলকাতা মহানগরী নব্য শিক্ষা, রাজনীতি, সামাজিক, আন্দোলন এবং সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের পীঠস্থান হয়ে উঠল। বাংলা থিয়েটার তৈরী হবে কোলকাতায়, ছাপাখানা —

সংবাদপত্র কোলকাতায়, কোলকাতায় না গেলে চিত্তের মুক্তি নেই, অর্থের বিকাশ নেই, সাহিত্যের বাজার নেই— এই সেদিনও রাঢ়ের প্রাণপুরুষ তারাশঙ্কর কোলকাতার ভাড়াবাড়ীতে বাস করে সাহিত্যের অঙ্গনে আপনাকে প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছিলেন। যিনি গ্রামের কথা বলেছেন, গ্রামের ভাব প্রকাশ করেছেন তাঁরও অবস্থান নগর কোলকাতায়। মহানগরী কোলকাতা নব্য পল্লী প্রেমের উৎস,ধারক এবং নব্য বাহক।

সারা ভারতে মহানগর হিসাবে কোলকাতার অবস্থান একটু স্বতন্ত্র রকমের। মারাঠী সংস্কৃতি পুনে নাগপুরে বিভক্ত, কিছুটা বোম্বাইকে অবলম্বন করে বিকশিত হয়েছে। বারাণসী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌতে উত্তর প্রদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ত্রিধা বিভক্ত অবস্থান। তামিল সংস্কৃতিও নব্যযুগে মাদ্রাজের পর দ্বিতীয় নগর কেন্দ্র হিসাবে মাদুরাইকে পেয়েছে। কিন্তু বৃটিশ যুগের দ্রুত অগ্রসর, সবচেয়ে বিস্তৃত, সংস্কৃতি ও সাহিত্য কর্মে সফল বঙ্গদেশবাসী কিন্তু কোলকাতা সর্বস্ব। ঢাকায় তার দ্বিতীয় মহানগরী কখনোই ঠিকমত গড়ে ওঠেনি।

এর ফলে বাংলা সাহিত্যে বৃটিশ যুগে এক ধরণের আরবানাইজেশন (Urbanization) বা নগরকেন্দ্রিকতা একটি বিশিষ্ট ধর্মরূপে দেখা দিয়েছে। এর সুফল কুফল দুই-ই আছে— এর ফলে একদিকে মানোন্নয়ন অন্যদিকে প্রভাব সংকোচন দুইই দেখা দিতে পারে এবং দিয়েছে। বাংলা সাহিত্য পশ্চিমের সঙ্গে প্রতিস্পর্ধা করে মানে বেড়েছে কিন্তু নগরের বাইরে ছড়িয়ে থাকা জীবন ও মনের সজল শ্যামল স্বাভাবিকতা সে পরিমাণে আয়ত্ত করেছে কি ? বিষয় হিসেবে পল্লী যতটা এসেছে সবটাই ধরা পড়েছে নাগরিক শিক্ষিত মনের চোখে। আর এই নব্য সাহিত্য-বাস্তবতা অজস্র গ্রামীণ সাধারণ সুস্থ শিক্ষিত মানুষ থেকে দূরেই থেকেছে।

ঈশ্বর গুপ্ত থেকে কবিতায় এবং ভবাণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে গদ্যে প্রত্যক্ষ বিষয়বস্তু রূপে কোলকাতার আবির্ভাব। বড় মাপের কবিরা যখন এলেন-যেমন মধুসূদন দত্ত তখনো পুরাণাশ্রয়ী মহাকাব্যে মহানগরী লঙ্কা যেন কোলকাতার মানস প্রতিরূপ হয়ে উঠল। শহরবাসী মহাকবির বাল্য স্মৃতির পল্লীর জন্য দীর্ঘশ্বাস চতুর্দশ পদাবলীতে মাঝে মাঝে শোনা গেলেও সেখানেও গ্রামের চেয়ে শহর কিছু কম সত্য নয়। প্রকৃতপক্ষে এক ধরণের পল্লী ব্যাকুলতা রোমান্টিক লিরিকের কবি বিহারীলালের আগে আমরা পাই না। পল্লীগ্রামে গিয়ে নাম ধাম লুকিয়ে তার শ্যামল সজল সরল সৌন্দর্যকে পাবার ব্যাকুলতা কবি প্রকাশ করেছিলেন। রোমান্টিকতার একটি প্রধান লক্ষণ হিসাবে, বিহারীলাল থেকে বাংলার নাগরিক কবিরা দূর পল্লীর এবং প্রকৃতির সান্নিধ্য কামনা করেছেন, নগরকে কারাগার বলে বিরূপতা দেখিয়েছেন। আসলে এই পল্লীমুখীতাও নগরবাসী মানসিকতার এক ধরণের প্রতিক্রিয়া মাত্র। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত বিহারীলাল প্রবন্ধটিতে এই রোমান্টিক প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি যদি গ্রামীণ হতেন তো গ্রামে বসে শহরের জন্য হয়তো ঠিক এভাবেই দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন। যাই হোক রোমান্টিক তৃষ্ণার পথ ধরেই এ যুগের বাংলা কবিতায় পল্লীগ্রাম এবং পল্লী প্রকৃতি প্রবেশ করল।

বাংলা কবিতায় পল্লীমুখীন বাতাবরণ তৈরীতে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা অতি বিশাল। তিনি নিজে কোলকাতার থেকে যখন পদ্মার তীরবর্তী পল্লীপুনিতে পরিভ্রমণ করেছিলেন তখনই তাঁর কাব্য সৃষ্টিতে সমৃদ্ধ পরিণতি দেখা দিয়েছিল- এই সত্য তিনি কখনোই ভুলতে পারেন নি। যার ফলে তাঁর কবিতায় গল্পে নাটকে, পল্লীবাংলা তার জীবন এবং প্রকৃতি নিয়ে অজস্র ধারায় বিচিত্ররূপে ছড়িয়ে আছে। শুধু বাংলার নদীমাতৃক পূর্বাঞ্চল নয়, রুক্ষ রাঢ়-তার কোপাই-এর শীর্ণ ধারা, বোলপুর ভুবন ডাঙ্গার মাঠ-অন্যভাবে অর্থবহ

হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনে এবং সৃষ্টিতে। তাঁকে ঘিরে শান্তিনিকেতনে এক নতুন ধরণের পল্লী গড়ে উঠেছিল। কোলকাতার জোড়াসাঁকো এবং বীরভূমের শান্তিনিকেতনের মধ্যে তাঁর মন যাতায়াত করেছে। জোড়াসাঁকো আরো যত ইঁট কাঠে, যন্ত্রে বাণিজ্যে ভরে উঠেছে ততই তার ওপরে পত্র পল্লবের বাতাবরণ তাঁর শান্তিনিকেতন থেকে নিয়ে এসে কবি সৃষ্টি করেছেন। কবি সমুচ্চ কণ্ঠে নগর সভ্যতার নিন্দা করেছেন, যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধাচারণ করেছেন, খুব উন্নত মনের অনেক সৃষ্টিতে তাকে ভর্ৎসিত করেছেন— তবুও রবীন্দ্রনাথ কোলকাতা মহানগরীর বুকের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছেন, তাঁর রচনায় অপরিণতির সময় থেকে শেষ পর্যন্ত কোথাও গ্রামীণতা নেই, ভাষায় রীতিতে এবং দ্রুত গতির বিবর্তমানতায় সব কিছু অত্যুজ্জ্বল এবং নাগরিক। তাঁর প্রকৃতিতত্ত্ব, তাঁর অতীতত্ত্ব এসবের মধ্যেও আছে আধুনিক চিন্তা ও অধ্যয়নের প্রতিফলন।

রবীন্দ্রনাথের নগর কোলকাতা এবং পল্লী বঙ্গ একাধিক গ্রন্থের বিস্তারে আলোচিত হতে পারে। সেরূপ কোন কিছু করার চেষ্টা আমরা করছি না। আমরা শুধু বর্তমান প্রসঙ্গটির অভিমুখে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকার সারাৎসার উল্লেখ করছি।

বিহারীলাল প্রমুখ রোমান্টিকদের প্রভাবে যা কিছুতেই হত না রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে তা হল— বাংলা কবিতায় পল্লী প্রবণতার আবেগপ্রবণ ধারা একটা গুরুতর ভূমিকা নিয়ে দেখা দিল। এ বিষয়ে রবীন্দ্র প্রভাবের পাশাপাশি গান্ধীজির 'পল্লীতে ফিরে যাও' এই আন্দোলন কিছু পরোক্ষ প্রভাব হিসাবে কাজ করেছে। রবীন্দ্রনাথের অনুজ কবিরা যেন পল্লী প্রসঙ্গকেই কবিতার অপরিহার্য বিষয় বলে মনে করতে আরম্ভ করলেন। এঁদের মধ্যে কুমুদরঞ্জন মল্লিক আজীবন পল্লীবাসী ছিলেন এবং জসিমউদ্দীন পল্লীজীবনের মধ্য থেকেই উঠে এসেছিলেন এবং পল্লীর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেছেন।

বাকী অনেকেই যেমন কালিদাস রায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, বন্দে আলীমিয়া, গোলাম মুস্তফা, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী, গিরীন্দ্রমোহনী দাসী, কামিনী রায়, মানকুমারী বসু, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী মূলতঃ নগরবাসী কিন্তু কবিতা রচনায় পল্লীমুখী। সাধারণ মানুষের কাছে কবিত্ব এবং পল্লীপ্রেম কবিতার বিষয় এবং গাছ ফুল, লতা, পাতা-মাঠ-ঘাট ইত্যাদি অপছন্দ হয়ে উঠল। এর বিরুদ্ধে সমকালীন কয়েকজন কবির মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পল্লীর বিষয়বস্তু কখনো কখনো গ্রহণ করলেও কোন বিশেষ ধরণের ভাবালুতা অনুভব করেন নি। যতীন্দ্রনাথ সেন পল্লী বিমুখ, প্রকৃতি বিমুখ হয়ে উঠলেন। প্রমথ চৌধুরী মনন ও শিল্পের দিক থেকে একেবারেই গ্রামীণতা বিরোধী, অভিজাত ও নাগরিক। মোহিতলাল মজুমদার কবিতাকে দার্শনিক প্রত্যয়ের সঙ্গে যুক্ত করলেন এবং বঙ্গ কবি সম্পর্কে বিমুখ রইলেন। এই সময়ে কল্লোল পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে নব্য কবির দল দেখা দিলেন তাঁরা রবীন্দ্রনাথের ভাব কল্পনার বিরুদ্ধাচারী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ যেমন প্রেমেন্দ্র মিত্র বঙ্গ পল্লীর নিভৃত আলয় থেকে বাংলা কবিতাকে দুঃসাহসিক অ্যাডভেঞ্চারে মুক্তি দিতে চাইলেন। তবে নজরুল ইসলাম বিশেষ ভাবে পল্লী প্রেমিক না হলেও এবং রবীন্দ্র ভাবমার্গের পথিক না হওয়া সত্ত্বেও পল্লীজীবন ও প্রকৃতি নিয়ে কবিতা লিখেছেন, আবার পাশাপাশি রাজনৈতিক বিষয় বিতর্ক, সাম্যবাদীচেতনা, শহরকেন্দ্রিক গণ আন্দোলন এসব বিষয়েও মনোনিবেশ করেছেন– তাঁর মধ্যে এক ধরণের ভারসাম্য লক্ষ করা যায়।

এই সময়ে বিংশ শতকের তিনের দশকে বাংলা কবিতা যথার্থ আধুনিকতার স্তরে প্রবেশ করতে থাকে।

॥ দুই ॥

:: রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় নগর ও নাগরিকতা ::

রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে যখন তিনি পূর্ণ শক্তিতে কাব্য রচনা করে চলেছেন তখনই ১৯৩৫ সালে জীবনানন্দের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' প্রকাশিত হয়। যতীন্দ্রনাথ সেন নজরুল ইসলাম বা কল্লোলের কবি গোষ্ঠী যে ধরণের রবীন্দ্র বিরোধীতার সূচনা করেছিলেন জীবনানন্দের কাব্যটির ঢঙ তার থেকে পৃথক। জীবনানন্দ-এর আগে 'ঝরাপালক' নামে একটি কাব্য লিখে-ছিলেন তাতে সমকালীন, ঈষৎ পূর্ববর্তী কবিদের প্রভাবই বড় ছিল। ধূসর পাণ্ডুলিপি কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য ধরণের কাব্য। রবীন্দ্র ভাব পরিমণ্ডল থেকে বেরিয়ে না এসে এমন কী যতীন সেন- নজরুল-প্রেমেন মিত্র থেকে স্বতন্ত্র না হয়ে এ কাব্যের তাৎপর্য ধরা যায় না। তিনি আপাতদৃষ্টিতে কোথাও রবীন্দ্র বিরোধী নন কিন্তু এ অন্য জগতের ভাষা, অন্য জগতের উপলব্ধি, অন্য স্বরের উপভোগ। পৃথিবীকে, প্রকৃতিকে নারীকে একই সঙ্গে ভালবাসা ঘৃণা করা ও অবহেলা করার বহুমাত্রিক মিশ্রণে এবং সবকটা ইন্দ্রিয়কে প্রজ্বলিত ও পর্যস্থ করে স্বাদ নিষ্কাষণে, মৃত্যুকে এবং মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবনকে তথা জীবনের কেন্দ্র মৃত্যুকে উপলব্ধি করে এই কবিতা এক অভিনব জটিল অভিজ্ঞতার বস্তু হয়ে উঠেছে। এ কারণেই অনেক সমালোচক মনে করেন রবীন্দ্র জীবৎকালেই রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার যাত্রা শুরু হয়। জীবনানন্দ আমাদের আলোচনার বিষয় নয় এবং জীবনানন্দের সাহায্যে আমাদের বর্তমান অভিসন্দর্ভ পুষ্ট হয়ে ওঠার সম্ভাবনা নেই। কারণ তিনি আশ্চর্য ভাবে বাংলা পল্লীকে তাঁর কবিতায় নিয়েছেন, নিয়েছেন কোলকাতা শহরকেও, বর্তমানকে যেমন তেমনি অতি প্রাচীনকেও নিয়েছেন, সমুদ্রকে, অরণ্যকে, বিদর্ভ ব্যাবিলনকে সমভাবে —

এ শুধু প্রেমেন মিত্রের দু:সাহসী অভিযান নয়— উপলব্ধির গভীর অভিঘাতে বাংলা কবিতার চারদিক থেকে বন্ধ দরজা জানালার উন্মোচন।

একালের বাংলা কবিতার বিবিধ লক্ষণের মধ্যে নগরমুখীতা একটি বিশিষ্ট লক্ষণ বলে অভিহিত হয়ে থাকে। কোন কবির লেখায় তার ভূমিকা বিস্তৃত, কারো লেখায় তুলনামূলক ভাবে সংকীর্ণ। কিন্তু আধুনিকতায় সুপ্রতিষ্ঠিত কবি, বিষয় হিসাবে কখনো পল্লীকে নিতে পারেন কিন্তু পল্লীতেই মুক্তির দ্যোতনা, নগরের বন্দীত্ব থেকে নিসর্গেই মুক্তি এরূপ প্রত্যয়ে কেউ বিশ্বাসী নয়। আধুনিক কবির জটিলতায়, তীর্যকতায়, তীক্ষ্ণ সমাজ চৈতন্যে, জীবনের রূঢ় বাস্তবতার উদঘাটনে, রূঢ় কর্কশ যান্ত্রিকতার মুখোমুখি হওয়ায়, রাজনৈতিক চেতনায়, সংগ্রামে, বেদনায় কোলকাতা শহর সর্বব্যাপী। প্রত্যক্ষ ভাবে কিংবা পরোক্ষভাবে একালের কবিতার নব্য লক্ষণগুলি তাকে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের উপলব্ধির ও উপভোগের বস্তু করেছে। বস্তুতপক্ষে নগরের শিক্ষিত সাধারণ পাঠক শ্রেণীর একটা অংশও সংক্ষিপ্ত পড়ুয়া মাত্র আধুনিক কাব্যের পাঠক। দুরূহতা ও দুর্বোধ্যতার অভিযোগ বারে বারে আসে, বিদেশী ভাব-ভাবনা সহজে বাংলা কবিতায় স্থান পায়-তাতে তার দুর্বোধ্যতা বেড়ে যায়, ফলে নবীন কবিদের সামনে যে পাঠককুল তারা যেন শুধুই এই শহরের। কবিরাও মূলত: শহুরে হয়তো বাস্তবত: কেউ মফস্বল শহরে লেখাপড়া করেছেন, কেউ হয়তো কর্ম ব্যপদেশে মফস্বলে থাকেন তবু সেই সব অবস্থান কেন্দ্রও তাঁরা ছোট গন্ডীতে সীমাবদ্ধ এবং সকলেরই মনের যোগ কোলকাতায়। এঁদের কবিতায় কখনো গ্রাম আসে-দূর থেকে দেখা গ্রাম, পরিশীলিত শহুরে বক্রমনে দেখা গ্রাম। জীবনানন্দের গ্রামই কি বাংলার গ্রাম ছিল ? চমৎকার ছবি, আন্তরিক ভালবাসা তবু যে চোখ দেখেছে, যে মন সম্ভোগ করেছে, তার পরিপুষ্টি নাগরিক চিন্তা চেতনায়।

এই বিশেষ দিকে দৃষ্টি দেবার উদ্দেশ্যেই আধুনিক বাংলা কবিতার তিনজন কবির পর্যালোচনা করছি। সমর সেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং নীরেন্দ্র চক্রবর্তী সময়ের দিক থেকে ক্রমানুয়ীক। সমর সেনের পর সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং তারপর নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছেন। সমর সেনের সঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম দিকের রচনা সমসাময়িক, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠার পর কবি হিসাবে খ্যাত হন। তারপরে এখনো পর্যন্ত তাঁরা পাশাপাশি লিখছেন। এই তিনজন কবি ব্যক্তিত্ব শিল্পবোধ এবং জীবনচেতনার দিক থেকে স্বতন্ত্র। কিছু কিছু মিল অবশ্যই আছে তবে পার্থক্যের দিকটাই গভীরতর। এই তিনজন কবিকে তাঁদের ভাব কল্পনায় সাযুজ্যতায় নয়— বিশেষ ভাবে নগরচেতনার দিক থেকে দেখবার সুযোগ আছে বলে আমাদের মনে হয়েছে। এক অর্থে নবীন কবিরা যে সবাই নগরচেতনা-সমৃদ্ধ সে কথা আমরা আগেই বলেছি। সেদিক থেকে কিছু পূর্বের বা সমকালের কবিদের তুলনায় এঁরা যে একটা স্বতন্ত্র স্তরে অবস্থান করেন এমনও নয়। যদি নাগরিক মনোভাবের কথা বলি তো বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তীর প্রসঙ্গ উঠতেই পারত। তবে আমরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার সময়টা থেকে পরবর্তী তিন দশক পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছি। এভাবে সূচনার স্মরণ হল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ নাগরিক সত্যকে আরো নগ্ন করেছে। মহাযুদ্ধ উত্তরকাল নগরকে একদিকে অনেক বেশী রাজনীতি সচেতন করে তুলেছে, অন্য দিকে নব নব প্রযুক্তির বৈপ্লবিক অগ্রগতি নগর জীবনকে তীব্র আকর্ষণের কেন্দ্র রেখেছে। গ্রামীণতা দ্রুত নাগরিকতার সমীপবর্তী হবার সাধনা করেছে অথবা নাগরিকতা দ্রুত গ্রামকে গ্রাস করতে চলেছে। এই কথা মনে রেখেই আমরা এই তিন কবির কাব্য-চর্চায় প্রবেশ করেছি এবং গোড়াতেই নিবেদন করে রাখি যে শিল্পগত বৈশিষ্ট্য ও গুনাবলী এবং নন্দনতাত্ত্বিক মূল্যায়ণ থেকে আমরা বিরত থেকেছি॥

• • •

.....

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

:: সমর সেন ::

148827 1 OCT 2002

॥ এক ॥

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর সমর সেন কোলকাতায় জন্মান। তাঁর পিতা ছিলেন অরুণচন্দ্র সেন, পিতামহ দীনেশচন্দ্র সেন। ১৯৩২ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হন। ১৯৩৬ সালে ইংরাজী অনার্স নিয়ে বি.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। ১৯৩৮ সালে এম.এতেও তিনি একই স্থানে লাভ করেন।

১৯৩৩ সাল থেকেই তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন— প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকায় এবং তারপর কবিতা, পরিচয় ইত্যাদি পত্রিকায়। ১৯৩৭ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কয়েকটি কবিতা' প্রকাশিত হয়।

ছাত্র জীবন থেকেই সমর সেন রাজনীতি সচেতন ছিলেন। তাঁদের বেহালার বাড়ীতে সেই সময়ে কমুনিষ্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত অনেকের যাওয়া আসা চলত। তিনি তাঁর প্রথম কবিতার বইটিও উৎসর্গ করেছেন 'মোজাফর আহ্মেদকে'।

রাজনীতি সচেতন হলেও সক্রিয় আন্দোলনের সঙ্গে তিনি কখনোই যুক্ত হন নি। তাছাড়া অন্ধ মোহও তাঁর কোন দল বা ব্যক্তির প্রতি ছিল না। সমালোচনায় তিনি বারবার ই মোহমুক্ত ছিলেন।

সমর সেন কোন কিছুর জন্যেই আপোষ রফা খুব একটা, অথবা বলা যায় প্রায় করেন নি। তাই দেখা যায় বার বার তাঁর পেশার পরিবর্তন করতে হয়েছে।

১৯৪০ সালে কাঁথির প্রভাতকুমার কলেজে দু মাস কাজ করেছেন।

১৯৪০-এর অক্টোবর-এ দিল্লীর কমার্সিয়ান কলেজে কাজ নিয়েছেন। সেখানে ১৯৪৪ পর্যন্ত অধ্যাপনা করে ছেড়ে দিয়েছেন। সে বছরই বিজ্ঞাপন সংস্থায় দিন কয়েক কাজ করে, দিল্লীর অল ইন্ডিয়া রেডিওর সংবাদ বিভাগে কাজ নেন।

১৯৪১- এ The Statesman - পত্রিকার সাব এডিটর হয়ে আসেন।

১৯৫৭-য় মস্কো যান অনুবাদকের চাকরি নিয়ে।

১৯৬১-তে দেশে ফিরে বিজ্ঞাপন সংস্থায় কাজ নেন।

১৯৬২-তে Hindusthan Standard -এ যুক্ত সম্পাদক হন।

১৯৬৪ - তে Hindusthan Standard ত্যাগ করে হুমায়ুন কবিরের অনুরোধ Now পত্রিকার সম্পাদক হন।

১৯৬৮ -এ Now এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে Frontier পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯৮৭-র ২৩শে আগস্ট পর্যন্ত তিনি এই পত্রিকার সাথেই যুক্ত ছিলেন।

১৯৮৭-এ ২৩শে আগস্ট তিনি মারা যান।

সমর সেনের কাব্য গ্রন্থের একটি তালিকা দেওয়া হল।

১.	কয়েকটি কবিতা	প্রকাশকাল	১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ
২.	গ্রহণ	,,	১৯৪০ ,,
৩.	নানা কথা	,,,	১৯৪১ ,,
৪.	খোলা চিঠি	,,	১৯৪৩ ,,
৫.	তিনপুরুষ	,,	১৯৪৪ ,,

॥ দুই ॥

সমর সেন যে পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন; 'কয়েকটি কবিতা' তার মধ্যে প্রথম। অবশ্য পরবর্তী সময়ে যখন তিনি আলাদা কাব্যগ্রন্থ-এর বদলে একটি সংকলন প্রকাশ করেছিলেন 'সমর সেনের কবিতা' নাম দিয়ে, কাব্যগ্রন্থগুলির আলাদা অস্তিত্বকে দিয়ে সেগুলিকে রচনাকালের সীমায় চিহ্নিত করেছিলেন— সেই হিসাবে ১৯৩৪ - ৩৭ এই সময়ে কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল— প্রকাশিত হয়েছে ১৯৩৭ সালে। এই কাব্য গ্রন্থে মোট ঊনপঞ্চাশটি কবিতা রয়েছে— কবিতাগুলির অধিকাংশই সাময়িক পত্রিকায়-বিশেষত: কবিতা পত্রিকায় প্রকাশিত।

কয়েকটি কবিতা সমর সেনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ হলেও প্রথম থেকেই তাঁর মধ্যে এক পরিণত কবিমনের পরিচয় পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব বসু তাঁ সম্পর্কে বলেছিলেন —

> They are little lyrics, pale, frail and wistful, flowers of youth, or buds of adolescence but not raw fruits of immaturity. ১

শুধুমাত্র পরিণত কবিমন বললেই যথেষ্ট হবে না তিনি তাঁর প্রথম বইটি থেকেই পরবর্তী কাব্যজীবন কেমন হবে তাও জানিয়েছেন। এখান থেকেই তিনি যে নাগরিক কবি সেই ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি কলকাতা শহরের এমন সুস্পষ্ট ছবি এঁকেছেন যা দেখে স্পষ্টই অনুমান করা যায় যে এই শহরের সাথে তিনি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কয়েকটি কবিতার সমালোচনা লিখতে গিয়ে অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের সাথে সমর সেনের নাগরিক কবি মনটির কথাও বিশেষ করে বলেছেন, ——

> Samar Sen's contents are urban; and his mood finds sicle. The city has destroyed all that has been taught to be beautiful. It is an inchoate mass reacking with patchonli and petrol. It has ignored humanity and generated snobbishness. Almost a cancer, a monster a python, a passionate tiger, Nevertheless it is a fact, which exacts no tribute of tears from the poet. The fact of ugliness the reality of the sordiotnes is sotypically up-to-date. ২

এই কবি শহরের সাথে, কোলকাতা শহরের সাথে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। তাঁর জন্ম, শিক্ষা রুচিবোধ এই কোলকাতাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। ব্যক্তি-গত জীবনচর্চায় পল্লী জীবন কোন ছাপ ফেলে নি। ফলে কাব্য-চর্চার ক্ষেত্রেও গ্রাম বিষয় হিসাবে আসেনি। নগর জীবনের বাইরের কথা তিনি বলেছেন কখনো কিন্তু সেও গ্রাম বাংলা নয়। সাঁওতাল পরগণা বা কাছাকাছি অন্য স্থান। প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা যেখানে লিখেছেন সেখানেও পাই শহরের এবং লাল মাটি আর দেবদারু শোভিত বনের ছবি।

আধুনিক কবিদের সাধারণ লক্ষণ হতাশা, ক্লান্তি, বিষাদ। নস্তালজিয়া এক জীবনভাবনা তাঁদের কবিতা রচনার উৎস হয়ে দাঁড়ায় কখনো। রবী-দ্রনাথের থেকে এখানেই তাঁদের ব্যতিক্র-ম। রবী-দ্রনাথের কবিতায়-গানে সু-দরের অনুসরণ আছে আর তাতে দুঃখ ও পরম বস্তু বলে তিনি মনে করেছেন। আধুনিক কবিরা রবী-দ্রনাথের এই ভাবনার বিপরীতে বাস করেন। সমর সেন অথবা তাঁর মত কোন

কোন কবি এই জীবনদর্শনকে ভাঙ্গার চেষ্টাও করেছেন। দুঃখকে দুঃখ বলেই জেনেছেন কিন্তু সেই দুঃখ থেকে উত্তরণের কোন পথ তাঁরা পান নি।

হতাশা, ক্লান্তি, বিষাদ-এর উৎস নগরজীবন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পূর্বক্ষণের পৃথিবীতে এই হতাশা স্বাভাবিক ছিল। আর যুদ্ধের প্রভাব যেহেতু নগরজীবনে বেশী পড়ে তাই আধুনিক নাগরিক কবিদের মধ্যেই তা বেশী দেখা যায়।

সমর সেনের কবিতায় আমরা এই হতাশা, গ্লানি আর ক্লান্তির চিত্র সর্বব্যাপ্ত হতে দেখি। যেখানে তিনি প্রেমের কবিতা লিখেছেন সেখানেও এই হতাশা উঠে এসেছে। প্রকৃতির মধ্যেও তিনি জীবনের গ্লানিকে ফুটে উঠতে দেখেছেন।

কয়েকটি কবিতার 'গোধূলি', 'নিঃশব্দতার ছন্দ' 'চিত্র' 'বিরহ' 'স্মৃতি', 'প্রেম' 'মুক্তি', 'একটি মেয়ে' ইত্যাদি কবিতায় রয়েছে এক হতাশ প্রেমিকের ছবি —'গোধূলি' কবিতায় তিনি গোধূলির নেমে আসা অন্ধকারে পশ্চিমের আকাশকে দেখছেন চাপা রক্তেরঙে, হাওয়ায় ভেসে আসা ফুলের গন্ধ আর কিসের হাহাকার। এই নির্জনতায় তিনি বিরহের পদধ্বনি শুনতে পান।

নির্জন অন্ধকারে
স্পন্দমান মুহূর্তগুলি কী যেন বয়ে আনে
কী যেন প্রতিক্ষণে মনে পড়ে
শুধু যেন শুনি
ক্লান্ত ভাবে শুনি আর শুনি —
সুদূর বিরহের করুণ পদধ্বনি।

এই কবিতার বিরহ সুদূরের জন্য, নি:শব্দতার ছন্দ কবিতায় তিনি নি:সঙ্গ;— তাই বলেছেন ——

কেন তুমি বাইরে যাও শুধরাতে
আমাকে একলা ফেলে ?
কেন তুমি চেয়ে থাক ভাষাহীন, নি:শব্দ পাথরের মতো ?

কখনো চকিতে তিনি এই নি:শব্দতার ছন্দকে অনুভব করেন, বোঝেন' এই নি:শব্দতায় দিনের পরে আসে রাত, পৃথিবীতে আসে সবুজপ্রাণ অথবা বলা যায় এই নি:শব্দতায় সন্ধ্যেই সৃষ্টি হয়।

'একটি রাত্রির সুরেও রয়েছে অন্ধকার, হাহাকার আর নি:সঙ্গতার কথা-সেই সঙ্গে রয়েছে যান্ত্রিকতার কথাও ——

ঘনায়মান অন্ধকারে
করুণ আর্তনাদে আমাকে সহসা অতিক্রম করল
দীর্ঘ, দ্রুত যান—
বিদ্যুতের মতো :
কঠিন আর ভারি চাকা, আর মুখর
অন্ধকারের মতো সুন্দর,
অন্ধকারের মতো ভারি।

অথবা,

দীর্ঘ লৌহ রেখার সহসা শিহরণ—
আর অস্ফুট, শীর্ণ, বহুদূর, কীসের আর্তনাদ,
কঠোর, কঠিন।

প্রথমে এই যান্ত্রিকতা সুন্দর বলে মনে হলেও ক্রমে তা কত্যার কঠিন হয়ে উঠছে এটা লক্ষণীয়।

সমর সেনর প্রেমের কবিতায় যে বিরহ আছে তাতে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই আছে হাহাকার আর বিষাদ ক্লান্তি। এটিই তাঁর প্রেমের কবিতার বৈশিষ্ট্য। বুদ্ধদেব বসু অবশ্য কয়েকটি কবিতার 'একটি স্পর্শকাতর সুন্দর যৌবনকে [৩] দেখতে পেয়েছেন কিন্তু এই যৌবনের মধ্যে আমরা কোন উন্মাদনা বা পাবার তীব্র আসক্তি পাই না। বরং এতে না পাওয়ার বিষন্নতাই বার বার ফুটে ওঠে। প্রেম তাঁর কাছে 'ভুলে যাওয়া গল্পের মতো [৪] চকিতে কখনো মনে পড়ে।

অন্ধকারের স্বচ্ছতা ভেঙেছেযেন বলল —
"জান, কাল রাত্রে মিনির বিয়ে হয়ে গেছে?"
অন্ধকার দিগ্বিতে সে শব্দ পাথরের মতো।
"ও কিছুই নয়, কদিনই বা মনে থাকবে,
তবে হয়ত কোনো রাত্রে রতিবিহারের সময়
হঠাৎ তোমাকে মনে পড়বে,
আর সেদিন সমস্ত রাত
চোখে আর ঘুম আসবে না।" [৫]

প্রেমের বিষয়ে এই সমর সেনের ভাবনা। প্রেম চিরদিনের স্মৃতি নয়, কিছুদিন পর তা চকিত মুহূর্তে মনে পড়ে,দেহ প্রকৃতির অভ্যাসে। আধুনিক কবিদের কাছে প্রেমের বিশ্বস্ততা কট হয়ে গেছে। বিশ্বাসহীন পৃথিবীতে কবিরা প্রেমের বিষয়েও বিশ্বাস রাখতে পারছেন না। অনুভূতির ক্ষেত্রে এই ছায়া নাগরিক বোধ সঞ্জাত।

এই হতাশা বা অবিশ্বাস ছাড়াও এমন কিছু শব্দ বা উপমা

ব্যবহার করছেন যা উল্লেখযোগ্য ভাবে লক্ষ্যণীয়-গোধূলিতে 'দগ্ধ রজনীগন্ধা' এখানে দগ্ধ শব্দটি বা

১. আমার নিদ্রাহীন অন্ধকারে শুধু যেন শুনি
দুপুরের খর সূর্যে ক্লান্ত মহিষের পদক্ষেপ
ইস্পাতের কঠিন পথে। [৬]

২. বিষাক্ত সাপের মতো আমার রক্তে
তোমাকে পাবার বাসনা। [৭]

৩. আমাদের স্তিমিত চোখের সামনে
আজ তোমার আবির্ভাব হলো;
... ...
আমাদের দুর্বল ভীরু অন্তরে
সে উজ্জ্বল বাসনা যেন তীক্ষ্ণ প্রহার। [৮]

মহিষের পদক্ষেপের (শোনা যায় ইস্পাতে পথে) ক্লান্তি বা বাসনাকে বিষাক্ত বলে মনে হওয়া. কখনো বা সুন্দরকে পাবার বাসনা প্রহারের মত তীক্ষ্ণ হওয়া কবির ক্লান্ত, বিষাক্ত মনেরই প্রকাশ। এই অবস্থায় সুন্দরকে পাওয়া যায় না। তাই সেই বাসনা প্রহারের মতো কঠিন হয়ে বাজে!

শুধু প্রেম নয় প্রকৃতি বিষয়ক লেখার মধ্যেও সময় সেন লক্ষণীয় পরিবর্তন এনেছেন। এই প্রকৃতি কখনোই কোন গ্রাম্য নয়। কখনো দিয়েছেন রাতের বর্ণনা, কখনো বা স্থানের বর্ণনা। 'তাঁর কাব্যে রবীন্দ্রনাথ-লালিত ক্লান্ত করুণ বিষাদ শাল মহুয়ার বনে, কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে, চাঁদের পাণ্ডুর আলোয়, পাহাড়ের দূর নীলে, শহরের এলোমেলো গলি'তে, দূর দিগন্তে পায়।' [১]

তাঁর প্রকৃতি বিষয়ক কবিতার বিষয়ে এই মন্তব্য করেছেন বিষ্ণু দে। অবশ্য সমর সেনের বিষাদ, ক্লান্তির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিষাদ ক্লান্তি এক নয়। কিন্তু তা হলেও এইসব কবিতার বিষাদ ক্লান্তি বা পাণ্ডুরতা লক্ষণীয়। গ্রাম বাংলার সজল শ্যামল রূপ তিনি আঁকেন নি। নগরজীবনের বৈশিষ্ট্যই তাঁর কবিতায় রূপ লাভ করেছে। 'একটি রাত্রির সুর,' চারটি কবিতা শীর্ষক কবিতার,—'রাত্রি' 'ঝড়' 'সাড়া,' 'ক্লান্তি,' 'শেষ বসন্ত,' 'মহুয়ার দেশ,' 'শেষরাত্রে' 'ভোরের কলকাতা' 'বসন্ত,' এই সব কবিতায় তিনি কখনো কোনকাতার রূপ, কখনো বা পাইনের বন, দেবদারু গাছের নির্জনতা অথবা মহুয়ার দেশের বর্ণনা দিয়েছেন। এই বর্ণনার মধ্য দিয়েই তাঁর মনের আশা, আকাঙ্খা বা ক্ষোভের প্রকাশ ঘটেছে।

'রাত্রি' কবিতায় কবির স্মৃতি ভেসে আসে বর্ণহীন আকাশ থেকে, 'চিত্রা' কবিতায় শূন্য প্রান্তরে এলোমেলো হাওয়া অনামী ফুলের গন্ধ— তবু চিত্রার চোখের ক্লান্তি দূর হয় না। ঝড় কবিতায়ও তিনি জানালার ফাঁক দিয়ে পীড়িত আকাশের আভাস দেখতে পান সেই আকাশে মেঘ জমে শীতের অজগরের মতো।

আকাশে ধোঁয়ার ক্লেশ, চারিদিকে ধোঁয়ার গন্ধ,
আর হাওয়ায় অসংখ্য ধুলোর কণা
জীবন্ত বীজাণুর মতো।
. . . আমার মনে শান্তি নেই।

যদি ঝড় আসে তবে প্রকৃতির সাথে কবির মনও শান্ত হবে। এখানে ধোঁয়ায় ধুলোয় ভরা পৃথিবীতে কবির মন অশান্ত।

'সাড়া' কবিতায় 'অর্দ্ধ রাত্রে' তাঁর অন্তরে উতলা হাওয়ার মত স্মৃতি ভেসে এল —

দিগন্তের কুয়াশায় যেন স্বপ্নের আভাস।
কোথায় কোন পথের দুধারে নেমেছে গভীর অন্ধকার,
হাওয়ায় দেবদারুর শুধু ঘন সারি উঠছে কেঁপে,
আর ঘূর্ণ্যমান পৃথিবীর একপ্রান্তে —
সহসা এসেছে অরণ্যের হাহাকার
পাষাণের দীর্ঘ রেখায়।

কবির কল্পনায় ভেসে আসে দেবদারু গাছের সারিতে ঘনিয়ে ওঠা অন্ধকার কিন্তু শুধু এইটুকুই দেখে না তাঁর মনশ্চক্ষু — এও দেখে-অরণ্যে হাহাকার উঠেছে আর দেখা যাচ্ছে পাষাণের দীর্ঘ রেখা।

'মহুয়ার দেশ' কবিতায়ও 'ধোঁয়ায় বাষ্পিল নিঃশ্বাস' যখন 'শীতের দুঃস্বপ্নের মতো' কবির মনে চেপে বসে তখনই তাঁর মনে হয়—

অনেক অনেক দূরে আছে মেঘ মদির মহুয়ার দেশ
সমস্তক্ষণ সেখানে পথের দুধারে ছায়া ফেলে
দেবদারুর দীর্ঘ রহস্য,
আর দূর সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস
রাত্রের নির্জন নিঃসঙ্গতাকে আলোড়িত করে।
আমার ক্লান্তির উপরে ঝরুক মহুয়া ফুল,
নামুক মহুয়ার গন্ধ।

নগরের রুদ্ধশ্বাস অবস্থায় তাঁর মনে হচ্ছে মহুয়ার দেশের কথা। কামনা করছেন ক্লান্তির উপরে মহুয়া ফুলের গন্ধ নেমে আসুক। লক্ষণীয় তাঁর ক্লান্তির শান্তি-গ্রাম-বাংলার স্নিগ্ধ প্রকৃতি নয়-মহুয়ার দেশ। তাঁর কাছে মহুয়ার দেশ মুক্তির স্বপ্ন। কিন্তু কবি আগ্রামী নগর প্রকৃতির কথা জানেন-তাও তিনি পাঠককে শুনিয়েছেন।

কবিতার দ্বিতীয় অংশে বলছেন মহুয়া বনের ধারে কয়লাখনির কথা—অবসন্ন মানুষের কথা —

মহুয়াবনের ধারে কয়লার খনির
গভীর, বিশাল শব্দ
আর শিশির ভেজা সবুজ সকালে,
অবসন্ন মানুষের শরীরে দেখি ধুলোর কলঙ্ক,
ঘুমহীন তাদের চোখে হানা দেয়
কিসের ক্লান্ত দুঃস্বপ্ন।

এইভাবেই মহুয়া বন তাঁর কাছে মুক্তির স্থান সেখানেও নগর সভ্যতা বাহু বিস্তার করেছে।

'বসন্ত' কবিতায়ও পাইন বনের মর্মর ধ্বনিও সন্ধ্যা নামার বর্ণনা যখন দিচ্ছেন তখনই বলছেন 'তারপর রাত্রি ভরে ট্রাফিক পুলিশের নিঃসঙ্গতা'- এখানে নিঃসঙ্গতাকে ট্রাফিক পুলিশের সাথে তুলনা করা লক্ষ্য করার মত।

'বসন্তের গান' কবিতাতেও স্বপ্নে যখন ধূসর পাহাড় দেখেন তখনই শোনেন 'কীসের বিবর্ণ পদক্ষেপ'।

'ভোরের কলকাতা' কবিতায় তিনি কলকাতার ক্লান্ত বিধ্বস্ত ছবি দেখতে পেয়েছেন। কলকাতার ভোরে তিনি কোন মাধুর্য বা সৌন্দর্যকে দেখতে পান নি। দেখেছেন —

রিক্সার উপরে ক্লান্ত চীনে গণিকা যখন চোখ বোজে
সূর্যের রোদ উত্তাপে,

তখন দিন-রাত্রির নিঃশব্দতা
তোমার রক্তে আসে
নীল নদীর মতো।

তিনি দেখতে পান নাগরিক আনন্দের অশ্লীলতা, মানুষের ক্লান্তি। এই ক্লান্তি আর অশ্লীল আনন্দ যেন শহরটিকে গণিকার মত করে তুলেছে।

নগরের রূপ কবির কাছে এই ভাবেই ধরা পড়েছে।

'মেঘদূত,' 'নাগরিক,' 'একটি নিউরিটিক কবিতা,' 'মুক্তি,' 'উর্বশী,' 'ভোরের কলকাতা,' 'নাগরিক,' 'নাগরিক,' 'স্বর্গ হতে বিদায়,' 'পোস্ট গ্রাজুয়েট,' 'একটি বেকার প্রেমিক,' — এই কবিতাগুলিতে শহরের স্পষ্ট ছবি ফুটে উঠেছে।

'মেঘদূত' নামে তাঁর দুটি কবিতা এই কাব্যগ্রন্থে রয়েছে। প্রথমটি অনুষ্টুপ সংস্করণের নয়ের পাতায় রয়েছে। 'মেঘদূত'- এর সাথে বাঙালী পাঠকের পরিচয় দীর্ঘদিনের। কালিদাসের মেঘদূত কাব্য, রবীন্দ্রনাথের মেঘদূত নামক কবিতা এবং প্রবন্ধে বাঙালী মানস লালিত। মেঘদূতের সাথে বা বর্ষার নব মেঘের সাথে প্রেম-বিরহ, বেদনা ইত্যাদি বহু ভাব আমাদের মনে জেগে ওঠে। কিন্তু মেঘ তো শুধু বর্ষাকেই আনে না-আনে আরো নানা কিছু। আধুনিক কবি সেই দিকেই আঙুল তুলেছেন। ——

বৃষ্টির আগে ঝড়, বৃষ্টির পরে বন্যা। বর্ষাকালে
অনেকদেশে যখন অজস্র জলে ঘরবাড়ি ভাসবে,
ভাসবে মৃত পশু আর মুখর মানুষ,—

ঝড়ে আর বন্যায় মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হবে, মানুষ অথবা পশু দুইই এই

মেঘের কবলে পড়বে। শুধু তাই নয়' শহরের রাস্তায়' তখন দুর্ভিক্ষের স্বেচ্ছা-সেবকেরা আর্তনাদ করে সাহায্য চাইবে।

আর তারই মধ্যে কিছু মানুষের মধ্যে দেখা যাবে মিলনের বিলাস। মানুষের দুর্দিনে মানুষ বিচলিত হচ্ছে না বলেই কবি এই প্রেমকে বিলাস বলছেন। প্রেমের কোন মহীয়ান মহিমাও তিনি দেখতে পান না, তাই বলেন —

হে ম্লান মেয়ে, প্রেমে কী আনন্দ পাও,
কী আনন্দ পাও সন্তান ধারণে?

এখানে কবি প্রেমকে প্রবৃত্তির তাড়না ছাড়া আর কিছুই ভাবছেন না। প্রেমের মহত্তর কোন দিক থাকলে বর্ষার ঐ বিধ্বস্ত চেহারায় মানুষ আনন্দ পেতে পারে না।

কবিতায় দুর্ভিক্ষের স্বেচ্ছাসেবকেরা 'শহরের রাস্তায়' ঘুরছে। কবি এদের চাঁদা চাইবার ভঙ্গীকেও ব্যঙ্গ করছেন, বলছেন — সদল বলে আর্তনাদ করছে। এখানে শহরের রাস্তা বলে তিনি কবিতাটির প্রেক্ষাপট বোঝাতে চেয়েছেন।

দ্বিতীয় 'মেঘদূত' কবিতায় প্রথম স্তবকে ম্লানে রবী-দ্রনাথের প্রবন্ধের ব্যাখ্যায় ব্যস্ত কবি —'প্রত্যেক দুটি মানুষের মধ্যে যে বিপুল, গভীর বিরহ' তারই ব্যাখ্যা। ছুটির ঘন্টা বেজে গেল। আকাশের মেঘ দেখে কবির মনে জাগল ছেলেবেলায় জেনে ভেজার আনন্দের কথা। সেই আনন্দ এখন পরিণত বয়েসে আর নেই। বৃষ্টির আভাসে যখন পথে ধুলো উঠেছে তখন তাঁর মনে হচ্ছে 'সাঁওতাল পরগণার মেঘ মদির আকাশ' ছেলেবেলার দিনগুলোর জন্য তাঁর মনে বেদনা জাগছে। সাঁওতাল পরগণার স্মৃতি মেদুর কবির মনে কিন্তু একথাও জাগে —

আর এখন বাড়ি ফিরে কী হবে।
তার চেয়ে ভালো
কাছাকাছি কোন বন্ধুর আড্ডা, কোন হস্টেল,
সেখানে উত্তেজনাহীন অশ্লীলতায়
কাটুক একটি সন্ধ্যা।

ছেলেবেলার জন্যে ভেতোর আনন্দের পর বন্ধুর আড্ডায় বা হস্টেলে যিনি উত্তেজনাহীন অশ্লীলতায় সন্ধ্যা কাটতে চান তাঁর মধ্যে এক বৈপরীত্য রয়েছে। সাঁওতাল পরগণার স্মৃতিতেও তাঁর সেই মনের ভাবনার ছবি পাওয়া যায়।

সাঁওতাল পরগণার নিঃসঙ্গ রুক্ষতা।
ধুলো ভরা নির্জন পথে মোটরের কর্কশ শব্দে
একটি হরিণের ঊর্ধ্বশ্বাস, ধাবমান বেগ
আর সেই ক্ষিপ্রগতি চঞ্চল রেখায়,
উর্বশীর দীর্ঘশ্বাস —

এখানে উত্তেজনা অশ্লীলতায় যেমন একটি বিশিষ্ট মানসিকতাকে বোঝা যায় তেমনি সাঁওতাল পরগণার স্মৃতির মধ্যে মোটরের কর্কশ শব্দের আমদানী করে বা উর্বশীর দীর্ঘশ্বাসে সেই মনটির পরিচয়ই আর একটু বিশদ হয়। কারণ সাঁওতাল পরগণা যে নাগরিক জীবনের ক্লান্তি থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা আমরা জানি।

'নাগরিকা' নামেও সমর সেনের দুটো কবিতা রয়েছে 'কয়েকটি কবিতায়'।

প্রথম কবিতাটিতে ঘন অন্ধকার ও রুক্ষতার মধ্যে একটি রমনীর বর্ণনা। কবির কাছে মেয়েটির শরীর 'কালো পাথরের মত,' আর চোখের দৃষ্টিতে আছে 'কীসের ক্ষুধার্ত দীপ্তি, 'কঠিন ইশারা,' 'হিংস্র হাহাকার'। সচরাচর

নায়িকার দৃষ্টিতে দেখি আমরা সুদূরতা বা গভীরতার ছবি কিন্তু এখানে ক্ষুধার্ত কঠিন ইশারা বা হিংস্র হাহাকার থেকে কবির বিশিষ্টতা বোঝা যায়। বর্তমান জীবনের বিশেষণগুলিই তিনি এই নায়িকার ওপর প্রয়োগ করেছেন।

দ্বিতীয় কবিতাটিতেও প্রান্তরের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসছে একটি ক্লান্ত শ্বেতাঙ্গিনী —

তারপর শীর্ণ হাতে
অলস, অলসভাবে ঠোঁটে মাখান রং,
আর পাউডার মুখে;

পরের স্তবকে মেয়েটি ভাবছে যদি হঠাৎ এখানে সমুদ্র এসে পিচের রাস্তাকে মুছে দেয়, মুছে দেয় বিশ্ব চরাচর এবং চোখের ক্লান্তি —

তাহলে আমার সমস্ত শরীরে কি আবার চকিতে আসবে
সমুদ্র মদির উর্বশীর স্বপ্ন ?

এই নাগরিকা নামের দুটো কবিতাতেই রমনীর আবির্ভাব ঘটছে অন্ধকারে আর দুজনেই ক্লান্ত বিধ্বস্ত। প্রথম মেয়েটির চোখে হিংস্রতা দ্বিতীয়জনের ক্লান্তি। অর্থাৎ দুজনেই নাগরিকা। চোখের ক্লান্তিতে, ঠোঁটের রঙ মাখানোতেও সেই প্রমাণ ছড়ানো। দ্বিতীয় নাগরিকা উর্বশী হতে চাইছে। উর্বশী স্বর্গের অপ্সরা— তার সাথে জড়ানো আছে স্বেচ্ছাচার ও রমনার অনুসঙ্গ। তাই মনে হয় 'নাগরিকা' এখানে শুধুমাত্র নগরে বাসকারী রমণী নয় নগরের অর্থাবনত অর্থের সাথেও তা যুক্ত। প্রথম নাগরিকার ক্ষুধার্ত ইশারা আর দ্বিতীয় জনের অবয়বে সেই কথাই তুলে ধরা হয়েছে।

উর্বশীর প্রসঙ্গ সমর সেনের কয়েকটি কবিতায় বার বার এসেছে। উর্বশী তাঁর কাছে অতীতের সৌন্দর্য, বর্তমানের ব্যর্থ বাসনা ও স্বেচ্ছাচারিতার প্রতীক। এই অতীত সৌন্দর্যের জন্য বর্তমানের মানুষ কামনার দীর্ঘশ্বাস ফেলে। কারণ বাস্তবের কঠিন মাটিতে উর্বশীর দেখা মেলে না। আধুনিক জীবনে স্বর্গের অপ্সরা রূপান্তরিত হয়ে যায় 'চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের' উর্বর মেয়েতে। উর্বশী নামক কবিতাটিতে দেখি —

তুমি আসবে আমাদের মধ্যবিত্ত রক্তে
দিগন্তে দূরন্ত মেঘের মতো।
কিংবা আমাদের ম্লান জীবনে তুমি কি আসবে;
হে ক্লান্ত উর্বশী,
চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে যেমন বিষন্ন মুখে
উর্বর মেয়েরা আসে :
কত অতৃপ্ত রাত্রির ক্ষুধিত ক্লান্তি,
কত দীর্ঘশ্বাস,
কত সবুজ সকাল তিক্ত রাত্রির মতো,
আর কতদিন!

মধ্যবিত্তের জীবনে 'উর্বশী' আসে না। বর্তমানে উর্বশীর মত মেয়েদের যেতে হয় চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে। সেখানে অন্যের মনোরঞ্জনে নিজেদের জীবনকে ক্ষয় করে, ক্লান্ত করে। তাদের বিষন্ন মুখে লেগে থাকে তিক্ততার রেশ। উর্বশীর স্বপ্ন আজ তাই অবাস্তব। এখানে কবিতার বিষয় আর চিত্তরঞ্জন সেবাসদন নামের তির্যকতা কবির নাগরিক মননজাত।

'মুক্তি' নামক কবিতায় — স্বপ্নের দেশে যেখানে শিশিরই বসন্ত নামবে সেখানে গিয়ে 'কোন একটি মেয়েকে' ভুলতে চাইছেন, ভাবছেন —

'একটি মানুষকে ভুলতে কতোদিনই আর লাগে,
কতো দিনইবা লাগে শরীর থেকে মুছে ফেলতে
আর একজনের শরীর সর্বস্ব আলিঙ্গন,
মধ্যবিত্ত আত্মার বিকৃত বিলাস,
স্যাকারিনের মতো মিষ্টি
একটি মেয়ের প্রেম।

এরপর তিনি ভাবছেন সেই স্থানের কথা যেখানে বসন্ত আসে না, সাইকেলে করে ঘরে ফেরা কেরাণীর ক্লান্তি যেখানে লেগে থাকে, যেখানে —

ডাস্টবিনের সামনে
মরে যাওয়া কুকুরের মুখের যন্ত্রণায়
সমস্ত কাটে'-সেখানে সেই প্রেম ভোলা সহজ নয়।

প্রেমকে শরীর সর্বস্ব আলিঙ্গনমধ্যবিত্ত আত্মার বিকৃত বিলাস বলে মনে করা, মিষ্টি মেয়েকে স্যাকারিনের সাথে তুলনা করা কবিতাটি লক্ষণীয় দিক। সেইসঙ্গে সাইকেল ফেরা কেরাণী বা ডাস্টবিনের সামনে মরা কুকুরের চিত্রকল্পগুলিও তাৎপর্যপূর্ণ।

শুষ্ক ভাষায় রূপের ছবি তিনি এই কবিতাগুলিতে দেখান নি। কিন্তু তাঁর ভাবনা, প্রথাসিদ্ধ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দেখে তাঁর মানসিকতার অবস্থান তো বটেই এমন কি কবিতার ভবিষ্যৎ যে একান্ত নাগরিকতা সহজেই অনুমান করা যায়।

শুষ্ক ভাবে শহরের বা আরো নির্দিষ্ট করে বলনে, কলকাতার ছবি আছে 'নাগরিক' 'স্বর্গ হতে বিদায়' 'একটি বেকার প্রেমিক'

কবিতায়।

নাগরিক কবিতায় 'মহানগরীতে এল বিবর্ণ দিন তারপর আলকাতরার মতো রাত্রি' বলে যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তা কোলকাতা শহরের। রোলারের শব্দ, গলানো পিচের গন্ধ, আর ইঁটের অরণ্য নিয়ে যে শহর গড়ে উঠেছে এই কবিতা তারই।

মহানগরীতে এল বিবর্ণ দিন, তারপর আলকাতরার মতো রাত্রি
*** *** *** *** ***
আর কত লাল শাড়ী আর নরম বুক, আর টেরিকাটা মসৃণ মানুষ
আর হাওয়ায় কত গোল্ড ফ্লেকের গন্ধ,
হে মহানগরী!
যদি কোনোদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে বসন্ত বাতাসে
স্কুল আর কলেজ হলো শেষ, ক্লাইভ স্ট্রীট জনহীন,
দশটা পাঁচটার দীর্ঘশ্বাস গিয়েছে থেমে
সন্ধ্যা নামল :
মাঝে মাঝে সবুজ গাছের নরম অপরূপ শব্দ,
দিগন্তে জ্বলন্ত চাঁদ, চিৎপুরে ভিড়,
কাল সকালে কখন সূর্য্য উঠবে।
কলেরা আর কলের বাঁশি আর গণোরিয়া আর বসন্ত
বন্যা আর দুর্ভিক্ষ
পৃথিবী বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা:

এই বর্ণনায়ক্লাইভ স্ট্রীট, দশটা পাঁচটার ভিড়, চিৎপুর এসবের মাঝখানে থেকে আমরা পাই আমাদের চেনা শহরটির ছবি। কোলকাতাকে ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে

ঘৃণা করা, এই শহরের সঙ্গে নিয়তির মত অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে পড়ার কথা দিয়ে কবিতাটি অসাধারণ করে তুলেছে —

যতদূর চাই ইটের অরণ্য,
পায়ে চলা পথের শেষে কান্নার শব্দ।
ভস্ম অপমান শয্যা ছাড়ো
হে মহানগরী।
রুদ্ধশ্বাস রাত্রির শেষে
জ্বলন্ত আগুনের পাশে আমাদের প্রার্থনা,
সমান জীবনের স্পষ্ট চকিত স্বপ্ন —

সমান জীবনের প্রতি তাঁর আকাঙ্খাও এই শহরকে ভালবেসেই জেগেছে তাই তিনি ঝড়ের নিঃশব্দ সঞ্চরণের জন্য অপেক্ষা করছেন।

'স্বর্গ হতে বিদায়' কবিতায়ও কোলকাতা শহরের বর্ণনা দিয়েছেন —

ম্লান হয়ে এল রুমালে
ইভনিং ইন প্যারিসের গন্ধ—
হে শহর, হে ধূসর শহর!
কালিঘাটের ব্রিজের উপরে কখনো কি শুনতে পাও
নষ্টের পদধ্বনি
কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও
হে শহর, হে ধূসর শহর।

কালের যাত্রার ধ্বনি শুনতে পেয়েছেন এই শহরের কবি, সেই ধ্বনি বর্তমানের মুখে উন্মত্ত মূল্যবোধহীন পৃথিবীর। তাই সেই ধ্বনি নষ্টের মত।

এই পৃথিবীতে লোকের ভিড়ে দেখা যায় উর্বশীর নাচ — সেই উর্বশীরা দশটাকায় কেনা কয়েক প্রহরের আমোদের বস্তু মাত্র। তাকে নিয়ে তা-ডব উল্লাসে মেতে উঠে 'অমৃতের পুত্র'রা। এদের কাছে প্রেম অবিনশ্বর নয় —

মোটরে আর বারে
আর রবি বারে ডায়মন্ডহারবারে
কয়েক টাকায় কয়েক প্রহরের আমার প্রেম —

একালের নায়কেরা পুরুরবা নয়, 'আমি নহি পুরুরবা হে উর্বশী' তাই এদের প্রেম ক্ষণস্থায়ী — বিরহে কোন সৌন্দর্য নেই। কালিদাসের যুগের প্রেম এই পৃথিবীতে এই শহরে অচল, রবীন্দ্রনাথের ভাবনার অমৃতের পুত্র মানুষ ও আর নেই।

কালীঘাটের ব্রিজের ওপর লরীটের পদধ্বনি যেমন স্থানটিকে চিহ্নিত করছে তেমনি দৈবী মহিমাতেও আঘাত দিচ্ছেন কবি। শুধু তাই নয় বর্তমান সভ্যতা যাত্রা করছে কোন অতলের দিকে তাও যেন দেখান।

'পোস্ট গ্রাজুয়েট' কবিতায় 'দিকে দিকে আজ হানাদেয় বর্বর নগর' বলে নগরায়নের অগ্রগতিকে দেখিয়েছেন। সেই সঙ্গে বলেছেন— লাবণ্যের প্রেম অথবা অন্ধকারে 'নতুন জীবনের স্বপ্ন' বইয়ের পাতাতেই সম্ভব — জীবনে নয়। কারণ জীবনে রয়েছে শান্টিং স্টেশনের কর্কশ কোলাহল, খনির দীর্ঘ অন্ধকার, তিনে তিনে রুদ্ধশ্বাস মৃত্যু। বর্বর নগরের আঘাতে মানুষের জীবন মরুভূমির মত শূন্য হয়ে উঠছে।

একটি বেকার প্রেমিক কবিতাতেও তিনি শহরের কথা বলেছেন —

চোরাবাজারে দিনের পর দিন ঘুরি

* * * * *

খিদিরপুর ডকে রাতে জাহাজের শব্দ শুনি,

* * * * *

আর শহরের রাস্তায় কখনো বা প্রাণপণে দেখি
ফিরিঙ্গি মেয়ের উদ্ধত নরম বুক।
আর মদির মধ্য রাতে মাঝে মাঝে বলি
মৃত্যুহীন প্রেম থেকে মুক্তি দাও,
পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী আনো
হয়নো ইশাইয়ের মতো উদ্যত দিন।
কলকাতার ক্লান্ত কোলাহলে
সকালে ঘুম ভাঙ্গে
আর সমস্তক্ষণ রক্ত জুলে
বণিক সভ্যতার শূন্য মরুভূমি।

কলকাতার ক্লান্ত কোলাহল, চিৎপুর বা খিদিরপুরের ডক, কোথাও কালীঘাট সুনির্দিষ্ট ভাবে শহরকে বাস্তব করে তোলে। বিংশ শতকের প্রথম দিকের কলকাতা তার ভৌগলিক যাথার্থ্য, তার জীবনযাপনের বিশিষ্টতায় সত্য হয়।

এই কাব্যগ্রন্থটির কয়েক জায়গায় মৃত্যুর প্রসঙ্গ এসেছে। যেমন —

ক) তুমি যেখানেই যাও,
কোনো চকিত মুহূর্তের নিঃশব্দতায়
হঠাৎ শুনিতে পাবে,
মৃত্যুর গম্ভীর, অবিরাম পদক্ষেপ। [১০]

খ) আমাদের মৃত্যু হবে পাণ্ডুর মতো। [১১]

গ) মহান মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় নেই,
বিদ্যুতের আলোয়,
তিনে তিনে মৃত্যু রুগ্নশ্বাস মৃত্যু আমাদের প্রাণ। [১২]

এই মৃত্যু ভাবনা, মহান বা রাবীন্দ্রিক নয়। তা যেন রুগ্নশ্বাস পাণ্ডুর মত নির্মম মৃত্যু। হতাশা, দুঃস্বপ্ন আর ক্লান্তির উৎস জাত এই মৃত্যু ভাবনা। শুধু তাই নয়, আধুনিক মনন সভ্যতার শিখরে সমাসীন বিশ্বের নিষ্করুণ ও অপঘাত বিনষ্টির কথা অনিবার্য বলে মেনে নেয়। মৃত্যু অমৃত নয়— সর্বনাশা অংক। তারই প্রতিফলন সমর সেনের মৃত্যু ভাবনায়।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকেই সমর সেন নাগরিক কবি হিসাবে একটা ইমেজ গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর কবিতাগুলির আলোচনায় সেকথা যেমন বোঝা যায় তেমনি সেই সময়ে প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকেও তা জানা যায়। বুদ্ধদেব বসু তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেছেন :

" নাগরিক জীবন আমরা আরম্ভ করেছি অনেকদিন, কিন্তু আমাদের কাব্যে এ পর্যন্ত বেশির ভাগই পাওয়া গেছে রাখাল বালকের চোখে পল্লী প্রকৃতির ছবি। নাগরিক জীবনের খণ্ড খণ্ড ছবি উল্লেখ কোনো কোনো আধুনিক কবিতে থাকলেও সমগ্রভাবে আধুনিক নগর-জীবন সমর সেনের কবিতাতেই ধরা পড়ল। সমর সেন শহরের কবি, কলকাতার কবি, আমাদের আজকালকার জীবনের সমস্ত বিকার, বিক্ষোভ ও ক্লান্তির কবি। ঠিক যেন শহরের সুরটি ধরা পড়েছে তাঁর ছন্দে।" [১৩]

আবির্ভাবের অল্পকালের মধ্যেই নাগরিক জীবনের কবি

হিসাবে যে স্বীকৃতি পেয়েছে পরবর্তী সময়ের সমালোচকদের কাছেও তিনি সেই স্বীকৃতি পেয়েছেন। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত সমর সেন বিষয়ে লিখেছেন —

সমর সেন চল্লিশের দশকের প্রথম প্রতিনিধিস্থানীয় নাগরিক কবি। পূর্ববর্তী তিরিশের কবিদের মধ্যেও কেউকেউ কবিতায় নাগরিক পরিবেশকে স্পষ্ট করে এঁকেছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দের কোনো কোনো কবিতা স্মরণীয়। তৎসত্ত্বেও সমর সেনের কবিতায়ই এই প্রথম নাগরিক জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা, আর্তি ও হতাশা ব্যাপকরূপে প্রতিবিম্বিত হলো। [১৪]

সমর সেনের নাগরিক কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটেছিল তাঁর কয়েকটি কবিতা থেকেই॥

॥ তিন ॥

'গ্রহণ' সমর সেনের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ — প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪০ সালে। পরে সংকলন প্রকাশের সময়, ১৯৩৭ - ৪০ এই সময়ের মধ্যে কবিতা গুলিকে রাখা হয়েছিল এবং গ্রহণ নামটি বর্জন করেছেন কবি।

সমর সেনের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নামের মধ্যে কোন বিশেষ ব্যঞ্জনা ছিল না। 'কয়েকটি কবিতা' নামটি সাধারণের চাইতেও সমান্তরাল। কিন্তু গ্রহণ নামটি তা নয়। এই নামের মধ্য দিয়ে তিনি জীবন ও সময়ের নিদারুণ অবক্ষয়কে যেন খানিকটা রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। বিশ্বযুদ্ধ তখন শুরু হয়েছে ফলে বড় ধরণের অবক্ষয়ের আরম্ভও ঘটেছে। এই ক্ষয় তাঁর কাব্যগ্রন্থের নামকরণে ছাপ ফেলেছে।

এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি তিনটি ভাগে ভাগ করা। প্রথম অংশের কোন নাম নেই। এই অংশে মোট ছয়টি কবিতা আছে। দ্বিতীয় অংশের নাম 'বর্মশেষ' এতেও ছয়টি কবিতা রয়েছে। তৃতীয় অংশ 'গ্রহণ' এতে আছে দশটি কবিতা। অর্থাৎ মোট বাইশটি কবিতা এই কাব্যগ্রন্থে রয়েছে। কবিতাগুলি অধিকাংশই 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে 'গ্রহণ ও অন্যান্য কবিতা' নামে সংকলিত হয়।

গ্রহণের প্রথম কবিতা 'অখ্যাত নায়ক' এই নায়ক শহরের। তার ঘোরাফেরা শহরের মধ্যে, যে শহর-কোলকাতার কথা মনে করার। তার মানসিকতাও নাগরিক।

বাসের সামনে ভিখিরিরা ভিড় করে,
হাওয়ায় মেঘের শব্দ
আর বৈশাখের বৃষ্টিতে ভেজা অপরূপ শহর।

পঙক্তি তিনটি একটা চেনা দৃশ্য রচিত করে। শহর শব্দটি সেই দৃশ্য রচনায় সাহায্য করে। তারপর 'মোটরের সীটে দেখি' শনিবারের বিলাস' 'হর্ণের আকস্মিক শব্দ' 'মৃধর রাস্তা' আর মাঠের অন্ধকারে প্রেমিক ফিরিঙ্গির ভিড়' — সেই ছবিকে আরো স্পষ্ট করে তোলে। আর এই শহর কলকাতা শহর বলেই মনে হয় কারণ ফিরিঙ্গির ভিড় বা শনিবারের বিলাস মফঃস্বলে পাওয়া সম্ভব নয়।

গম্ভীর শব্দে শহরের উপরে আকাশ কাঁপে,
নিচে বিবর্ণ বস্তি
আর হলুদ ঘাসের মাঠ।

শহরের আকাশ শান্ত নয়, যান্ত্রিক যানের চলাচলে তা কম্পিত। এখানে বস্তি-বিবর্ণ, মাঠের ঘাসও নিষ্প্রাণ হলুদ। এই বিবর্ণতা এসেছে যন্ত্রের আগ্রাসিতা থেকে। এই যান্ত্রিকতা এমে কবিতার নায়ক তথা সকল মানুষকেই শ্বাসরুদ্ধ করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দিচ্ছে।

তৃতীয় কবিতা 'ঘরে বাইরে'তে কবির জীবনের প্রতি বিমুখ কবি মনটি উপস্থিত। কবিতার আরম্ভে তিনি যে লাইনটি ব্যবহার করেছেন I have been born, and once is enough - - - - — তাতে জীবনের প্রতি বিরাগই প্রকাশিত। কবিতার ভিতরে গেলে দেখা যাবে যে, জীবন এবং পৃথিবী এই দুইয়ের প্রতিই তাঁর যুগপৎ আশা ও নিরাশার কথা তিনি ব্যক্ত করেছেন —

তোমার ক্লান্ত উরুতে একদিন এসেছিল
কামনার বিশাল ইশারা!

ট্যাকেতে টাকা নেই
রঙিন পণিকার দিন হলো শেষ
আজ জীবনের কুঁজ দেখি তোমার গর্ভে,
'সেইদিন নৃত্য হোক, যেদিন পুরুষ পৃথিবীতে আসে।'
সময়ের চূর্ণ পাহাড়ে শিঙ্গিল মানুষেরা ঘরে,
কর্কশ কাকের কণ্ঠে শুনি ধ্বংসের গান,
আর গর্ভের ঘুমন্ত তপোবনে কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ
তোমাকে নিরন্তর কাপুরুষ প্রহার করে
সেইদিন নৃত্য হোক যেদিন মানুষ পৃথিবীতে আসে।

মানুষ এবং পৃথিবীর প্রতি কবি বীতশ্রদ্ধ আর তার কারণ দারিদ্র, অসুন্দরতা ও কাপুরুষতা। মহাযুদ্ধের ভগ্নদূত যখন দুয়ারে এসে উপস্থিত হয়েছে তখনো মানুষের চৈতন্য জাগ্রত হচ্ছে না বা মানুষ তখনো বিনাশে মত্ত এই অদ্ভুত স্বার্থপর পৃথিবী তিনি যেন চান না।

এই অবস্থায় কবির স্মৃতিতে হঠাৎ যেন ভেসে আসে একটি শহরের কথা, যে শহর ঢাকা ছিল শালবনের অন্ধকারে, পাহাড়ের মত প্রাসাদ ছিল যেখানে, আর ছিল প্রেম। সেই সুন্দর নগর- কল্পনা থেকে তিনি বাস্তবের কঠিন মাটিতে নেমে আসেন —

আর আজো তো আছে
কাঁচা ডিম খেয়ে প্রতিদিন দুপুরে ঘুমু,
স্ফীতোদর দাম্ভিক স্বামীর পিছনে গর্ভবতী সতীসাবিত্রী,
আর বন্যার মতো পুত্রকন্যা, অরণ্যে রোদন;
হে ঈশ্বর, এ কী অপরূপ।
অনুর্বর বালুর উপরে
কর্কশ কাকেরা করে ধ্বংসের গান।

অন্তঃসার শূন্য এই সমাজে ধীরে ধীরে যে ধ্বংস ঘনিয়ে আসছে তাকে ত্বরান্বিত করে মহাযুদ্ধ আর 'নীলরক্ত-বান নীলকর কবন্ধ'। এই ধ্বংস, মৃত্যু বা ক্লান্তিতে কিন্তু সমর সেন কবিতাটি শেষ করেন নি। হঠাৎ করে তিনি কবিতার শেষে বিপ্লবের স্বপ্ন এঁকে দিলেন। এই স্বপ্ন বা আশা সমর সেন সুলভ হয়তো সর্বাংশে নয়। তবু একারণে উল্লেখযোগ্য ধ্বংসের কালের মাঝেও মানুষ, নাগরিক মানুষও সুন্দরের স্বপ্ন দেখে —

তবু জানি, কালের গলিত গর্ভ থেকে বিপ্লবের ধাত্রী
যুগে যুগে নতুন জন্ম আনে,
তবু জানি,
জটিল অন্ধকার একদিন জীর্ণ হবে চূর্ণ হবে ভস্ম হবে
আকাশ গঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে

যতদিন তা না হয় ততদিন মানুষের ওপর মানুষের অত্যাচার চলতে থাকবে।

'সন্ধ্যা ও প্রভাত' কবিতায় তিনি কোলকাতা শহরের সন্ধ্যাও প্রভাতের বর্ণনা দিচ্ছেন।

শূধু জনহীন চৌরঙ্গীতে পাথরের মূর্তি,
ধনির আগুনে সূর্যাস্ত আসে।

আবার পরদিন 'শহরের প্রখর সকালে' কবি দেখেন লাল জীবনের জোর। দূর থেকে ভেসে আসে শবযাত্রার ধ্বনি। এই মৃত্যু জীবনের ব্যর্থতায় আসে। কবি দেখতে পান—

—বসন্তের কার্জন পার্কে
বর্ষার সিক্ত পশুর মতো স্তব্ধ বসে
বজ্রদেহ নায়কের দল
বিপলিত বিমনতায় ক্ষুরধার স্বপ্ন দেখে;
ময়দানে কটনীড় মানুষের দল।

ফরাসি ছবির আমন্ত্রণে, ফিটনের ইঙ্গিতে আহ্বানে
ধনির আগুনে রক্ত-মাখে সূর্যাস্ত এল।

যে জটিল জাল শহরের আকাশে ছড়ানো সেই জালে শহরের মানুষ আবদ্ধ। এরা যখন কার্জন পার্কে বসে আছে তখন মনে হয় এরা যেন পশুর মতো স্তব্ধ — বোধহীন বুদ্ধিহীনপশুতে পরিণত এরা। আর একদল ঘুরে বেড়ায় ময়দানে—এদের জীবনের নীড় নষ্ট — মূল্যবোধহীন এরাও ফিটনের ইঙ্গিত বা ফরাসি ছবির আমন্ত্রণ এই বোধহীনতাকে স্পষ্ট করে। এরই মধ্যে সূর্যাস্ত আসে, আসে ধনির আগুনের মত লাল হয়ে। দুবারই সূর্যাস্তকে তিনি ধনির আগুনের লালের সাথে তুলনা করছেন। হয়তো ধনি বলে—শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জীবনের জাল থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে এই ইঙ্গিত দিচ্ছেন।

কবিতাটিতে শহর, কার্জন পার্ক, চৌরঙ্গী, ময়দান শব্দগুলি কোলকাতাকে চিহ্নিত করছে।

'কয়েকটি দিন' কবিতার শুরুতে তিনি বলছেন —

নদীর জলে
শৈশবে দেখেছি গলিত উলঙ্গ শব।

শৈশবের কোন মধুর স্মৃতিতে কবিতার আরম্ভ নয়, আরম্ভ হচ্ছে রূঢ় কঠিন মৃত্যুতে। তারপর তিনি প্রকৃতির বর্ণনা দিচ্ছেন বলছেন, গ্রীষ্মে কৃষ্ণচূড়া গাছে ফুল আসে দেখেছেন, শেয়াল অথবা কোকিলের ডাকও শুনছেন। যে স্থানের বর্ণনাটি দিচ্ছেন তা শহর নয় —'শহর হতে বহুদূরে'। এখানেও কিন্তু দূরত্ব পরিমাপের একদিকে শহরকে রেখেছেন তা লক্ষ্য করার মত।

এরপর তিনি পৃথিবীর অবস্থার কথা বলছেন। বলছেন,

পৃথিবীতে সৃষ্টিহীনতার অন্ধকার নেমেছে দীর্ঘ দিন, করাল রৌদ্র আর তারই মাঝে ধাবমান কাল'। গ্রামে গ্রামে কাবুলিরা এসে হানা দেয়, বর্বর ভাষায় বকে যায়। চায়ের দোকানে ভিড় করে বিকট মানুষেরা। চারিদিকে মড়কের কোলাহল ওঠে, তার মধ্যে শোনা যায় 'নতুন শিশুর কান্না'। এই মৃত্যু আর জন্ম যেন 'বেলাভূমির সমুদ্রের শেষহীন সঙ্গম'। এই ধ্বংস আর মৃত্যুর মধ্যে কবি যে ভবিষ্যতকে দেখছেন তা দুঃস্বপ্ন

বৃদ্ধ শিশু আর বুদ্ধিহীন বৃদ্ধের দল
স্খলিত দাঁতের ফাঁকে কাঁদে আর হাসে
ট্রামে আর বাসে,
দূরে পশ্চিমে
বিপুল আসন্ন মেঘে অন্ধকার স্তব্ধ নদী।

আসন্ন যুদ্ধ পৃথিবী থেকে যৌবনকে নিশ্চিহ্ন করবে, থাকবে 'বৃদ্ধ শিশু' আর বুদ্ধিহীন বৃদ্ধ'। পৃথিবীর জন্য সেই সময় বড় সুখের সময় নয়।

কবিতাটিতে যুদ্ধে মগ্ন যে পৃথিবীর বর্ণনা দিয়েছেন, মন্বন্তরের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে বেদনা বিদ্ধ একটি মনকে ছোঁয়া যায়। গ্রাম শব্দটি এখানে উচ্চারিত হলেও এই গ্রাম আমাদের চেনা পল্লী গ্রাম নয়— এই গ্রাম শহরের ছায়া মাত্র। আসন্ন যুদ্ধের প্রভাবে এই গ্রামেও নেমেছে অভাব— মানুষ ঋণগ্রস্থ, অযথা ক্ষতান্তরে তারাও সময় নষ্ট করে। তাই একে চিরাচরিত পল্লী গ্রাম বলে মনে হয় না।

'একটি বুদ্ধিজীবী' কবিতাতেও তিনি আসন্ন যুদ্ধের বর্ণনাই দিয়েছেন। যখন পৃথিবীতে শান্তি নেই 'লোকারণ্যে ঐশ্বর্যের সূর্য ছড়ায় ছায়ার দুঃস্বপ্ন' তখন বুদ্ধিজীবী তার সময় কাটায় অদ্ভুত নিস্পৃহতায় —

'নিষ্ফল দিন কাটে ফয়রুণীর কামার্ত প্রার্থনায়,
তাই ঘরে বসে সর্বনাশের সমস্ত ইতিহাস
অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মতো বিচলিত শুনি,
আর ব্যর্থ বিলাপের বিকারে বলি :
আমাদের মুক্তি নেই, আমাদের জয়াশা নেই,
তাই ধ্বংসের ফয়রোগে শিক্ষিত নপুংসক মন
সমস্ত ব্যর্থতার মূলে অবিরত খোঁজে
অপ্সরতি উর্বশীর অভিশাপ।

এই বুদ্ধিজীবী আধুনিক শিক্ষিত মানুষের প্রতিভূ। উদ্যমহীন সময় কাটায় বিকারে আর বিলাপে। শিক্ষিত মানুষ নপুংসক মনের অধিকারী তাই এদের জন্য রয়েছে 'বন্ধ্যাভূমি আর নিষ্ঠুর দিগন্ত'। মুখে উন্মত্ত পৃথিবীতে নিস্পৃহ নির্জীব ভাবকে কবি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে বিদ্ধ করছেন এই কবিতায়।

'বর্ষশেষ' অংশের প্রথম কবিতা 'চিত্রাঙ্গদা'। এই কবিতাতেও অসুস্থ এক পৃথিবীর ছবি তুলে ধরছেন। এই অসুস্থতা আধুনিক মননজাত।

শোনো, শিশুর কান্নার মতো পাখির শব্দ।

বা,

আমাদের পিরীতি বানুর বাঁধ,
গণিকার প্রেম আমাদের উজ্জ্বল পৃথিবী।

অথবা,

ক্লীবের কুণ্ডল কানে, বিজয়ী অর্জুন আজ
পণ্যযুবতী সংকুল পথে সম্মোহনে ঘোরে,
কালের কুক্ষিত মত ম্লান মুখে।

এইসব পঙক্তি কবির ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ের আর্তিকে মূর্ত করে তোলে।

পরের কবিতা 'এবার ফিরাও মোরে'। এই কবিতায় তিনি 'পড়ন্ত রোদে নগর লাল হলো' দেখে মনে করছেন বহুদূর দেশের কথা, যেখানে পাহাড়ের ছায়া এসে পড়ে প্রান্তরে, অন্ধকারে নদীর ধারা বয়ে চলে— সেই দেশে ফিরতে চাইছেন। লক্ষণীয় রবীন্দ্রনাথের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় কল্পনা লোক থেকে বাস্তবে ফিরতে চেয়েছেন — সমর সেন যেন নগর বাস্তবতা থেকে দূর দেশে ফিরতে চাইছেন।

'সংক্রান্তি' কবিতায় বৃদ্ধ আহুরে পীত বসন্তের খবর আছে। এই শহরে বসন্ত আসে 'ফয়রুপীর কাশি পাগলের হাসি আকাশে' ভাসিয়ে; মৃত্যুর বন্যা নামে। মাঝে মাঝে বাঁচার আশা, প্রাণের আশা জাগে কিন্তু তা স্থায়ী হয় না।

মাঝে মাঝে ধানের সবুজে অগ্নিরেখা দেখি
সুদূর প্রান্তরে,
তারপর আসুন ভবিষ্যৎ
পঙ্গপাল সর্বনাশে বিদীর্ণ ধূসর।

শহরকে বৃদ্ধের সঙ্গে তুলনা করা বা বসন্তকে পীত বলে কল্পনা করা কবির বিশেষ মানসিকতাজাত।

'বর্মশেষ' গ্রন্থের অন্য তিনটি কবিতা 'বসন্ত' 'একটি কবিতা' 'বিরতি' — এতে আসন্ন মহাযুদ্ধের কথা আছে। সচেতন কবির পক্ষে এই যুদ্ধ বা যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখে চুপ করে থাকা সম্ভব ছিল না। আর বিশ্বযুদ্ধের প্রবলঅভিঘাত উপলব্ধি করতে বেশী সক্ষম হয়েছিল শহরের শিক্ষিত মানুষেরা। তাই তাঁদের চিন্তায় বা কাজে তখন সেই উপলব্ধির ছবি কোন না কোন ভাবে উঠে

আসছিল। তাই সেই যুদ্ধই এখানে কখনো অদৃশ্য পাহাড়ে বজ্রধ্বনি হয়ে, কখনো বা কানো হাওয়ায় গান ভাসিয়ে আমাদের স্মরণে এসেছে। একটি কবিতায়' রয়েছে আশ্চর্য তীক্ষ্ণ বাক্য ভঙ্গী —

বয়স তো হলো, আর কেন ভীমরতি,
প্রভুহীন কুকুরের মতো আর কতকাল।
আপন চর্চায় শুধু শূন্য ফানুস ফাঁসে,
বিধি হলে বাম
আপনি বাঁচলে বাপের নাম
সেদিন নেই।

এই ব্যঙ্গ সমর সেনকে বুঝতে সাহায্য করে।

বর্ষশেষের পরের অংশ 'গ্রহণ'— এই অংশের কবিতা গুলি বিষ্ণু দেকে উৎসর্গ করা হয়েছে। প্রথম কবিতা ' For Thine is the Kingdom- কবিতাটিতে 'শহর' শব্দটির উল্লেখ আছে —

দারুণ গ্রীষ্মে অভিশপ্ত ব্যাকুল মন
তোমার আদেশে শহরের দিগ্বিজয়ে ঘোরে—

শুধুমাত্র 'শহর' শব্দ নয় আরো কিছু পঙক্তি দিয়ে তিনি কলকাতাকে চিনিয়ে দেন —

এ্যাসেমব্লি হলে বিরহছলে মিলন আনো

বা,

বিরস কাজের সূত্রে
কতোদিনের ক্লান্তিতে কানের বাঁশি বাজে
পিছনে সময়ক্ষণ ক্ষিপ্রগতি বাসের শব্দ।

এছাড়া তিনি কবিতাটিতে আমাদের পরিচিত কিছু পঙক্তির বা শব্দের ব্যঙ্গাত্মক পরিবর্তনও করেছেন —

ক. এ্যাসেমব্লি হলে বিরহছলে মিলন আনো

খ. তাই বঙ্কিম ব্রহ্ম যীশু পরমহংস
সময় যখন আসে তখন সকলই মানি

গ. ভারি ট্যাঁক ছাড়া কিছুই টেকে না,
সবার উপরে আমিই সত্য,
তার উপরে নেই।

বিষয়বস্তু এবং এইসব শব্দ ও পঙক্তি ব্যবহার কবিতাটির উপরে শহুরে রঙ বুলিয়ে দেয়।

পরের কবিতা 'ট্রি-সমাস'-এ মহানগর শুধু চিহ্নিতই থাকে নি তার রূপ ও স্বরূপ নিয়ে প্রকাশিত —

শূন্য মাঠে কোটরহীন চোখের মতো গ্যাসের আলো জ্বেলে,
কার্নিভাল সুরু হলো, রেসখেলা শেষ,
কঙ্কালবর্ণ কুয়াশায় দেখো ছেয়েছে নগর।
এখনো আলোছায়া দেলে কারো-কারো চোখে,

শূন্য মাঠে, গ্যাসের আলো, রেসখেলা, কার্নিভাল ইত্যাদি নিয়ে কোলকাতা নগরটি কবিতার পাতায় উঠে গেছে। নগরের বিবর্ণতা বোঝাতে ব্যবহার করছেন 'কঙ্কালবর্ণ কুয়াশা' এই বিশেষণ। সচরাচর সমর সেন ধূসর শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। হয়তো মৃত্যুর সর্বব্যাপ্ত রূপে প্রভাবিত হয়ে কঙ্কালবর্ণ ব্যবহার করেছেন। তবে শব্দটির অভিঘাত এখানে তীব্রতর হয়েছে।

'বিতর্ক' কবিতায় 'বর্তমান মৃত-কচ্ছ, ভবিষ্যৎ হোঁচট'ওরা এই অবস্থায় 'এই দুর্মুখ পৃথিবীকে পিছনে রেখে'শেয়াল সংকুল কোনো নির্জন গ্রামে' সরে পড়তে চাইছেন। যদিও বুদ্ধিজীবী এই কবি জানেন পলায়ন সম্ভব নয় কারণ বিলাপের কাল চিরদিন থাকবে না। তিনি জানেন —

হয়তো অনেক যন্ত্রণার পর
নগর মন্থনে নীলকণ্ঠ আকাশের তলে
এক শ্রেণীহীন সাম্য রাজ্যপাশে খণ্ডছিন্ন বিক্ষিপ্ত পৃথিবী।

অনেক যুদ্ধ অনেক যন্ত্রণার পর বিষে নীল হয়ে যাওয়া এক পৃথিবী দেখা যাবে। সেই সঙ্গে দেখা যাবে 'প্রায় ব্রজবুলির মতো মধুর নতুন প্রেমে'র রোমন্থন।

কিন্তু এই পুনরাবৃত্তি, চরমতম সর্বনাশের দিনের স্মৃতি ভুলে যাওয়ার চাইতে —চকিত মৃত্যুর চরম লজ্জা বুঝি ভাল।' অথবা মৃত্যুর চাইতেও ভাল বা সবচেয়ে ভালো

জন্ম মৃত্যুর এই মধ্যস্থ পৃথিবীতে
নিরপেক্ষ মড়কের বীজ হয়ে আসা।

মানুষের প্রতি অশেষ হতাশায় ক্লান্ত কবি এখন আর মানুষ নয় — মড়কের বীজ হয়ে আসতে চাইছেন পৃথিবীতে। ধ্বংসের দিনে যে শত্রু-মিত্রের ভেদাভেদ রাখবে না।

এই কবিতায় 'শেয়াল সংকুল' যে গ্রামটির ছবি সমর সেন দিচ্ছেন তা এরকম —

নদীর উপরে যেখানে নীল আকাশ নামে
গভীর স্নেহে,

শেয়াল সংকুল কোনো নির্জন গ্রামে
কুঁড়ে ঘর বাঁধি;
গরুর দুধ, পোষা মুরগির ডিম, ক্ষেতের ধান,
রাতে কান পেতে শোনা বাঁশবনে মশার গান,
যেখানে দুপুরে শ্যাওলায় সবুজ পুকুরে
গরুর মতো করুণ চোখ
বাংলার বধূ নামে,
নিরালা কাল আপন মনে
পুরনো বিষন্নতা হাওয়ায় বোনে।

এরই পাশাপাশি শহরের কথা তিনি বলছেন — অনেক যন্ত্রণার পরে নগর মন্থনে নীল আকাশের নীচে নতুন পৃথিবী গড়ে উঠবে। তাঁর আঁকা গ্রামের ছবিটিতে এই মন্থনের কোনো আভাস নেই। বরং এই ছবি থেকে আসন্ন যুদ্ধের ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না। কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে সেই সময়কার গ্রামগুলির অবস্থা এত সুন্দর শান্ত ছিল না। নগরের মত বিষজর্জর অবস্থা না হলেও তখন গ্রাম বাংলার অবস্থাও খারাপই ছিল। আদ্যন্ত শহরের কবি সমর সেন সম্ভবত সেই অবস্থার কথা সম্যক জানতেন না অথবা তাঁর কাছে নগরের দুর্দিনই বেশী ভয়াবহ হয়ে দেখা দিয়েছিল।

গ্রহণ অংশের অন্যান্য কবিতাগুলিতে (অজ্ঞাতবাস, পলাতক, বক্ষধার্মিক, গ্রহণ, যাত্রা, শেষসন্ধ্যা) কঠিন সময়, সময়ের চাপে চাপাপড়া মানুষ, পলায়নপর মধ্যবিত্ত সমাজ, সমাজের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থার কথা আর কখনো সেই অবস্থার মাঝে চকিত কোন উত্তরণের আশা বিষয়বস্তু হিসাবে এসেছে। এই সব বিষয়ের মাঝেও দেখা যায় কখনো নগরজীবনের প্রত্যক্ষ ছবি, কখনো বা কলকাতার বিশেষ কোনো অঞ্চলের নাম কখনো তীক্ষ্ণ তীব্র কোন মন্তব্য — তারই মধ্যেই কবি সমর সেনকে চেনা সহজ হয়ে ওঠে। 'অজ্ঞাতবাস' কবিতায় বলছেন

আমি যাত্র
যেছুনির সামনে সরস কেরানি—

যেছুনি বা কেরানি শব্দ দুটি বা সমগ্র পঙক্তিটি শহরের বাজারের ছবি তুলে ধরে তুচ্ছতায় গ্রস্ত মানবিক অস্তিত্বকে তা যেন বিদ্ধ করে।

'বকধার্মিক' কবিতার বেশ কিছু পঙক্তি উদ্ধৃতির যোগ্য —

ক. এরোপ্লেনের চঞ্চল বেগ হাওয়ায় ওড়ায়
বকমুখ মন্ত্রীর নাম।

খ. সখি, শেষে কি গেরুয়া বসন অঙ্গেতে ধরে
ব্রহ্মচারী বেশে পণ্ডিচেরী যাব।

গ. ফেরি স্টিমারের ওপারে হাওড়ার পোল তোলা

ঘ. রাস্তায় হাসির গররায় ঘোরে তুখোর ইয়ারের দল,
রেস্তহীন গুলিখোর, গেঁজেল মাতাল,

ঙ. আবার ব্রাহ্ম মুহূর্তে
চিৎপুরের বারান্দায় কোকিল ডাকে,

এখানে হাওড়ার পোল, চিৎপুর, তুখোরইয়ার, গুলিখোর গেঁজেল মাতালে মিলে নগর কলকাতার নতুন এক 'হুতুম প্যাচার নকসা'। নবযুগের চিহ্ন বকমুখ মন্ত্রী এরোপ্লেন শব্দে।

'গ্রহণ' কবিতায় কবি —

জনহীন বাসে চেপে
ময়দানে উধাও।

'ময়দান' আমাদের কাছে কলকাতার স্মৃতি জাগায়। আবার

কীসের আগুনে আদিম আকাশ
নিঃশব্দে নেমে আসে,
শ্বাসরোধ করে আমার নাগরীর।

এখানেও নগরের শ্বাসরুদ্ধ অবস্থা থেকে কলকাতাকেই পাই। 'কানাকড়ি' কবিতায় 'ছিন্নভিন্ন সময়ের জানে / বন্যার জলে মাছ ধরার' সূক্ষ্ম রসিকতায় কবির তির্যক বাচনভঙ্গী প্রকাশিত।

'শেষ সন্ধ্যায় 'সিনেমার সামনে রুদ্ধশ্বাস ঊর্ধ্বমুখ মানুষের ভিড়'ও শহরজীবনের ছবিকে তুলে ধরে।

'গ্রহণ' কাব্যগ্রন্থের প্রায় সব কবিতারই সাধারণ বৈশিষ্ট্য আসন্ন দুঃসময়। সময়ের মুখে গ্রহণের কালো ছায়া নেমেছে বলে কবির বিশ্বাস। এই অবস্থায় মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে দোদুল্যমান অবস্থা দেখা গেছে— কবি নিজেও সেই সমাজের প্রতিনিধি। তাই তিনি গ্রহণ করেছেন এক বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গী। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এক সময় গ্রহণের সমালোচনায় লিখেছিলেন,

" সমরবাবুর বইয়ের যেকোন পাতা খুললেই বোধ হয় শ্লেষের কবিতা পাওয়া যায়, ...। এই বিদ্রূপ কবিতার কারণ তাদের শ্রেণী ভিত্তি। প্রকৃতপক্ষে এঁরা কেউই প্রোলেটারিয়েট দলভুক্ত নন এবং যেহেতু শুধু রুটির তাগিদেই মরিয়া হওয়া সম্ভব, তাই মরিয়াও এঁরা নন। অথচ আধুনিক বৈশ্য আদর্শে পীড়িত মন এঁদেরও — কারণ এই আদর্শ 'সভ্যতার আনন্দলোককে' ধ্বংস করতে চলেছে।

প্রকৃত মজদুর বোধে পায়ের শিকল ছাড়া তার হারাবার কিছু নেই, অথচ সামনে একটা পুরো পৃথিবী জয় করবার, কিন্তু মধ্যবিত্তের

তা বোঝা সম্ভব নয়। তাই বৈশ্য সভ্যতার অঙ্গীকৃতি প্রোলেটারিটের কাছে রূপ নেয় নিছক বিপ্লবের, এবং মধ্যবিত্তের কাছে রূপ নেয় অন্ততঃ আংশিকভাবে বিদ্রূপের।" [১৫]

সেই মধ্যবিত্ত সুলভ মানসিকতা থেকেই গ্রহণের কবিতাগুলিতে তীব্র ব্যঙ্গ এসেছে।

তখনকার পৃথিবীতে যুদ্ধের যে কালোছায়া পড়েছিল তা থেকেও তিনি দূরে থাকতে পারছিলেন না। অনুভূতিশীল কবি মনের পক্ষে থাকা সম্ভবও ছিল না। তিনি প্রায় সেই সময়েই লেখা -In Defence of the Decadants' সে কথার উল্লেখ করেছেন, —

> In these times of dereliction and dismay, of wars, unemployment and revolutions, the decayed side of things attracts us most. The boredom and the horror, rather them glory of life, is our immediate reality. [১৬]

গ্রহণ কাব্যগ্রন্থের বিষয়ের মধ্যে সামাজিক অবস্থাই প্রাধান্য পেয়েছে এবং সেই সমাজ-নাগরিক। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ও আধুনিক সাহিত্য প্রবন্ধে সেই স্বীকৃতি সমর সেনকে দিয়েছেন,

> 'সমরের কবিতায় মুক্তির আয়াস নেই। তার কারণ নয় যে সে মুক্ত। সমরের কাব্য গ্রহণ প্রধানতঃ সামাজিক। যার প্রতীক এই কলকাতার জীবনযাত্রা, সেই ব্যর্থতার প্রতিভূ হিসেবে তার কবিতার একত্ব।' [১৭]

॥ চার ॥

সমর সেনের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থের নাম 'নানাকথা'। প্রথম প্রকাশকাল - ১৯৪২ সাল। এতে পনেরোটি কবিতা রয়েছে। পরবর্তী সময়ে কিছু কবিতার সাথে নানাকথা নামটিও বাদ দেওয়া হয়েছে। '১৯৪০ - ১৯৪২' এই সময় সীমায় কবিতাগুলিকে রাখা হয়েছে।

এই সময়ে ভারত এবং বহির্বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল অগ্নিগর্ভ। বিশ্বযুদ্ধের ফলে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে যে সংকট সৃষ্টি হয়েছিল, ভারত তার থেকে দূরে ছিল না। তাছাড়া অসহযোগ আন্দোলন, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, আগস্ট আন্দোলন ইত্যাদির ফলে ভারতের রাজনৈতিক আকাশও ছিল বজ্রগর্ভ। খাদ্য-বস্ত্রের অভাব, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি মিলে এই অবস্থাকে আরো কঠিন করে তুলেছিল। সাধারণ মানুষই এই অবস্থায় বিচলিত বোধ করছিলেন। সুতরাং অনুভূতিশীল কবিমনে তার প্রভাব ছিল আরো সুদূরপ্রসারী। সমর সেন তার ব্যতিক্রম নন।

নানাকথার কবিতাগুলিতে সমাজজীবনের ছাপ গভীরভাবে পড়েছিল। 'কয়েকটি কবিতা' অথবা 'গ্রহণে' সেই অর্থে বৃহত্তর জীবনের ছাপ ছিল না। এইসময় পর্যন্ত তাঁর কবিতায় রাজনৈতিক ঘটনাবলী তেমনভাবে প্রভাব ফেলে নি। বরং ব্যক্তির নিজস্ব কামনা বাসনা, দুঃখ সংঘাতই ছিল তখনকার কবিতার উৎস। প্রেম পাওয়া অথবা না-পাওয়ার দুঃখ, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থানগত ত্রুটি, আত্ম-বিদ্রূপ এবং মুক্তিবাসনা এগুলোও কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য তিনি প্রেমের কোন নান্দনিক সৌন্দর্য বা অতীন্দ্র অনুভবকে রূপ দেন নি বরং ছলনা কামুকতা ইত্যাদির কথাই লিখেছেন।

তাঁর চারের দশকের কবিতাগুলিতে এই ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতা সরে গিয়ে মধ্যবিত্ত সমাজজীবন প্রাধান্য বিস্তার করল। এই জীবনের নানা কদর্যতার রূপ তিনি কবিতায় ফোটালেন। সেই সঙ্গে রাজনীতি সচেতনতাও দেখা গেল। তিনি সম্মিলিত শক্তির প্রতি আস্থা পোষণ করলেন।

'নানাকথা'র আলোচনা প্রসঙ্গে মনীন্দ্র রায় কবিতা পত্রিকার আশ্বিন ১৩৪১ সংখ্যায় লিখেছিলেন —

> এতদিন সমর সেনের কবিতার নায়কগুলিও ছিল প্রায়শ এই শ্রেণীরই প্রতিনিধি। 'কয়েকটি কবিতা' ও 'গ্রহণ' তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অন্যান্য মধ্যবিত্ত পুরুষের মত তারাও দেখি সেখানে হা-হুতাশ করে, মাঝে মাঝে অসহ্য আক্রোশে নিজের গায়েই নিজে দাঁত বিঁধিয়ে দেয়, কিন্তু জানা চাতে কমে না, পথের রেখাও চোখে পড়ে না, কেবল অন্তরে বাইরে বেদনার অন্ধকারই পাথর কঠিন হয়।

তবু আশা যায় না। মনে হয় যেন কোথায় পথ আছে, অলক্ষ্যে কোথায় যেন মন্দ্রধ্বনি মেঘের গুরুগুরু ধ্বনিতে ভাষা খোঁজে, দূর থেকে যেন অগাধ বিস্তারের সমুদ্র গর্জন কানে আসে।

কিন্তু বর্তমান কবিতা পুস্তকে দেখি দৃষ্টিভঙ্গি রীতিমত পৃথক কবির কাব্যাদর্শ এখানে আগেকার বইদুখানির মতো কেবলমাত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবক্ষয় নক্সা চিত্রণেই সীমিত নয়। এখানে কবি চোখ ফিরিয়েছেন প্রথমত: নিজের দিকে, তারপর সমাজের দিকে সাধনা চলছে ব্যষ্টিকে কী করে সমষ্টির মধ্যে বিলীন করা যায়। [১৮]

অর্থাৎ সমর সেনের কবিতায় সামাজিক প্রভাব বেড়ে যাচ্ছে। আর এই সমাজ কেবলমাত্র মধ্যবিত্ত সমাজ নয়। নানা শ্রেণীর মানুষ এখানেও ভীড় করেছে।

'নানাকথা'র কবিতাগুলি আকারে দীর্ঘ। এতদিন পর্যন্ত অধিকাংশ ছোট কবিতা তিনি লিখে এসেছেন। নানা কথা থেকে সেই ভঙ্গীতে পরিবর্তন এসেছে–দীর্ঘ ও স্তবকে বিভক্ত কবিতা এখান থেকে লিখেছেন।

'নানাকথা'র প্রথম কবিতা 'রোমন্থন' কবিতাটি দুটি অংশে ভাগ করেছেন। অতীত দিনের স্মৃতি ও ভাবনার ছাপ তিনি কবিতাটিতে ফেলেছেন। নগরবাসী কবির স্মৃতিচারণায় স্বাভাবিক ভাবেই চেনা শহরের ছাপ রয়েছে —

লাল পাগড়ির লাঠির সামনে
(বঙ্কিমী সে লাঠি)
দেশবন্ধু পার্কে এলোমেলো পলায়ন —

'দেশবন্ধুপার্ক' কোলকাতার পরিচিত বিন্দু।

এই কবিতায় স্মৃতিরোমন্থনে তাঁর হাল্কা ব্যঙ্গের ছলে গভীর কথা বলার ভঙ্গীটি লক্ষণীয় —

অনেকের সামনে অনেক বক্তৃতা,
শেষ কি আমাদের দিন,
কেন কানাগলি, ঘরামাঠ, শূন্য গোলাঘর
কেন শেষ আমাদের দিন ?

অনেক অনেক আজগুবি কথা কৈশোরে শুনেছি,
নিরালা কোন কেন্দ্রে
স্বচ্ছন্দ যুগল জীবন যাত্রা,
আদর্শ বলে মেনেছি,
জেনেছি জনগণ বর্বর,
আত্ম-চিন্তাই পরম চর্চা।

দিনশেষের সাথে কানাগলি, ঘরামাঠ বা শূন্য গোলার তুলনায়, জীবনের আদর্শ — স্বচ্ছন্দ যুগল জীবনযাত্রা বলায় আধুনিক মৃত সর্বস্ব আত্মকেন্দ্রিক মানুষের ছবি পাওয়া যায়। কৈশোরের অহিংস আন্দোলনকে বিদ্রূপ করা বা সশস্ত্র আন্দোলনকে 'তত্ত্বকথা' বলাতেও কবির শহুরে সংস্কারের ছাপ চোখে পড়ে।

প্রথম যৌবনে যখন প্রেমের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে পরাজয় আসছে সেকথাও জানান ভাবালুতা-শূন্য নির্বিকার চিত্তে —

ইতিমধ্যে ইতস্তত অনেকের মতো
মদন রাজত্বে থেকে বার কয়েক বিতাড়িত।

সেই অবস্থাতেই শুনতে পাচ্ছেন হাওয়ায় উঠছে দুর্দিনের শব্দ, শোনা যাচ্ছে বিপ্লবের ধ্বনি। কিন্তু কবিতার নিস্পৃহতা বজায় রেখেছেন এখানেও

কলরোল
সামনে বরাবর কালের জোয়ার,
সাঁতারের শক্তি কি সাহস কিন্তু কখনো ধরি নি।
অবশেষে আজ

অসংখ্য নিরক্ষর দুঃখের দেশে
নিঃসম্বল পর্যটক যাত্র —

কবিতার দ্বিতীয় অংশে রয়েছে তাঁর অকাল বার্ধক্যের কথা। ভবিষ্যতের দুঃস্বপ্নময় অবস্থা আর বর্তমানের দুঃসময় এই দুয়ে মিলে কবির এই বার্ধক্যকে ত্বরান্বিত করে।

পুত্রকন্যা এখনো আঙুলে গোনা যায়,
বয়স মাত্র পঁয়ত্রিশ,
তবু নিজেকে কতদিনের জীর্ণ বৃদ্ধ লাগে,
জিভে স্বাদ নেই, জানি না
কি পাপে সুস্থ শরীর ঘুণের আশ্রয়।

এখানে তিনি যেন জরাগ্রস্থ। অথচ একসময় বুদ্ধদেব বসু তাঁর কবিতাকে 'নবযৌবনের কাব্য' বলে উল্লেখ করেছিলেন। পৃথিবীরূপ থেকে যত তিনি স্বরূপে অগ্রসর হয়েছেন ততই তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন, ঘুণ ধরেছে তাঁর দেহ-মনে। সেই বোধ থেকেই তাঁর মনে হয়েছে

নুড় পাহাড়, নুড় বোধ,
শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ।

এই রোমন্থন কবিতায় তিনি নিজের অতীত এবং বর্তমানের যে বিশ্লেষণ করেছেন তা সুস্থ সক্ষম আত্মসমালোচকের পক্ষেই করা সম্ভব।

দ্বিতীয় কবিতা 'হসন্তিক' — কবিতাটি চারটি অংশে বিভক্ত। এই কবিতায় ব্যবহৃত শব্দাবলী ট্রাম, ইয়ার, পলিটিক্স, নৈরাজ্য, লালধ্বংস ইত্যাদিতে নগরের গন্ধ রয়েছে। পঙক্তি ব্যবহারেও বিশিষ্ট তীর্যকতা রয়েছে —

প্রেম আমার পরিখা, দম্ভ প্রাকার,

অথবা,

প্রেম ও পলিটিক্সের বিচিত্র গতি
হৃদয় বিষাদে ভরায়।

রাজনৈতিক অবস্থাকে ব্যঙ্গ করতে তিনি ছাড়েন নি —

নৈরাজ্য আর লাল ধ্বংস শুধু।
ভোঁতা বর্শায় কাজ নেই আর,
সম্বল মৌনব্রত, ঈশ্বর, বেনের আশ্রয়।
নেপথ্যে অহরহ আশ্বাসবাণী :
গণতন্ত্র আসন্ন,
সামনে দন্ড হাতে, তারি শিষ্ট দূত,
কয়েকদিনের শান্ত তদারক পরাদের আড়ালে।

গান্ধীজির মৌনব্রত তার প্রবর্তিত পন্থা, কংগ্রেসের গৃহীত নীতি ইত্যাদির প্রসঙ্গে লিখেছেন।

নগরের আগ্রাসী মনোভাবকে প্রকাশ করেছেন —

ধানক্ষেত জীর্ণ প্রায়
অগণন ধোঁয়ার কণা, চিমনিতে চিরছে আকাশ।

ধানক্ষেতের জীর্ণত্ব প্রাপ্তি, কলের ধোঁয়া বা উঁচিয়ে থাকা চিমনি নগরজীবনের ইঙ্গিত দেয়।

'ব্রতচারী' নামের ছোট কবিতাটিতে কলকাতা যেন তার গন্ধবর্ণ সহ উপস্থিত —

পথেঘাটে রোদ্রের করাল উত্তাপ
নাসারন্ধ্রে দুর্গন্ধ, স্তূপীকৃত জঞ্জাল,
শুনছি ধর্মঘটে করপোরেশন বেহাল,
কলেরা বসন্ত প্লেগের আসন্ন উৎসব।

করপোরেশনের ধর্মঘট রাস্তার জমে ওঠা জঞ্জাল আর তার দুর্গন্ধ আমাদের এই চেনা শহরের অঙ্গ। সমর সেন তাঁর ১৯৪০-এর লেখা কবিতায় যেন আজকের শহরকেই তুলে ধরেছেন।

'সাফাই' কবিতায় সমরবাবু সাঁওতাল পরগণার কথা আবার মনে আনছেন।

সাঁওতাল পাহাড়ে সূর্য ফেলেছে লাল রং,
একদা শালবনে কেটেছে রোমান্টিক দিন,
সাপের ভয় সুন্দর ছিল।

সাঁওতাল পরগণা তাঁর কাছে নাগরিক বশ্যতার হাত থেকে মুক্তির স্থান— তাই নানা কবিতায় ঘুরে ফিরে তিনি সেই স্বপ্নময় দেশের ছবি তুলে ধরেন।

'সারণের গান' কবিতায় দুর্ভিক্ষ আর দুঃস্বপ্ন ভরা সময়ে অসুস্থ মানুষদের কথা বলেছেন। এই মানুষেরা দুর্ভিক্ষের শিকার, তবু এদের দুর্ভিক্ষ অন্নের নয়— মননের, সহজ স্বাভাবিক জীবনের।

দুর্ভিক্ষ লেগেছে দেশে, তাই বর্গিরা বাড়ে,
দুঃস্বপ্নের ষড়যন্ত্র ছিন্ন করে
শৌখিন সৌন্দর্য দেখি বারে বারে আসে
ধানখেতে, অমসৃণ বিস্তীর্ণ বালির স্তূপে,

কখনো বা আদিগন্ত বৃষ্টির, বন্যার জলে।

* * * * * *

* * * * শুধু দেখি

কুৎসিত মানুষ আর রোগাক্রান্তা নারী,

বক্র, গলিত নাসা,

উৎসবের উচ্ছিষ্ট তন্ন তন্ন খুঁজে

জন্তুজীবী শঙ্কিত কুকুর দিনরাত্রি ঘোরে,

* * * * *

* * * * *

দলে দলে

ঘর ছাড়া নাগরিক যত যাত্রী সমুদ্রতীরে

পরিহাসে, কলরবে বিলোল নরনারীর

সুরায় সংগীতে ব্যভিচারে কাটে অন্তিম সময়,

ক্লীবের সংখ্যা বাড়ে —

দুর্ভিক্ষ তার মধ্যে নিরন্ন মানুষ উচ্ছিষ্ট খুঁজে খাবার খাচ্ছে এই ছবির পাশে আছে সেই সব মানুষের কথা যারা তাদের সময় কাটায় 'সুরায় সংগীতে ব্যভিচারে'। কবি বলেছেন এই সব মানুষেরা নাগরিক। এদের অন্তর মনুষ্যত্বহীন ক্লীবের মতো।

'খোঁয়াবী' কবিতায় সমর সেন দিল্লীর উল্লেখ করেছেন। এতদিন পর্যন্ত তাঁর কবিতায় কোলকাতা শহরের কথাই বেশী দেখতে পাওয়া গেছে; চাকরীসূত্রে যখন তিনি দিল্লীর বাসিন্দা হলেন তখন সেই শহরের কথাও কবিতায় আনলেন।

সূর্য ওঠে কুয়াশা ছিঁড়ে, মিনার জ্বলে,
আবার শুরু হয় নগরের প্রাণ।

অথবা,

শ্বেতপাথরে সূর্যের আলো লাগে,
নবাবী আমল, শৌখিন প্রাণ,
সন্ধ্যায় নামে মসজিদে আজানে
কানে বাজে কান রাতের গান

এইসব পঙক্তি প্রাচীন শহরটির রূপ ফুটিয়ে তোলে। কুয়াশা ভেদ করে মিনারের চূড়ায় সূর্যের আলো পড়া বা শ্বেতপাথরের প্রাসাদের গায়ে সূর্যের আলো লাগা, সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে মসজিদের আজানের শব্দ ভেসে আসার মধ্য দিয়ে প্রাচীন দিনের নগরের এক ছবি যেন জেগে ওঠে। এই প্রাচীন শহরটির রূপ তিনি আরো বর্ণনা করছেন —

ভাঙা পাথর মাইলের পর মাইল
জরাগ্রস্ত মসজিদ, মন্দির, মোগলাই দুর্গ,
দিনে প্রাচীন বিষণ্ণ গর্বে কঠিন,
অন্ধকারে অবাস্তব,

দিনের বেলায় এই শহরটি প্রাচীন আর বিষন্ন হয়ে থাকে তার ভাঙা চোরা মন্দির - মসজিদ দুর্গ নিয়ে রাতে অন্ধকারে একে অবাস্তব বলে মনে হয়। মনে হয় যেন একটি প্রাচীন পশু শীতে স্তব্ধ হয়ে আছে আর তার পাশে নতুন কাল শেয়ালের মত ডাকাডাকি করছে। তাই শহরের এই প্রাচীন রূপে

উজ্জীবনের উৎস নেই
এ গাম্ভীর্য সমাহিত শান্তির নয়,
অবক্ষয়ের উচ্ছিষ্ট মাত্র।

একদিন এর ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। মরুভূমির ভয়াল ঝড়ের সন্তর্পণে চলা উটের মত এই প্রাচীন নগর চলছে।

মরুভূমির আলোড়িত ভয়াল ঝড়ে,
এ প্রাচীন নগরে
ঊর্ধ্বগ্রীব উট সন্তর্পণে চলে,
দিগ্বিজয়ী মদন শহরে নরক জ্বালে।

'শবযাত্রা' দীর্ঘ কবিতা নয়টি অংশে বিভক্ত। দিনের পর রাতে যতই অবশ্যম্ভাবী জন্ম ও মৃত্যু। মৃত্যুর কথা কবিতাটিতে বার বার এসেছে। তেমনি শহর, শহরের রূপও কবিতাটিতে ফিরে ফিরে এসেছে।

কবিতার প্রথম অংশে বলেছেন —

কঙ্কাল গাছ হাতছানি দেয়,
প্রখর রৌদ্রে
মরুভূমি আমাদের ঘেরে;
রাত্রি স্বস্তি আনে না,
গুমোট শহর অতীত পাপের পুনরাবৃত্তি রচে।

কঙ্কাল গাছ, প্রখর রৌদ্র, মরুভূমির সঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছে অতীত শহরের কথা। শহরের প্রাচীনতা, শুষ্কতা বোঝানোর জন্যই যেন তুলনাগুলি এনেছেন। এই শহর সম্ভবতঃ দিল্লী কারণ 'অতীত পাপ' বা পরের অংশে 'দিনশেষের আজান' থেকে সেই কথাই মনে হয়।

চতুর্থ অংশে আবার বলছেন 'প্রাণহীন নগরের ধারে' ফসল ঝরানো মাঠ ধূ ধূ করে, তাই রাতই ভাল এই নগরের। তখন নবাবী আমল যেন ভেসে ওঠে। পেয়ালার শব্দ, পাখোয়াজের বোল, সুরার মত মাদকতা ভরা গানও

যেন ভেসে আসে।

ষষ্ঠ অংশে গ্রামের কথা জানাচ্ছেন। সেখানেও অবস্থা ভাল নয় কিন্তু নতুন কালের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

শহর ছেড়ে চলি অনেক দূরের গ্রামে।
সেখানে দেখি, তুখোড় মহাজন,
তার তৃতীয় নয়নের সামনে
জীর্ণ বলদে চষা মাঠে সোনালি ফসল ফলে না,
দিনে দিনে পশ্চিমের যুথ পতিত হানে।
তাই অনেক কিষাণ আজ জমায়েত, সরবে হাঁকে —
'লাঙল যার জমি তার।'

কেবলমাত্র নগরের প্রান্তেই ফসল ঝরানো মাঠ নয়, গ্রামেও ফসল নেই। যুথ, মহাজনের অত্যাচার সব মিলিয়ে মানুষ নতুন দাবী তুলেছে 'লাঙল যার জমি তার'— বৃথ চাষীরা এইসব ব্যাপারে উদ্ভ্রান্ত। বিপ্লবের এই চেষ্টায় কবি যেন আশান্বিত। কিন্তু পরের অংশেই তাঁর সেই আশা আকাশ-কুসুমে পর্যবসিত হয়েছে। বিরোধী স্বার্থের হীন সন্ধিতে চক্রান্ত ঘনিয়ে আসে। বিপ্লব-স্লোগান- স্বদেশী গান সবই ব্যর্থ হবে। কিছু মানুষ মরবে, কিছু পঙ্গু হবে— বিপ্লবের চেষ্টা ব্যর্থ হবে।

অষ্টম ও নবম অংশে এই হতাশাকেই ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মনে হচ্ছে মানুষের হৃদয় যেন সংকীর্ণ গলি। এই ধোঁয়াটে শহরকে চকিত বসন্তের বাতাস আর আলোড়িত করবে না। দিনরাত্রি আকাশের মুখ বন্ধ করে রাখবে ধুলা।

'নগরের কোলাহল ক্রমশ কমে গেল' — সেই স্তব্ধতায় মাঝে শোনা যায় মুমূর্ষু মানুষের শব্দ। অন্ধকারে অন্ধকার জীবীরা কালো টাকা গোনে আর শবযাত্রাধ্বনি শোনা যায়।

কবিতাটি নগরের প্রেক্ষাপটে রেখে লিখেছেন। যুদ্ধ এবং চক্রান্ত মানুষকে অন্ধকারের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে এই অবস্থায় মৃত্যু অথবা মুমূর্ষুর মত বাঁচাই মানুষের নিয়তি। গ্রামের প্রসঙ্গ তিনি একবার এনেছেন কিন্তু এই গ্রামও শোষণে অত্যাচারে শহরের মতই অগ্নিগর্ভ।

'নানাকথা'র অন্যান্য কবিতাগুলিতে (পরিস্থিতি, কয়েকটি মৃত্যু, ঘরে বাইরে, নানাকথা, পঞ্চ প্রবাহিনী, বসন্ত, নববর্ষের প্রস্তাব) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে আমাদের দেশ ও বহির্বিশ্বের রাজনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ করেছেন। কংগ্রেস এবং কম্যুনিস্ট পার্টির নানা সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন সুভাবসিদ্ধ ব্যঙ্গশ্রবণ মন্তব্য। দেশের সাধারণ মানুষ এবং মধ্যবিত্ত সমাজের ভাবনাচিন্তাকেও তিনি কবিতায় তুলে ধরেছেন।

'পরিস্থিতি' কবিতায় পশ্চিমের যুদ্ধে আমাদের দেশের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন,

মন্দির মসজিদ গির্জায় শোনা যায় উচ্চকিত আর্তস্বর
ঐক্যতান, কুরুক্ষেত্রে পুরুষবিলাপ।
এদিকে তাই দেশ রক্ষায় বিপ্লবী নেতা হঠাৎ তৎপর,
ফলে উচ্ছ্বসিত ভারতবন্ধু,
ধামাধরায় অক্লান্ত নব্য 'বলশেভিক' সাঙ্গপাঙ্গ
পার্শ্বচর আস্ফালনে মুখর,

এপ্রিলে যে সংগ্রাম শুরু, এ্যাসেমব্লি হলে হবে শেষ
এ হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে
ঝলমল করে অনেক পার্টির চিত্ত।

যুদ্ধকে দোরগোড়ায় নিয়ে প্রার্থনা করার মত কাজকে যেমন তাঁর ভন্ডামী বলে মনে হয়েছে তেমনি দেশের শত্রু ইংরেজ হঠাৎ বন্ধু হয়ে ওঠাটাও তিনি বরদাস্ত করতে পারছিলেন না। সমর সেন যেন অনুভব করছিলেন বর্ণহীন শহরে রক্তবর্ণ কৃষ্ণচূড়া ফোটার মতই ভারতের ভাগ্যাকাশে কোন এক ঝড় ঘনিয়ে উঠেছে। এই অবস্থায় রোমান্টিক গান গাওয়া উচিত নয় —

যদিচ বেকার, নিঃসঙ্গ, মনে মনে প্রেমিক,
তথাপি বামপন্থী পত্রিকায়
আসন্ন বিপ্লবের গান অবশ্য উচিত।

দিনে দিনে প্রতিপন্ন হয় আমাদের প্রয়োজন নেই
স্বাধীনতায়। কারণ, জর্মান আমলে সকলি মায়া।
সংসারকে তুড়ি মারি, একমাত্র ভয় —
মেঘদূতী বিমান যদি বজ্রহানে ?

বামপন্থী কবি সমর সেন এখানে আত্ম সমালোচনা করতে ভয় পাচ্ছেন না। জার্মান আমলে স্বাধীনতা নিষ্প্রয়োজন অথবা বামপন্থী পত্রিকায় বিপ্লবের গান গাওয়া উচিত ইত্যাদি কৌতকপ্রবণ উক্তির মধ্য দিয়ে তিনি তা করছেন। এই সমালোচনা করার মানসিকতা নিঃসন্দেহে একজন যথার্থ বামপন্থীর মতো কাজ।

কয়েকটি মৃত্যু' কবিতায় মানুষের মনের যান্ত্রিক দিকটি তুলে ধরেছেন। আত্মসুখ পরায়ণ মানুষ নিজের জন্যই দুঃখবোধ করে, নিজের

অবস্থানগত অসুবিধাটিই তার কাছে হয়ে দাঁড়ায় একমাত্র চিন্তার বিষয়।

কবিতার প্রথম অংশের বৃদ্ধটির দাম্পত্য জীবনের ছবিতে নগ্ন স্বার্থপরতা আছে —

প্রেমের ব্যাপারে দিব্যি বেপরোয়া,
সরম নেই।
আর একটি গুণ
ছেনে পিনে চায় না মোটেই।
পুন্নামের মুখে যন্ত্র তুড়ি মেরে
স্বচ্ছন্দে চলে যায় দাম্পত্য জীবন।

অবশেষে বুড়ি হয়ে এই দাম্পত্য জীবনে ছেদ পড়ল। এখনো সঙ্গীহীন বৃদ্ধটি তার এতদিনের সঙ্গীর কথা ভাবছে না – ভাবছে নিজের একাকীত্বের কথা। আপশোষ করছে সমাজ বদলেছে, দ্বিতীয়বার বিয়ে করার সুযোগ নেই বলে। যে এতদিন পুন্নামের মুখে তুড়ি মেরে দাম্পত্য জীবন কাটিয়েছে সেই এখন সমাজ বদলানোতে দুঃখ পাচ্ছে। এই স্বার্থপর সুবিধাবাদী ভাবনা চরিত্রটির স্বরূপ বোঝায়।

দ্বিতীয় মৃত্যুটি কবির বন্ধুর। স্মৃতিতে ভেসে আসছে চায়ের দোকানের আড্ডা, ধার নেওয়া, বই চুরি করা ইত্যাদির কথা। মড়া পোড়ানোর ধোঁয়ায় মনে পড়ছে ভবিষ্যতের ছবি-বন্ধুটি কিভাবে বলেছিল। তারপর চায়ের দোকানে বসে কবির বোধদয় হল —

আজকাল ঘরে ঘরে সমাজধার্মিক অনেক,
মুখে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বুলি,
মনে রোমান্টিক বুলবুলের অবিরত গান,

তুমি ছিলে তারি একজন,
এ অধমও তারি একজন।

সুতরাং শোক বৃথা; ঘরে তুমি হয়ত বেঁচেছ
আমরা বাঁচি নি —

বন্ধুর এবং নিজের চরিত্রের বিশ্লেষণে যেমন সহজ বুদ্ধির ছাপ মেলে তেমনি 'ঘরে বাঁচার' ভাবনাতেও কবির আধুনিক মনের পরিচয় স্পষ্ট হয়। বিসদৃশ জীবন ভাবনা নিয়ে দিন কাটানোর চাইতে, এ-যশ এগিয়ে আসা দুর্দিনের হাত এড়ানোর জন্য মৃত্যুই শ্রেয়।

'ঘরে বাইরে' কবিতাটি চারটি অংশ—'প্রেম ও পলিটিক্স' 'স্থানীয় ফ্লাড রিলিফ' 'আন্তর্জাতিক : ধর্মের গ্লানি' 'প্রাকৃতিক: একটি রাত্রি'— এই চারটি অংশে বিভক্ত। নামের মতই বিষয়ের ক্ষেত্রেও একটা ঋজু ভাবনা রয়েছে।

প্রেম ও পলিটিকস অনেকটা সমার্থক করে কবি দেখেছেন। প্রেম অথবা পলিটিকস সারল্যের আড়ালে ধূর্ততা, তাই তিনি চান 'পৃথিবীর বদরক্ত বের হোক / অস্ত্রোপচার নিতান্ত প্রয়োজন।'

দ্বিতীয় অংশে পা-ডব বর্জিত দেশে মন্ত্রীর আগমনে —

সকালে বৃষ্টি বিকেলে মন্ত্রী
হাট রুট।

অল্প কথা কিন্তু এই সব হৃদ্রুগ মানুষ কিভাবে নেয় তা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন —

দলে দলে তাই চলেছি সভায়
দেখি আগন্তুক মন্ত্রী কি করেন।
কী যেন খেয়ে তাঁর ঘোরতর অম্বল, রক্তবর্ণ মুখ,
তাই মুলভাষী, বিজয়ী প্রসাদে গেলেন ফিরে;
যাতায়াতী খরচ যত
পৈত্রিক রসদ তত কঠিন তরল,
শত্রুপক্ষ নানা কথা বলে।

এই মন্ত্রীর আগমন, তা নিয়ে মানুষের কৌতূহল অথবা [illegible]রচনা সবই যেন বর্তমান সমাজের ছায়াছবি।

তৃতীয় অঙ্কে যুদ্ধে আক্রান্ত পৃথিবীর কথা বলেছেন, কত মানুষের মৃত্যু হয়েছে, কত মানুষ বন্দী হয়েছে তাদের জন্য কবি দুঃখবোধ করেছেন। ব্যঞ্জোক্তি করেছেন রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরচেতনা, ধর্মচেতনাকে —

পরম মানুষ সে যে, থাকে নিশ্চিন্ত দূরে,
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে চলে তাঁরি ধর্ম সংগ্রাম
সত্য নিহত প্রথম আক্রমণে।

রবীন্দ্রদর্শনের প্রতি, ধর্মের প্রতি বা বিশ্বাসের প্রতি সমর সেন বা তখনকার অন্যান্য কবিদের বিরূপতা ছিল লক্ষণীয়। এই বিষয়ে তাঁরা নিঃসন্দেহে আধুনিক। ধূর্জটি প্রসাদ লিখেছিলেন —

'বিষ্ণু দে, সমর সেন ও চঞ্চল কুমারের অধিকাংশ কবিতাতে অন্যান্য কবিদের, বিশেষত রবীন্দ্রনাথের পদের উদ্ধৃতি আছে, এবং সেগুলো সম্পূর্ণ নতুন ধরণের পদের সঙ্গে গলাগলি করে দাঁড়িয়ে থাকে। উদ্দেশ্য অবশ্য নতুন পুরাতনের বৈপরীত্য বোধ জাগান। উদ্ধারটা স্মৃতির এবং বোধ জাগান

চেতনার কাজ। দুটি কাজের সমন্বয়সাধন, দুই রাজ্যের অবাধ বিচরণ আজকালকার স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তি অতএব কাব্য প্রয়াসের অধীন। আধুনিক কবিতাতে সমসাময়িক হতেই হবে। কিন্তু সমন্বয়ে এমন একটা কিছু থাকে যেটা নিছক দ্বন্দ্বের (Contrariety) অতিরিক্ত। [১১]

সমর সেনের ক্ষেত্রে দেখা যায়-কবিতার নামে, কখনো পঙক্তি উদ্ধারে, কখনো ভাবের বৈপরীত্য বোঝাতে তিনি রবীন্দ্রনাথের ব্যাপক উদ্ধার করেছেন। এখানেও কবিতার নাম, আন্তর্জাতিক ধর্মের গ্লানি বলে শীর্ষনাম, পরম মানুষ, ধর্ম-সংগ্রাম, সত্য-মিথ্যে ইত্যাদির ব্যবহার একান্তই রবীন্দ্রনাথের চেয়ে তিনি আধুনিক তা বোঝানোর চেষ্টা।

'নানা কথা'ও একটি দীর্ঘ কবিতা। এখানেও যুদ্ধ তাতে রাশিয়া জার্মান ও অন্যান্য দেশের ভূমিকা এবং ভারতবর্ষের অবস্থার বর্ণনা করেছেন। তারই মাঝে কখনো এসেছে কবির একান্ত অনুভূতির খবর।

কবিতার প্রথম অংশে জার্মানের রাশিয়া আক্রমণ এবং এতদিন পর্যন্ত সেই কাজে ইউরোপের অন্যান্য দেশের মদত জোগানো নিয়েই তিনি প্রায় গালাগাল করছেন —

দুযুগ পর,
রক্ত আগুনে রুশ বিপ্লবের পর
মধ্য ইউরোপে
জারজ সন্তানকে সঙ্গোপনে রসদ জোগায়
মাতা তার, দাঁত চাপা বৃদ্ধা গণিকা,
পশ্চিমী গণতন্ত্র নাম॥

জার্মান শক্তিকে জারজ সন্তান বা মার্কিনকে দাঁত চাপা বৃথা গণিকা বলার মধ্য দিয়ে কবির ক্রোধের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এই যুদ্ধ শুধু ইউরোপের দেশগুলিতেই সীমাবদ্ধ নয় তা সমগ্র বিশ্বকে ধ্বংস করছে। আমাদের দেশেও গ্রাম-শহর নির্বিশেষে ক্ষতি করে চলেছে। গ্রামের 'শস্যহীন মাঠে পোড়া বারুদের' গন্ধ যেমন জাগছে তেমনি শহরেও

তিনে তিনে গড়া কারখানার ভগ্নাংশ মাত্র
শহরে জাগে
বিগত দিনের কঙ্কাল।

অসৎ সময় আর অত্যাচারে অনাচারে সমুদ্রা মেঘলা পৃথিবী ছিন্নভিন্ন। বিদেশীরা আজ দেশের 'উপপতি' সাজে। আকাশ চিমনির ধোঁয়ায় কালো হয়। মানুষের মৃত্যুতে পৃথিবী শ্মশান যেন মরুভূমি হয়ে ওঠে। কবিতার শেষ অংশে তিনি আশা করছেন অত্যাচার শেষ হবে, পৃথিবীতে নূতন দিন আসবে।

....সক্রিয় আশা মৃত্যুহীন জাগে অনেকের মনে,
অপরের শস্যলোভী, পরজীবী পরপান
পিষ্ট হবে হাতুড়িতে, ছিন্ন হবে কাস্তেতে।

কবিতার গভীর ভাবনার সাথে হাল্কা চালে তিনি মধ্যবিত্ত জীবনের স্বপ্ন সাধের কথাও বলেছেন। বলেছেন-আশা করেছিলেন মনের মত সঙ্গিনী, কিছু টাকা আর দুচারটে ছেলেপুলে নিয়ে সুখে দিন কাটাবেন। কিন্তু সেখানেও বয়স হলে বাতে ধরে, শেষমায় ঘুম ভাঙে, এক সময়ে আসে নিশ্চিত মৃত্যু। অথবা বলছেন, —

এ নশ্বর ছাড়া দেশ ছাড়ুন মশাই
ব্যক্তিত্বের মৃত্যু এখানে।

কখনোবা মহুয়া বনের কথা মনে পড়ছে, মনে হচ্ছে তিনি যেন কলে পড়া ইঁদুর আবার বলেছেন,

শ্রাবণের কলকাতায়
অনেক মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ায়,
আজ ২২শে শ্রাবণ।

শ্রাবণের কলকাতায় শুধু বাইশে শ্রাবণের কথাই বলছেন না — বলছেন 'মহৎ লোকসান লোকে সুচ্ছন্দে ভোলে।' কাংস্য ভাষী কেরানিরা ছাত্ররা ভুলনেও সমর সেন এই লোকসান ভুলতে পারছেন না। —এগুলি কবির ব্যক্তি-গত অনুভব।

পঞ্চম বাহিনী কবিতাটিতে অতি সাধারণ মানুষের মুখের কথা, তাদের স্বদেশ ভাবনা তিনি ঠিক তাদের মত করেই তাদের ভাষায় তুলে ধরেছেন আর তা কবিতাও হয়ে উঠেছে। কবিতাটি যে স্থান বিশেষের তা দিল্লীর কারণ বলছেন —

শহরে ফিরে এল আদিম অন্ধকার
চাঁদনিচকে শিস দেয় এ. আর. পি সর্দার।

অন্ধকারের মধ্যে তিনি শোনেন বুড়ো মজুর তার সঙ্গীকে বলছে —

..... হামারা হিন্দুস্থান নেহি দেসে।
হিম্মৎ হ্যায়, জানোয়ার মারনেকো লিয়ে, মরনেকো লিয়ে তৈয়ার,
ভাই আনোয়ার, হাতিয়ার চাহিয়ে, তেজ হাতিয়ার।
হিন্দুস্থানকী ইজ্জৎ বাঁচ্ নেহি সেকতি ইয়ে কালা বুরখায়
ব্ল্যাকআউট তো বিলকুল মজবুরীকা বাত হ্যায় —

তারপরেই আনোয়ারের ভাবনাও কবি বন্ধুর আপন ভাষাতেই তুলে ধরেছেন —সে বলছে – ইংরেজ চলে যাবে হিম্মৎ-এর প্রয়োজন নেই —

..... হাজারো সিপাই সাথ্
বংলার শের আনেওয়ালে হিন্দুস্থানমে,
উনকে সাথ আজাদী আনেওয়ালী হিন্দুস্থানমে

বুড়ো মজুর বা আনোয়ার দুজনেই স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে দুভাবে। এই অংশে পুরো হিন্দী সংলাপ তুলে দিয়েছেন। এতে মজুরের মুখের কথা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় অংশে বলছেন মাংসলোভী শকুনেরা ছায়া ফেলেছে আমাদের দেশে। শত্রুকে চিনে ওঠাই শক্ত। এখানে সুভাষচন্দ্রের প্রতি একটু বিদ্রূপ প্রকাশ করেছেন —

এঘোর রজনীমেঘের ঘটা,
কী করে আসবে বাটে
দূর বার্লিনে বঁধুয়া তিতিছে,
বেতারে শুনে পরাণ ফাটে।

সাধারণ মানুষের কাছে নেতাজী বীর হিসাবে পূজা পেয়েছেন। কিন্তু ইংরেজ শক্তি, কম্যুনিস্ট দল এবং কংগ্রেসও তাঁকে দেশের শত্রু বলেই মনে করত। তাই আনোয়ারের 'বংলার শের'কে নাগরিক কবি সমর সেন বিদ্রূপ করছেন।

তৃতীয় অংশে তিনি বাঙালী হিসাবে আত্মসমালোচনা করছেন।

আমরা বাঙালি, মীরজাফরী অতীত, মেকলের শিক্ষাপ্রাপ্ত
বিষবৃক্ষের ফল।

আমাদের রক্তে বিশ্বাসঘাতকতা আর আত্মম্ভরিতার বিষ মেশানো বলে কবির বিশ্বাস। অতীত এবং বর্তমানের শিক্ষায় আমরা স্বার্থপর, সুবিধাবাদী। তাই কখনো 'বিনিদ্র রাতে নগরের স্তব্ধতায়' তিনি ভেবেছেন এই বিষবৃক্ষের শেষ হোক এখানেই — আগামী দিন হোক কলঙ্কশূন্য —

আগামীকাল আসুক ঘর-ফিরতি মজুরের গানে
কুমারীর আত্মদানের প্রথম বেদনায়
নবজাত শিশুর সহজ কান্নায়;
শতাব্দীর যন্ত্রণার পর
নতুন দিন আসুক সভ্যতার চরম চিতশুদ্ধিতে।

কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। পাতি কেরানির ঘরে মীরজাফরী বদরক্তের ধারা বয়ে চলে।

এই আত্মসমালোচনা আধুনিক মানুষের পক্ষেই করা সম্ভব।

'বসন্ত' এবং 'নববর্ষের প্রস্তাব' কবিতায় দু'একটি পঙক্তি নাগরিক ব্যঙ্গপ্রিয়তা ও শহরের উল্লেখ পাওয়া যায়। বসন্ত কবিতায় মহাত্মা গান্ধী প্রসঙ্গে বলেছেন —

মহাত্মা স্তব্ধপ্রায়, ওয়ার্ধায় উর্ধ্ববাহু,
এদিকে আসর জমায় অন্যান্য বেনিয়ার দল।

'নববর্ষের প্রস্তাবে তিনি 'ঘুমাট কুয়াশা শহরে'— এই বলে শহরের উল্লেখ করেছেন।

নানা কথার কবিতাগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যুগ বিশ্বরাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন, এইসবের ফলে মানুষের জীবনে ঘনিয়ে আসা দুঃখ দুর্দশা ইত্যাদি। এই বিষয়গুলি সার্বজনীন হলেও এগুলি নিয়ে কবিতা লেখা নাগরিক মানুষের পক্ষেই সম্ভব। কারণ চোখের সামনে ঘটা ঘটনার বিশ্লেষণ, দূরের সংঘটিত ঘটনার বিবরণ তৎক্ষণাৎ জানা তাদের পক্ষেই সম্ভব। এই ঘটনার বিচারেও নাগরিক বুদ্ধি বিচারের প্রশ্ন আসে। তাছাড়া গ্রামগুলিতে যোগাযোগ ব্যবস্থা তত ভাল নয়-ফলে তাদের বিচ্ছিন্নতার সুযোগে অনেক ঘটনা ঘটে যায়। তাই এই ধরণের রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে লেখা কবিতা নাগরিক সুলভ॥

।। পাঁচ ।।

'খোলা চিঠি' সমর সেনের চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ। মাত্র সাতটি কবিতা নিয়ে ১৯৪৩ সালে এটি প্রকাশিত হয়েছিল। 'সমর সেনের কবিতায়' খোলা চিঠির কবিতাগুলি ১৯৪২ - ৪৩ এই সময় সীমায় সংকলিত হয়েছে। কাব্যগ্রন্থের নাম নেই।

'নানাকথা' কাব্যগ্রন্থ থেকেই সমর সেনের কবিতায় ব্যক্তিগত অনুভবের জগতের চাইতে সমষ্টিগত অনুভব বড় হয়ে দেখা দিচ্ছিল। সমাজের ক্ষিষ্ণু অবস্থার পেছনে যেসব কারণ আছে অথবা এই অবস্থা পেরুনোর জন্য যে সংগ্রাম সমাজে সংঘটিত হয়েছিল তাই তিনি কবিতার বিষয় করে তুলছিলেন। সেই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত, রাজনীতির কুটিল আবর্ত এবং মধ্যবিত্ত দোলাচলবৃত্তি এই সবও রয়েছে। তখনকার সমাজ ও রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে এইসব বিষয়ের কবিতার বিষয় হওয়া অভাবনীয় তো নয়ই বরং অবশ্যম্ভাবী।

এই সব বিষয়ের সঙ্গে তাঁর নাগরিক মানসিকতারও উপস্থিতি ছিল তাই এক্ষেত্রে বিচার্য। প্রথমেই বলা দরকার সমসাময়িক যেসব বিষয় তিনি কবিতার বিষয়ভুক্ত করেছেন তা তাঁর বিশেষ মানসিকতার পরিচয়ই বহন করে। কারণ পল্লীপ্রকৃতির কবিতা বা পল্লীপ্রেমের কবিতায় এই ধরণের বিষয়ের স্থান পাওয়া সম্ভব নয়। তাহলে তা আর পল্লীর কবিতা হয়ে থাকবে না। 'খোলা-চিঠির কিছু কিছু কবিতায় তিনি যুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন '২২শে জুন কবিতা ----

আমাদের পাড়ায় প্রায় শুনি বলো হরি হরি বোল
এক একটি লোক ইহলোক ছাড়ে।

ঘুম ভেঙে প্রতিকায় পড়ি : প্রবল আক্রমণে,
সশস্ত্র মোরগোলে মৃত্যুর কলরোল,
প্রাণপণে লড়ে পাথুরে সেভাস্টোপোল।
কৃষ্ণসাগরে ছায়া পড়ে, কারখভে, লিবিয়ায়
বিষাক্ত বিছের দুটি দাঁড়া নড়ে।

'খোলা চিঠি' কবিতায়ও হিটলার, যুদ্ধ এবং পুঁজিবাদের প্রতি তাঁর ঘৃণা প্রকাশিত হয়েছে।

আজ ছিন্নভিন্ন প্রাণ পলাশ, রক্তকরবী, অন্ধকার সূর্যের ধ্বনি
ধ্বনি প্রতিধ্বনি
হিটলারি বর্গীর নামে ইউরোপের মুখে নামে করাল ঘৃণার
ছায়া
এদিকে ওদিকে হঠাৎ আক্রমণে নরঘাতকের শবদেহ জমে ;
শীত শেষ, ১৯৪২ সালে মহাযোধা বসন্ত এল,
এ-বসন্ত কাদের ? লক্ষ লালসৈন্য অগ্রসর বলিষ্ঠ জয়গানে
রক্তলোভী বন্য সৈন্য হত হয় অক্লান্ত অভিমানে,
উদয় সূর্যের দেশ প্রাচ্যে ছায়া ফেলে, লড়ে বীর চীনে
নির্ভয় সজ্জনে।
অসংখ্য বর্গির গোরস্থানে
পুঁজিবাদ চূর্ণ হবে সারা দুনিয়ায়, লুপ্ত হবে এ হিংদস্থানে

রাশিয়া এবং চীনের সংগ্রামের প্রতি তাঁর আন্তরিক সমর্থন এইসব কবিতায় ধরা যায়। তিনি যেন এখন কমিউনিস্ট পার্টির একজন সমর্থক হয়ে কবিতা লিখছেন। সমর সেনের কবিতায় সচরাচর একটা নিরাশা বা পরাজয়ের ভাব ফুটে ওঠে কিন্তু এই সব কবিতায় কখনো কখনো তিনি সম্মিলিত শক্তির জয় হবে এমন ভাবও

প্রকাশ করেছেন। 'জাতীয় সংকট' কবিতায় —

বিপ্লবী চেতনার সেতুতে
সংকীর্ণ করো এ দুস্তর ব্যবধান,
তোমার অখণ্ড সত্তায় দাও অধিকার,
এ প্রার্থনা আমার।

অথবা 'ইতিহাস' কবিতায় —

হঠাৎ সূর্য ওঠে, বলিষ্ঠ প্রহারে
কুয়াশায় নদীর জল ঝলকায়, শাণিত হাতিয়ার।
মাঝে মাঝে বানচর, কাদাখোঁচা জলে নামে,
ধান ক্ষেতে কাস্তে হাতে কিষাণ,
হাতুড়ি বাজে কামারশালে,
সবুজ অগুন জ্বলে অনেক মাঠে।

এই কবিতাগুলিতে সমর সেন শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবের ওপরে গভীর আস্থা পোষণ করছেন। বাংলার পল্লীকবি যাঁরা তাঁদের কবিতায় জীবনের দুঃখ-সুখের কথা থাকলেও এক শান্ত জীবন ভাবনাও কাজ করে। তাছাড়া তাঁদের কবিতায় কখনোই যুদ্ধ, পুঁজিবাদ, হিটলার ইত্যাদি বিষয় আসে নি। অবশ্য 'বর্গির' কথা আমাদের ছড়ায় আছে —

খোকা ঘুমুন, পাড়া জুড়ান।
বর্গি এল দেশে॥

আধুনিক কালের অত্যাচারী বর্গি হিটলার তার উন্নত সমর সেন করেছেন 'হিটলারী বর্গি' বলে। পল্লী কবিতার কাছে এইটুকুই তাঁর ঋণ। সুখ লালিত

গ্রাম্য জীবন নয়— বাস্তব কঠিন এইসব ঘটনার ছবি ফুটিয়ে তোলাই কবির একমাত্র কাজ।

সরাসরি নাগরিক জীবনের ছবি এই বইটির কবিতায় খুব একটা ফুটে না উঠলেও কিছু কিছু আছে। যেমন 'পোড়ামাটি' কবিতায় পুরোনো দিল্লীর কথা বলেছেন —

শতাব্দীর কাল সন্ধ্যায় দিল্লীর শ্মশান স্তব্ধতায়
বারে বারে মনে পড়ে ঃ চারিদিকে ধূ ধূ মাঠ, অনেকদিন
বন্ধ আবাদ,
ধ্বংস সাম্রাজ্যের ভয়াল সমারোহে জাগে তুগলকাবাদ।

এখানে যে দিল্লীর উল্লেখ তিনি করছেন নিঃসন্দেহে তা গ্রাম নয়, সেই সঙ্গে এও মনে রাখতে হবে এই দিল্লী যুদ্ধ আর ধ্বংসে মৃতপ্রায়।

'একটি শহর' কবিতায়ও তিনি শহরের কথা বলেছেন। প্রসঙ্গত: বলা দরকার 'সমর সেনের কবিতায়' তিনি কবিতাটির নাম পরিবর্তন করে রেখেছিলেন 'স্টালিনগ্রাড'। এই নাম পরিবর্তন নির্বিশেষ শহরকে বিশেষিত করেছে। যাইহোক এখানে এই কাব্য সংকলনে তিনি কোন একটি শহরের কথা বলেছেন যে শহর প্রতিরোধ গড়ে তুলছে।

গভীর রাতে অনেক লোক জাগে,
বিপুল বিক্ষুব্ধ পৃথিবীর
হৃৎপিণ্ডে এখনো গরীয়ান
কত বর্বরের গোরস্থান এ শহরে

রাতে ভয়ংকর মৃত্যুর মুখে জীবনের জয়গান বাজে,
দূরে নদীর ওপারে হঠাৎ ফেউ ডাকে হুঁশিয়ার।

এখানে অবশ্য তিনি শহরের কেবল ধ্বংসের ছবি দেখছেন না, মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও যেখানে জীবনের গান বেজে ওঠে, যে শহর মৃত্যুকে প্রতিহত করতে পারে, তারই কথা বলেছেন।

'খোলা চিঠি' কবিতায় আবার তিনি ফিরছেন কোলকাতা শহরে।

সুন্দর প্রভাত, ডায়মণ্ডহারবার থেকে বোড়ো হাওয়া আসে,
দিনরাত্রি আলোড়িত করে জনতার সফর, আমাদের শহর,
বিমানঘাঁটিতে হঠাৎ হাজিরা দেয়, এখনো পড়েনি বাজ,
চলে কুচকাওয়াজ,
নিরপেক্ষ শূন্যে ঘোরে মজাদার হাওয়াই জাহাজ।

শহরের ভীড়কে মনে করছেন 'জনতার সফর' অথবা বোম না পড়ায় খানিকটা কৌতুকের সুরে বলছেন 'মজাদার হাওয়াই জাহাজ'। এই কবিতারই অন্য পঙক্তিতে ব্যবসায়ীদের পরজীবী বলে ব্যঙ্গ করছেন। সেই সঙ্গে স্বাধীনতার জন্য নির্ভর করেছেন শ্রমিক শ্রেণীর ওপর।

মুষ্টিমেয় বেনে, আর মধ্যবিত্ত, পরজীবী, শেঠির দালাল,
যদি ক্ষীত স্বার্থের স্নায়ুতে
মনের অন্ধকারে, বামনবুদ্ধির ভ্রান্তিতে ঘোরে
কূপমণ্ডুকের মতো, যদি ভাবে মীরজাফরী জিন্দগী মন্দ কী,
ডাকে কুমির, কাটে খাল, যদি বলে, স্বাধীনতা তেরী মাল,
ও চিজ এদেশে আনবে ভদ্রলোক নন্দদুলাল,

কুরুক্ষেত্রে ক্লীবের পন্থা ধরো,
যদি চায় হিন্দুস্থান লোলুপ জাপান
তবে জবাব তাদের হাতে, এ-দেশ যাদের,
যারা লাঙলে তিলে তিলে সোনা ফলায়,
অন্নের প্রাণের কাঙাল,
নয়ানাভিরাম নীল মেঘ দেখে যারা ফসলের দিন গোনে,
কারখানার কলে যারা দধীচির হাড়ে সভ্যতার বনিয়াদ গড়ে
শহরে শহরে।
দেশে বিদেশে, বন্যার মুখে জাঙাল বেঁধে,
তারা বলে, দুনিয়ার দুশমনের প্রতিরোধে
দুনিয়াকো কিষাণ মজদুর মজদুর কিষাণ এক হো।

এখানে একই সঙ্গে কবির উপহাস এবং ভালবাসার প্রকাশ ঘটেছে। কবির এই ভঙ্গী নিঃসন্দেহে তাঁর বুদ্ধিজীবী মনের পরিচয় দেয়। বাংলার প্রবাদগুলোকে তিনি একটু ঘুরিয়ে ব্যবহার করেছেন। (যেমন কুঁয়োর ব্যাঙ' বা খাল কেটে কুমির ডাকা) এই ব্যবহার তাঁর চাতুর্যকেই প্রকাশ করে।

'জাতীয় সংকট' কবিতায় তাঁর কাছে গ্রাম বা শহর এক হয়ে গেছে। যুদ্ধের ভয়াবহতা কাউকেই ছেড়ে দেয় নি।

গোধূলির পরে
পুরোনো গ্রামের পরিচিত দোকানে আসি,
টিমটিমে আলো, দেয়ালে দেয়ালে করুণ ছায়া,
শূন্য চালের থলি, শীর্ণ ইঁদুর।
.....
মনে পড়ে, কাছের শহরে অগনন লোক,

চালের কাঙাল।
আজ তাম্রসীতা, উলঙ্গিনী, দুর্ভিক্ষ বন্যা আমাদের দেশ
কিম্ভূত কিমাকার জীবে আচ্ছন্ন নিঃসঙ্গতায়
অস্থিচর্মসার সন্তানের ভিড়ে নীরবে বসে।

এই কবিতারই অন্য জায়গায় বলছেন —

তোমার দুর্দান্ত আমলে
নরহন্তা বিদেশি রাজ, রক্তজোঁক স্বদেশি বণিক, সর্পিল
পঞ্চম বাহিনী
জীবন সংকীর্ণ করে, শহরে বন্দরে, গ্রামে
প্রাচীন সভ্যতা থোঁকে ঘেন্নো কুকুরের মতো।

যুদ্ধের মর্মান্তিক ভীষণতার কাছে শহর, বন্দর বা গ্রাম কারোরই রেহাই নেই কবি সমর সেন তা উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

এই কাব্যগ্রন্থের কোথাও কোথাও তিনি প্রচলিত বাক্যকে ব্যবহার করেছেন —

১. 'আমাদের দেশে তেরোপার্বনে বারোমাস সাঙ্গ হলো।'
(২২শে জুন)

২. 'ট্যাক সই সংসার' (জাতীয় সংকট)

৩. 'কূপমন্ডুকের মতো' (২২শে জুন)

৪. 'ডাকে কৃমির কাটে খান' (২২শে জুন)

বহুল প্রচলিত প্রবাদের এই ব্যবহার তাঁর বিশিষ্টতার পরিচয়ক।

কোন কোন পঙক্তি তিনি শ্লোগানের মতো প্রয়োগ করেছেন —

৫. 'জীবন ধারার ছাপ চেতনাকে গড়ে,
চেতনার ছাপ জীবন ধারাকে নয়।'[২০]

৬. দুনিয়ার দুশমনের প্রতিরোধে
দুনিয়াকো কিষাণ-মজদুর মজদুর কিষাণ এক হো।[২৯]

পঙক্তির এই ব্যবহার তাঁর কমিউনিস্ট সুলভ পরিচয় ফুটিয়ে তোলে।

তাঁর আত্মোসমালোচনা' কবিতায় তিনি যে ভঙ্গীতে নিজের সমালোচনা করেছেন তাতেও তাঁর ব্যঙ্গ বঙ্কিম মনের পরিচয় ফুটে ওঠে।

একদা আমরা ছিলাম বিমর্ষ বাঁদর,
আজ আস্ফালনে মত্ত যেন বীর হনুমান।

আত্মগর্বে গর্বিত বাঙালীর এর চাইতে ভাল ছবি আর কীইবা হতে পারে।

প্রগতিশীল দলের সমালোচনা করেছেন তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে 'জাতীয় সংকট' কবিতায় —

অন্ধ বধির খঞ্জের দলে ভিড়ি,
যেখানে অন্তরঙ্গ বন্ধুরা আমার,
পেশাদার নেতা রুশভক্ত শৌখিন কবি, চিন্তিত কেরানি,

এই সমালোচনা তাঁর পক্ষেই লেখা সম্ভব যিনি তাঁর অবস্থান সম্পর্কে সচেতন। আর এই সচেতনতা তাঁর নাগরিক মানসিকতার ফল।।

॥ ছয় ॥

সমর সেনের পঞ্চম তথা শেষ কাব্যগ্রন্থ 'তিনপুরুষ'। এরপর তিনি আর কোন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন নি। আরো পরিষ্কার করে বলতে কবিতা রচনাই তিনি প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন।

এই বইটিতে মোট তেরোটি কবিতা আছে। কবিতাগুলি দুটি গুচ্ছে ভাগ করা। প্রথম গুচ্ছে আছে তিনটি কবিতা – গুচ্ছটির কোন শীর্ষনাম দেন নি। দ্বিতীয় গুচ্ছে আছে বাকি দশটি কবিতা – শীর্ষনাম 'তিনপুরুষ'। তিনপুরুষ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৪ সালে। সমর সেনের কবিতায় এই গ্রন্থনামটি ব্যবহার করা হয় নি। '১৯৪৩ - ৪৪' এই সময়সীমার কবিতাগুলি তিনপুরুষের।

তিনপুরুষে সমর সেন গদ্যছন্দের সঙ্গে প্রথাসিদ্ধ কবিতার ছন্দও ব্যবহার করেছেন। পয়ার অমিত্রাক্ষর বা যৌগিকছন্দের ব্যবহারও তিনি করেছেন। এই ব্যবহার তাঁর পক্ষে নতুন হলেও তিনি কিন্তু ব্যবহারে সফল।

এই কাব্যগ্রন্থে আরো একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যে, এতদিন তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতার অংশ বিশেষ ব্যবহার করে রবীন্দ্র আবহকে ছিঁড়তে চেয়েছেন কিন্তু এখানে রবীন্দ্রনাথের নিজের শ্রেণীর কবিদের প্রতি তুলনায় তিনি নিজের সুবিধাবাদী চরিত্র দেখে আত্মধিক্কার দিয়েছেন।

সমর সেনের প্রথম দিকের কবিতায় নগর যেভাবে ছবির মত ফুটে ওঠে সেভাবে শেষের দিকের কবিতাগুলিতে ফুটে ওঠে নি তা আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি। 'কয়েকটি কবিতা' বা 'গ্রহণ' এ আমরা দেখেছি নগর কোলকাতা নাম পরিচয় সহ কবিতায় স্থান পাচ্ছে; কখনো বা কবিতার

পাত্র-পাত্রী শহরের পরিচিত পথ পরিক্রমা করছে। 'নানা কথা'য়ও দিল্লীর ছবি কোথাও কোথাও তুলেছেন। কিন্তু খোলা চিঠি বা তিনপুরুষে তা আর দেখা যায় না। অবশ্য শহরের কথা না থাকলেও কবির নগরমনস্কতার অভাব কোথাও ঘটে নি। তাঁর রাজনীতি সচেতনতা, ব্যঙ্গপ্রবণতা অথবা আত্মসমালোচনা থেকেই তাঁর মনের অবস্থান চিনে নেওয়া যায়।

তিনপুরুষ কাব্যগ্রন্থে কিছু কিছু কবিতায় তিনি শহরের উল্লেখ করেছেন। যেমন, গ্রন্থের প্রথম গুচ্ছের দ্বিতীয় কবিতাটির নাম 'শহরে'। কবিতাটিতে শহরের কথার চাইতেও বড় হয়ে উঠেছে সকল শ্রেণীর এবং গ্রাম শহর সকল স্থানের মানুষের সার্বিক দুঃখের কথা।

মহিষবর্ণ জগদ্দল মেঘে
দিগন্ত রুধ করে বৈশাখের একদিন।
শহরের প্রান্তে
জমাট অন্ধকারে কর্দমাক্ত স্তব্ধতায়
দুর্ভিক্ষের কঙ্কাল চলে আপন পথে;—

দুর্ভিক্ষের পথপরিক্রমায় গ্রাম ও রেহাই পায় না বা পায় নি-তার কথা তিনি পরের পঙক্তিগুলিতে বলেছেন।

কী অতীত, কী স্মৃতি মনে জাগে,
শূধু শূন্য মাঠ, পোড়ো বাড়ি, গ্রামের শকুন।

'জোয়ার ভাঁটা' কবিতায়ও তিনি মানুষের দুঃসময়ের কথা বলেছেন। একসময়ে জীবনের সুন্দর দিকগুলি চোখে পড়ত কিন্তু আজ আর তা পড়ে না। যখন সুন্দরের প্রকাশ ছিল সহজ তখন কবিও সুন্দরকে অনুভব

করেছেন। বর্তমানের কঠিন দিনে আর সে অনুভব মনে জাগে না।

একদা সহজ লীলায় পড়েছে দুরন্ত দানব,
আত্মস্থ রাখাল ফিরেছে আপন বাটে,
পাশে তার ধানের হরিৎ,
মনে তাঁর বর্ণছটা আদিম সূর্যের
সেদিন সন্ধ্যায়
আমরা নির্জন ঘরে এসেছে দিগন্তের গান।

আজ সে-রাখাল কালের সারথি,
ধূর্ত কঠিন। রথচক্রে নির্বান্ধব প্রান্তর।

দুর্দিন আর দুঃসময়ে সবাই তার নিজের ধর্ম ভোলে। মানুষ বাঁচার আশায় উন্মত্তের মতো ছুটে বেড়ায়। যে চাষীরা একসময় গ্রাম নগরের প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখত এখন তারাই বাঁচার পথ খুঁজে বেড়ায়।

হেমন্তের প্রবীণ বিষন্নতা
দিনান্তের মাঠে, জনহীন গ্রামে
ভিটেতে ঘুঘু ডাকে,
চাষিরা পায়ে হেঁটে গেছে দূর দেশান্তরে
প্রানের সন্ধানে নগরের প্রেতলোকে।

মানুষ বাঁচার আশায় শহরে ভিড় জমায় গ্রাম জনহীন হয়ে যায়। শহরের কথা এখানে আছে কিন্তু এই শহর প্রাণহীন— তাই 'প্রেতলোক' বলছেন। গ্রামে হয়তো মানুষ নেই— কিন্তু কবি ভাবছেন সেখানে আকাশসন্ধানী বটগাছ রয়েছে— সেটাই হয়তো তাঁর কাছে আশার কথা।

'তিনপুরুষ' অংশের 'অকাল' কবিতায়ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপের সাথে শহর কথাটির উল্লেখ আছে। এখানে শহরের কেরাণী-শৈশবের গ্রামের ছবিটির কথা ভাবছে, শহরকে তার 'রৌরবের নিঃস্বন' বলে মনে হয়।

বিকল অন্তরে যেন বিদেশি বাঙ্গাল
বিচ্ছিন্ন শহর প্রান্তে
দূরে দেখি মাঠে কত ধানের দুলাল,
কিষাণের চষাক্ষেত নিমক হালাল।

এই শহরে তিনি যে আগন্তুক তা বোঝা যায় 'বিদেশী বাঙ্গাল' শব্দপ্রয়োগে। তাই তিনি বিচ্ছিন্ন।

'গৃহস্থ বিলাপ' কবিতায়ও গ্রাম ছেড়ে শহরে আসার কথা আছে —

আমাদের বংশে
গ্রাম ছেড়ে পিতামহ প্রথম শহরে আসেন।
রক্তে তার কিছু ছিল নদীর উদ্দাম বেগ,
সাক্ষী তার ষোড়শ সন্তান।
গুরু আছে যে গৃহত্যাগ কালে
দেবী তাঁকে স্বপ্নে করেছেন বরদান
দুধে ভাতে বাঁচিবেক তোমার সন্তান।
সুতরাং
সবুজ চশমা চোখে আবরণ ছিল,
সে সবুজ আদি ভিটের জমিজমার,
কিছু বা আপন পৌরুষের।

একসময় যারা শহরে এসেছেন গ্রাম ত্যাগ করে তাদের জীবনমুখ আজকের মতো কঠিন হয়নি। তখনো 'সন্তানের জন্ম আর সর্বনাশ' সমার্থক হয়ে ওঠে নি। ত্রিদশ দিন পান্তায় —

ভদ্রভাবে দিন গুজরাণ অসম্ভব আজ।
কোঁচার পাটে ময়লা জমে,
টেরিও থাকে না ঠিক,
ষোড়শপচার ব্যঞ্জন কমে।

মধ্যবিত্ত বাঙালীর বিনাসিতা টেরি ও কোঁচাতে সার্থক রূপ পেয়েছে। কিন্তু শুধু মাত্র এই বিনাসিতাই নয়, মানুষের আরো গভীরতর অভাব ত্রিদশে দেখা দেয়

..... কিছুদিন আগে
জ্বর থেকে উঠে অশক্তকান্ত রুগী
পেয়েছে অন্তত: পান্তাভাত,
পাশে যার নাচছে নুন,
মনোহর কাঁচালঙ্কা বঙ্কিম সবুজে।
আজ তাকে দেখি বেলা দ্বিপ্রহরে
ফ্যান খুঁজে ধোঁকে গৃহস্থের দুয়ারে দুয়ারে
বিরাট নগরে।

দুধ ভাত নয়, পান্তা ভাত কাঁচালঙ্কাও নয়, মানুষ শহরের পথে ঘোরে ফ্যান চেয়ে– পঙতিটি বিয়াল্লিশের মন্বন্তরের ছবিকে তুলে ধরে।

'সাফাই' কবিতায় তিনি কোলকাতার উল্লেখ করছেন। যুদ্ধের দুর্দিনে গ্রাম ছেড়ে তিনি শহরে ফিরছেন।

গ্রাম ছেড়ে গ্রামান্তরে যাই
কঙ্কালে ভরেছে দেশ।
এ রোদে সোনার ধান পোড়ে
মনে নীলকান্ত মেঘ শেষ।
কড়া রোদ যেন শাদা জানোয়ার
দীর্ণ করে পৃথিবী আমার।
দেবতাকে গাল দিয়ে কলকাতায় ফিরি।

কিন্তু সেখানেও ব্রিজটি জেগে আছে— যেন মরাদেশে জীবন্ত মানুষ। গলিগুলি অন্ধকার যুদ্ধের কারণে, আকাশে যুদ্ধের প্লেন> সাইরেনের শব্দ, সব মিলিয়ে রুদ্ধশ্বাস অবস্থা।

'২২শে জুন ১৯৪৪' কবিতায়ও শহরের উল্লেখ আছে।

আশ্চর্য ব্যাপার দেখি আজব শহরে
দেশবিদেশি পল্টনে দিগ্বিদিক ভরে।
....
শ্রাবণ শহরে দেখি সোনার বাঙালী
একাগ্র সন্ধানে ঘোরে, কঙ্কাল কাঙালী।

যুদ্ধের দিনের ফৌজী দাপট আর নিরন্ন শহরবাসীর দুর্দশার কথা বোঝাতে চেয়েছেন। পৃথিবী ব্যাপি যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে তারই আগুনে পুড়ছে আমাদের দেশের নগর গ্রাম। 'দুকোটি ক্ষুধার অভিশাপ'এখন বাংলা দেশের ঘরে— তার কারণ যুদ্ধ—যাতে আমাদের কোন দায় নেই। অথচ অন্য দেশের চিত্র হবে অন্য রকম —

অন্যদেশে লেগেছে আগুন
কালশিটে কালোমেঘ, সূর্যাস্তের রং যেন মানুষের খুন
কিন্তু সেখানে, হে দেব, আগ্নেয় স্ফুলিঙ্গে
ধূমায়িত অরণ্যপ্রান্তরে বিদীর্ণ পাহাড়ে
গুহাস্তরে পলিমাটি জমে; দিগ্বিজয়ী সৈন্যদল,
দর্পহর বর্বর কাহিনীর, সহজ সকাল আনে,
সেখানে ট্যাঙ্কের শব্দ স্তব্ধ হলে
বিধস্ত মাটিতে আনে ট্রাক্টরের দিন

অর্থাৎ যুদ্ধের সমূহ ক্ষতি আমাদের, কিন্তু 'ঐশ্বর্যে কি নাড' তাছাড়া 'কলনি দুর্বিপাকে ক্লীবের বিলাপ'। তাই আমাদের দেশ মন্বন্তরের আগুনে আর 'অনাত্মীয় ভিড়ে নগরের রাস্তা ভরে'— গ্রাম ছেড়ে যারা শহরে আসছেন সেই উদ্বাস্তুরাই আজ নগরের অনাত্মীয়– তাদের ভিড়ে শহর আরো ভারাক্রান্ত।

নগরের উল্লেখ তিনি এই বইটিতে এই কটি পঙক্তিতেই করেছেন। কিন্তু তার নাগরিক মনের প্রতিফলন ঘটেছে অন্যভাবেও–এখন সেই আলোচনায় আসা যাক।

প্রথমেই দেখা যায় নিজের এবং শ্রেণীগত সমালোচনা তিনি নানা জায়গায় করছেন। যেমন 'অকাল' কবিতায় বলছেন —

বছর পঁচিশ হলো পৃথিবীতে বাসা।
কেরানি সন্তান আমি, চতুর মানুষ,
কৈশোরে শুনেছি নানা মজাদার কথা,
কেরামৎ। এরি মধ্যে করতলগত
কত ছলা।

এখানে কেরানির সন্তান বলে একটা শ্রেণীকে এবং সেই শ্রেণীর সুবিধাবাদী চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। আর কেরাণী শব্দটিও লক্ষণীয়।

'বাবু বৃত্তান্ত' কবিতায়ও তিনি এই শ্রেণীর প্রতি বিদ্রূপ করেছেন —

গণশক্তি গণযুদ্ধ প্রলাপ বচন
ওসবে দেবে না কান হিন্দুর নন্দন।
পীতশক্তি অনিবার্য, শাস্ত্রের বচন।

অথবা,

আর্যনাসা বারবার কেটে অনার্যের
যাত্রাভঙ্গে সিংহহস্ত হে ধূর্ত নায়ক।
ক্ষান্ত কর ছলাকলা !

এই পঙক্তিতে শুধু আর্য জাতি সুলভ হাস্যকর মানসিকতাকেই ব্যঙ্গ করেননিসঙ্গে সঙ্গে প্রবচনের অদ্ভুত ব্যবহারেও তাঁর নাগরিক মানসিকতা ফুটে ওঠে।

'বিকলন' কবিতাতেও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতি ব্যাঙ্গাত্মক আক্রমণ আছে —

..... সে কি জানে
যৌবনে অন্যায় ব্যয়ে বয়সে কাঙালী
দিনগত পাপক্ষয়ে মূঢ় ভ্রান্তমতি
লোকায়ত কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন বিধুর
মধ্যবিত্ত মানসের বিড়ম্বিত গ্লানি ?

অবশ্য এখানে ব্যঙ্গের সঙ্গে কারুণ্যের সুপ্ত মিশ্রণও ঘটেছে।

এই কাব্যগ্রন্থে তিনি রবীন্দ্রনাথের সাথে নিজেদের তুলনা করেছেন এবং এই তুলনায় নিজেদের দ্বিমুখী চরিত্র লক্ষ্য করে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে বিদ্ধ করেছেন। 'সাফাই' কবিতায় —

আমি রোমান্টিক কবি নই, মার্কিসস্ট।
অনেকে জিজ্ঞাসা করে, গুরুদেবের দৃষ্টির সঙ্গে
তোমার তফাৎটা কী ? তফাৎটা এই :
বেদ উপনিষদের বুলি মুখে তিনি বরাবর,
অক্লান্ত বাউল, একই নৌকায়
একঘেয়ে খেয়া পারাপার করেছেন,
কিন্তু জড়বাদী সুবুদ্ধির জোরে আজ আমি
দুনৌকায় সুছেন্দে পা দিয়ে চলি,
বুর্জোয়া মাখন আর মজুরের ক্ষীর
ভাগ্যবান এ কবিকে বিপুলা যশোদা
নিশ্চয় দেবেন বলে আমার বিশ্বাস।

আরো একটি কবিতায় '২২শে জুন ১৯৪১' এও তিনি এই রকমই তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেছেন —

শ্রেতলোকে যারা আনে প্রাণের স্বাক্ষর,
কর্ম আর চিন্তা যাদের জীবনে হরিহর,
অমর নমস্য তারা।
....

লেনিন, স্টালিন, জুখভ ও গোর্কি,
তাদের আমরা চিনি। কিন্তু বুঝিনা তাকে,
দুধ ও তামাক সমান আগ্রহ যার
দুনৌকার যাত্রী, এই বাঙালী কবিকে,
বুঝি না নিজেকে।

দু নৌকায় পা দিয়ে সুবিধাবাদীর মত জীবন চালানোকে তিনি বরাবরই ঘৃণা করেছেন তাই সমালোচনাও করেছেন। তাঁর এই সমালোচনা শিক্ষিত নাগরিক মানসিকতারই ফল। এই মানসিকতার জোরেই তিনি বুঝেছিলেন যারা মুখে মার্কস লেনিনের বাণী আওড়ায় সেই সব মানুষের ব্যক্তি-গত সততা বলে কিছু নেই। শুধু তাই নয় তারা শ্রেণী সচেতনও নয়।

সমর সেনের কবিতায় দুঃখ বা হতাশার ছবিই বেশী ফুটে ওঠে। তিনি যুদ্ধ, মন্বন্তর শোষণ এবং নিরন্ন মানুষের হাহাকারে আশাহত হয়েছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দাপটে ইংরেজ শাসিত কলোনীগুলির যে রূপ তিনি দেখেছেন তাতে আশাহত হয়েছেন। এই যুদ্ধ আমাদের কিছু দেয় নি একটা দুঃখের ভারী বোঝা ছাড়া তাই কবি কখনো ক্ষিপ্ত হয়েছেন কখনো বা ব্যঙ্গ করেছেন। তবু কোন দুর্লভ সময়ে তিনি আশাও রেখেছেন এক সুন্দর সকালের।

আশা রাখি একদিন একান্তার পার হয়ে পাব
লোকের বসতি, হরিৎ প্রান্তরে শ্যামবর্ণ মানুষের
গ্রাম্যগানে গোধূলিতে মেঠো পথ ভরে,
পরিচ্ছন্ন খোশগল্পে মুখরিত ঘনিষ্ঠ নগর,
বাংলার লোহিত সকালে সকলের অক্লান্ত সফর।২২

সমর সেন মাত্র পাঁচটি কাব্যগ্রন্থের মধ্য দিয়ে তাঁর কবি জীবন শেষ করেন। অথচ এরপর দীর্ঘ সময় ধরে তিনি লেখার জগতেই থেকেছেন। কিন্তু কবিতায় তাঁর বক্তব্য বলা যেন এখানেই সমাপ্ত হয়েছে। তাঁর নিজের কবিতা বা সেই সময়কার কবিতা বিষয়েও তিনি প্রায় নীরব থাকার চেষ্টা করেছেন। কবিতা লেখা যখন তিনি ছেড়েছেন তখনো তিনি জনপ্রিয় কবিই ছিলেন। একথাও ঠিক নয় যে তিনি কবিতা আর লিখতে পারছিলেন না— কারণ অনুবাদ কবিতা এবং দু একটি মৌলিক কবিতার ও সন্ধান মেলে। তাহলে কবিতা লিখতে না পারার জন্য নয় কিন্তু কারণটি সমর সেন ব্যক্ত করেন নি। হয়তো তখনকার কালের কবিদের সমর সেনের অন্ধ অক্ষম অনুকরণ নিজের বক্তব্য বিষয়ে পৌনপুনিকতা ইত্যাদি মিলিয়ে তাঁকে কবিতার প্রতি বিমুখ করে তুলেছিল।

বাস্তবতার বোধ, কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি তাঁর বিশ্বাস, সমালোচনা, সর্বোপরি তাঁর নিজস্ব চিন্তা ভাবনা সবই তিনি কবিতার মধ্যে বলেছেন কিন্তু তাঁর বিষয়ে আমাদের যেটি বলার কথা এবং সম্ভবত: যেটি সমর সেন প্রসঙ্গে অন্যতম কথা তা হলো তিনি একান্তই নাগরিক কবি এবং তা প্রথমাবধি। প্রথম জীবনে কোলকাতার নাগরিক জীবনে যে ধূসরতা, বিবর্ণতা বা ক্লান্তিকে দেখেছিলেন পরবর্তী জীবনে সেই অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ হিসাবে বিপ্লবী পন্থার ওপর আস্থা স্থাপন করেছিলেন। বলাই বাহুল্য তাঁর সেই আস্থা শেষ পর্যন্ত টেঁকে নি, তাহলেও তিনি নগর জীবন থেকে সরে আসেন নি। পল্লী প্রকৃতির কল্পলোকের মধ্যে বাসা বাঁধেন নি। (তাঁর মত বুদ্ধিজীবীর পক্ষে তা সম্ভবও ছিল না।) এই জীবনকে তাঁর নিয়তি বলে মেনে নিয়েই সুন্দর এক সকালের স্বপ্ন দেখার চেষ্টা করেছেন॥

:: সূত্র নির্দেশ ::

১. An Acre of Green Grass : Buddhadeb Bose / A review of Modern Bengali Literature : 1948.
অনুষ্টুপ সমর সেন বিশেষ সংখ্যা।

২. A modern Poet, But not progressive : Dhurjati Mukherjee
কয়েকটি কবিতা : অনুষ্টুপ সংস্করণ।

৩. নবযৌবনের কবিতা : বুদ্ধদেব বসু, কবিতা, আষাঢ় ১৩৪৪ সংখ্যা।

৪. বিস্মৃতি : কয়েকটি কবিতা।

৫. একটি নিউরিটিক কবিতা : ঐ ।

৬. একটি প্রেমের কবিতা : ঐ।

৭. প্রেম : ঐ ।

৮. একটি মেয়ে : ঐ ।

৯. বিষ্ণু দে : কয়েকটি কবিতা: সমরসেন পরিচয়- ভাদ্র: ১৩৪৬ (অনুষ্টুপ: পরিশিষ্ট)

১০. A mor stands upon you : কয়েকটি কবিতা অনুষ্টুপ।

১১. মৃত্যু : ঐ

১২. পকেট গ্রাজুয়েট : ঐ

১৩. নবযৌবনের কবিতা : বুদ্ধদেব বসু , কবিতা - আষাঢ় ১৩৪৪ সংখ্যা (অনুষ্টুপ পরিশিষ্ট)।

১৪. একালের কবিতা : চল্লিশ দশক : কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত বিচিন্তা, সেপ্টেম্বর ১৯৮৫।

১৫. গ্রহণ : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় চতুরঙ্গ, চৈত্র ১৩৪৬
অনুষ্টুপ : সমর সেন বিশেষ সংখ্যা।

১৬. In Defence of the 'Decadents' : Samar Sen
New Indian Literature, 1939

অনুষ্টুপ : সমর সেন বিশেষ সংখ্যা।

১৭. রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ও আধুনিক সাহিত্য : ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়
পরিচয়, বৈশাখ, ১৩৪৭ (অনুষ্টুপ সমর সেন বিশেষ সংখ্যা)।

১৮. নানা কথা : মনীন্দ্র রায় কবিতা : আশ্বিন ১৩৪১।

১৯. নানা কথা : ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় পরিচয় : ফাল্গুন ১৩৪১।

২০. জাতীয় সংকট : খোলা চিঠি

২১. খোলা চিঠি ঐ

২২. ২২শে জুন ১৯৪৪ : তিনপুরুষ।

****

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

:: সুভাষ মুখোপাধ্যায় ::

॥ এক ॥

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার নওগাঁ শহরে জন্মগ্রহণ করেন ঐ শহরেই তাঁর ছেলে-বেলার দিনগুলো কেটেছে। ১৯৩০ সালে তিনি পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে কলকাতায় চলে আসেন এবং এখানেই তাঁর পড়াশুনো আরম্ভ করেন। প্রথমে ভবানীপুরের মিত্র স্কুলে ও পরে স্কটিশচার্চ কলেজে তিনি পড়াশুনা করেন। ১৯৪০ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পদাতিক' প্রকাশিত হয়। প্রথম কাব্যগ্রন্থ হলেও, এটি কবির অল্প বয়সের রচনা হলেও এই গ্রন্থে তাঁরঅপরিণত মনের কোন পরিচয় নেই। কবিতার ভাষা প্রয়োগ, ছন্দকুশলতা, সর্বোপরি কবিতার বিষয়বস্তুতে তিনি আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ফলে এই কবি তখনকার কবি সমাজে এবং পাঠককুল দুয়ের কাছেই বরণীয় হয়েছিলেন। পদাতিক তাঁর প্রথম কবিতার বই হলেও এতে প্রেম বা প্রকৃতি বিষয়ক কোন কবিতা ছিল না— অথচ সচরাচর বাঙালী কবিরা এই দুইটি বিষয় নিয়েই তাঁদের প্রথম কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। সমর সেনের মত কবিও তাঁর 'কয়েকটি কবিতায় এই দুই বিষয়কে অবলম্বন করেছিলেন— যদিও দীর্ঘনিঃশ্বাস ছিল তবু প্রেম বা প্রকৃতিকে তিনি কবিতায় অস্বীকার করতে পারেন নি। কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায় সেদিক থেকে ব্যতিক্রমী কবি বলা যায়। প্রেমের বদলে তিনি তাঁর কবিতায় যুদ্ধের সজ্জা পরার আহ্বান জানিয়েছেন। বস্তুতঃপক্ষে তাঁর এই কাব্যগ্রন্থে তিনি তাঁর বিপ্লবী চিন্তাভাবনাগুলিকেই রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন।

Thus in his very first collection Subhash established himself as a unique voice, a voice responsive to the social commend. His lyric bade good bye to the

lyric in its very beginning to become part of the general proletarian cause. Never dogmatically forced, Padatik showed his dream for a cause and his commendable command over the form of verification with a trace of distortiorv, a touch of grostesque here and thre, resulting in inimitable grace, vitality and freshness in his poetry. ১

পদাতিকের কবিতা রচনা করার সময় বা কবির ছাত্রাবস্থাতেই তিনি ক্রমে ক্রমে বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে [illegible] যুক্ত হচ্ছিলেন। ১৯৪১-এ তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ছাত্র আন্দোলন এবং খিদিরপুরের ডক অঞ্চলের শ্রমিক সংগঠনের ক্রিয়াকান্ডের মধ্য দিয়ে অতি দ্রুত অর্থাৎ ১৯৪২-এই পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। ঐ বছরই ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের তিনি যুগ্ম সম্পাদক হন। ১৯৪৩-এ তিনি বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে পার্টির কাজে ঘুরে বেড়ান। ঐ সময়ের অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনের একটি বড় সম্পদ। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০-এর মধ্যে তিনি দুদফায় প্রায় দুবছর কারাবাস করেন। ১৯৪০ এর পদাতিকের পর দীর্ঘদিন কবিতা প্রকাশ করেন নি। ১৯৪৮ প্রকাশিত হয় একটি কাব্যপুস্তিকা 'অগ্নিকোণ'। তারপর ১৯৪০ থেকে অগ্নিকোণের আগে পর্যন্ত লেখা কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয় 'চিরকুট'- ১৯৫০ সালে। এই গ্রন্থের শেষে অগ্নিকোণের কবিতাগুলিও সংকলিত হয়। পদাতিকে তিনি যে পথের সন্ধান করেছেন এখানে তা খুঁজে পেয়েছেন। পরাধীন ও শোষিত মানুষকে তিনি সেই পথের সাথী হবার জন্য আহ্বান পাঠিয়েছেন। সেই সময়কার ইতিহাসে পৃথিবীর নিপীড়িত মানুষের যে জয়যাত্রা দিকে দিকে ধ্বনিত হয়েছিল তিনিও তাতে সামিল হয়েছেন। তিনি মানুষের বাঁচার এই প্রচেষ্টাকে কবিতায় রূপায়িত করেছেন।

কবিতা ও রাজনীতির কাজ এই দুয়ের মধ্যে প্রথম দিকে সুভাষবাবুর দ্বন্দ্ব ছিল কিন্তু জেলে যাওয়ার পর তিনি বুঝতে পারলেন এই দুয়ের মধ্যে কোন জল-অচল বিভেদ নেই। বরং কবিতা তাঁর হাতের অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে। সমধর্মা নানান রাজনৈতিক কর্মীর কবিতা তাঁর সামনে এ বিষয়ে উদাহরণ হয়ে উঠেছে যেমন নাজিম হিকমত, পাবলো নেরুদা বা নিকোলা ভাপাৎসারভ। রাজনীতি ও কবিতার এই দ্বন্দ্ব নিয়ে তিনি লিখেছেন --

'ছোটবেলায় যখন আমি লেখা শুরু করি, আমার লেখা এবং খানিকটা রাজনৈতিক যে জীবন, এটা বরাবর একসঙ্গে চলেছে। স্বাধীনতার আন্দোলন আমাকে প্রেরণা দিয়েছে, ফলে আমি না লিখে পারিনি। কিন্তু যখন সিরিয়াসলি আমি লিখতে শুরু করেছি, তখন এই প্রশ্ন উঠেছে যে এটি লেখার সময়, না এখন রাজনীতি করার সময় ? কারণ আগে দেশকে স্বাধীন করতে হবে, তারপরে আমরা অন্য কথা ভাবব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি না লিখে পারি নি। তার কারণবোধ হয় এই যে, আমি জীবনে কি চাই সেটা লেখার ভিতর দিয়ে বলতে চেয়েছি এবং না বলে পারিনি। আমি যখন কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিই তখনও ঠিক এই ভাবে প্রশ্নটা এসেছিল যে আমি লেখক থাকব, না কর্মী হব ? আমি এই সিদ্ধান্তই নিয়েছিলাম যে না, আমি লেখক থাকব না, আমি কর্মীই হব। কিন্তু পার্টির কাজ করতে করতে এটা প্রমাণ হয়ে গেল যে পার্টিতে লেখার কাজটা আমি ভালো পারি এবং সে কাজটারও একটা দাম আছে। এটা আমি বলছি, যখন লেখা বেশ কয়েকবছর ছেড়ে দিয়ে শেষে আমি যখন জেলে যাই, জেল-খানায় আমাকে বহু কমরেড বলেছে, 'কেন আপনি লেখেন না ? আমরা আপনার লেখা পড়ে আন্দোলনে এসেছি অথচ আপনি লেখেন না, আপনার লেখা উচিত।' তাদের এই কথা আমাকে খুব ভাবিয়েছে, কিন্তু তা হলেও আমি জেলখানায় কিছু লিখিনি। বরং আন্দোলন করেছি, রাজনীতি পড়েছি, কিন্তু লেখা আমি শুরু করলাম এরপরে জেল থেকে বেরিয়ে– যখন আমি

বাঙালী চটকল শ্রমিকদের গ্রামে গিয়ে থাকলাম। শ্রমিক-আন্দোলন করতে করতেই আমার চারপাশের জীবন আমাকে লেখার দিকে ঠেলে দিল। [২]

এরপর সুভাষবাবু আর পিছন ফিরে তাকান নি। লেখা ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে তিনি এক সমান্তরালে নিয়ে এসে কাজ শুরু করে দিলেন, একের পর এক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করলেন-কখনো তা মৌলিক, কখনো অনুবাদ।

সুভাষবাবু কখনো কোন চাকরী করেন নি। কবি হিসাবেই তিনি এখনো আছেন। দীর্ঘদিন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। পার্টি যখন ভেঙে দুটুকরো হয়েছে তখনো সুজন হারানোর সুতীব্র দুখ সয়েও তিনি পার্টির সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু ক্রমে তাঁর মধ্যে এসেছে দ্বিধা দ্বন্দ্ব তিনি উদ্ভ্রান্ত বোধ করেছেন— ১৯৮২তে তিনি পার্টির সদস্যপদ আর নবীকরণ করান নি। বামপন্থী কর্মকাণ্ড থেকে তিনি নিজেকে মুছে দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর আসল কাজ যে কবিতা লেখা তা অব্যাহত রেখেছেন।

সুভাষবাবু — ১৯৬৪তে আকাদেমি পুরুস্কার, ১৯৭৭ লোটাস (আফ্রো এশিয়ার রাইটার্স অ্যাসোসিয়েসনের পক্ষ থেকে) ১৯৮৮ তে কবীর পুরুস্কার এবং ১৯৯২-এ জ্ঞানপীঠ পুরুস্কার লাভ করেছেন।

চুয়াত্তর বছরের কবি এখনো অক্লান্ত হাতে লিখে চলেছেন। পদাতিক-এর সময়ের আবেগ উচ্ছ্বাস বা আন্দোলন ধর্মী কথাবার্তা তাঁর সাম্প্রতিক কবিতায় নেই— কিন্তু আদ্যন্ত শহুরে এই কবির চেতনায় নগর ভাবনা কাজ করে চলেছে ।

কবির কাব্য গ্রন্থের একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল :

১. পদাতিক : ১৯৪০ খৃঃ

২. অগ্নিকোণ : ১৯৪৮ খৃঃ

৩. চিরকুট : ১৯৫০ খৃঃ

৪. নাজিম হিকমতের কবিতা : ১৯৫২ খৃঃ

৫. ফুল ফুটুক (আলাদা কাব্যগ্রন্থ হিসাবে নয় — সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা' — নিউএজ' প্রকাশনীর সংকলন গ্রন্থে গুচ্ছাকারে ছিল — এটি ১৯৫৭তে প্রকাশিত)।

৬. যতদূরেই যাই : ১৯৬২ (১৩৬৯ বং) খৃঃ

৭. কাল মধুমাস : ১৯৬৬ "

৮. এই ভাই : ১৯৭১ "

৯. ছেনে গেছে বনে : ১৯৭২ "

॥ দুই ॥

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পদাতিক'। ১৯৪০ সালে তেইশটি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম কাব্যগ্রন্থেই এই কবি যেন 'এলেন, দেখলেন এবং জয় করলেন'। বাংলা দেশের কবিসমাজের শীর্ষস্থানীয়েরা তাঁকে সানন্দে বরণ করে নিলেন। সাধারণ পাঠকের কাছেও তিনি সমাদৃত হলেন। বিশেষত: কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত অথবা আন্দোলনের প্রতি সমর্থিত মানুষের কাছে বিপুল সমাদর লাভ করলেন।

পদাতিকের কবিতাগুলি তাঁর সমসাময়িক কিছুটা পূর্ববর্তী কবিদের কবিতা থেকে সম্পূর্ন আলাদা। আঙ্গিকে এবং বিষয়বস্তু দুয়েতেই এই এই ভিন্নধর্ম লক্ষ্য করা গেছে। পৃথিবীব্যাপ্ত ধ্বংস এবং ক্ষয় মানুষের জীবনে ছায়া ফেলেছিল, মূল্যবোধ বিষয়ে ভ্রান্ত-মানুষ অন্ধগত অবক্ষয়ের পথে চলছিল-পৃথিবীর এই দারুণ দুর্দিনে কবিদের মধ্যেও দেখা দিয়েছিল হতাশা। আর তাঁরা তাঁদের কবিতায় সেই হতাশাকেই রূপায়িত করে তুলেছিলেন। তখনকার অগ্রণী কবিরা— সমর সেন, বিষ্ণু দে বা জীবনানন্দের মধ্যে আমারা সেই হতাশা ক্লিষ্ট রূপকে দেখতে পাই। কখনো কখনো উত্তরণের স্বপ্ন যে তাঁরা দেখেন নি তা নয় কিন্তু সেই স্বপ্ন চকিত ও ক্ষণস্থায়ী। এই অবস্থার মধ্যে যখন পদাতিক প্রকাশিত হল দেখা গেল তার সুর সম্পূর্ণ ভিন্ন। ঐ কবিতায় রয়েছে ভবিষ্যতের সুন্দর সুস্থ জীবনকে, সাম্যবাদী জীবনকে ছিনিয়ে আনার দুরন্ত বাসনা। এক দৃপ্ত আশা। এই আশা বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে নতুন। অশ্রুকুমার সিকদার বলেছেন —

> 'এমন একটা মুক্ত-ও স্বাধীন অথচ সুবল সুর বাঙলা কবিতায় শোনা গেল যা অনেকদিন শোনা যায় নি। এমন রাজনৈতিক এক মতবাদ তাঁর কবিতার বিষয় যা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদকে মর্যাদা দেয় না,

যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ এতদিনকার রোমান্টিক গীতিকবিতার প্রেরণা। তাছাড়া সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রেমকে তাঁর কাব্যের প্রধান বিষয় বস্তুর সম্মান দিলেন না। বরং সানন্দে ঘোষণা করলেন 'প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য,' অনেকটা লেনিনের উদ্দেশ্য লেখা মায়াকোভস্কির কবিতার ধরনে, ' now's no time for a lover and his lass আর অন্য কবিরা যখন অবক্ষয় আঁকতে ব্যস্ত, তখন সুভাষ মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত আন্তরিকভাবে যুদ্ধের সঙ্গা পরবার আবেদন জানালেন। তাঁর মুখ ভবিষ্যতের দিকে ফেরানো। সবশেষে কবিতাবলীর মধ্যে এমন একটা কিশোরসুলভ অকুতোভয় উল্লাস আছে যা সংক্রামক। সুতরাং আবির্ভাবমাত্রেই এই কবির যে জয়জয়কার হবে এতো স্বাভাবিক। ৩

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাই প্রথম কোন রাজনৈতিক কর্মীর কবিতা। সুভাষ মুখোপাধ্যায় কেবলমাত্র রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন না তিনি ছিলেন পার্টির সক্রিয় কর্মী। তাঁর কবিতা রচনার পেছনে কমিউনিস্ট মতাদর্শকে প্রচার করার চিন্তাও কাজ করেছে। বিষ্ণু দে বা সমর সেন ও তাঁদের কবিতায় বামপন্থী কর্মকান্ডকে সমর্থন করেছেন কখনো কখনো কিন্তু তা উচ্চকণ্ঠ সরব ঘোষণা হয় নি। তাঁদের কবিতায় সমর্থন আছে প্রচার নেই। কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায় যেন কবিতার মধ্য দিয়েই রাজনৈতিক কর্মীর দায়িত্ব পালন করলেন। পার্টির ব্যান্ডার নীচে জড়ো করার কাজটা বক্তৃতার বদলে কবিতায় করলেন।

কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না ?
কুয়াশা কঠিন বাসর যে সম্মুখে।
লাল উল্কিতে পরস্পরকে চেনা --
দলে টানো হতবুদ্ধি শিশুকে, ৪

অথবা 'কানামাছির গান' কবিতায় বলেন —

কৃষক মজুর। তোমরা শরণ
জানি, আজ নেই অন্য গতি,
যে পথে আসবে লাল প্রত্যুষ
সেই পথে নাও আমাকে টেনে।

বিপ্লবের পর মানুষের জন্য, সেই সুস্থিরীর জন্য, এক সুন্দর জীবন অপেক্ষা করছে তাই বিপ্লব বরণীয় আর এই সাম্যবাদী জীবনের প্রতিবন্ধক যারা তারা মানুষের শত্রু-তা সে যে দেশেরই হোক না কেন। যেখানেই প্রতিরোধের সংগ্রাম গড়ে উঠুক কমিউনিস্ট কবি হিসাবে তিনি জয়গান করবেন, সংগ্রামে তাদের উদ্দীপিত করবেন। তাই করছেন তাঁর 'চীন' : ১৯৩৮' কবিতায় —

জোপকুপকে ঝরে ফুলঝুরি, জ্বলে হ্যাঙকাও
কমরেড, আজ বজ্রে কঠিন বন্ধুতা চাও
লাল নিশানের নিচে উল্লাসী মুক্তির ডাক
রাইফেল আজ শত্রুপাতের সম্মান পাক।

* * * *

প্রান্তিক লোভে পরজীবীদের নিষ্ঠুর চোখ
প্রাক পুরাণিক গুহাকে ডাকলো ক্ষুধার নখ
কমরেড, আশু অশ্রুর ক্ষুরে আনো লাল দিন
দম্পতি রাত তত্দিন হোক উৎসবহীন।

সমর সেনের কবিতায় আমরা এই সংগ্রাম বা এই আশা দেখিনা। তিনি কোন কোন সময়ে সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখেছেন। কিন্তু বাস্তবের রূঢ় আঘাতে তা ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু পদাতিকের কবিতায় এই স্বপ্নভঙ্গের কথা নেই। অবশ্য কমিউনিস্ট হিসাবে তিনি হতাশাগ্রস্ত হতেও পারেন না— তাহলে তাঁর রাজনৈতিক

সততাতে সন্দেহ দেখা দিত।

পদাতিক আরো একটি কারণে সেই সময়ের মানুষের মনে ঢেউ তুলেছিল তা হল কবিতার ছন্দ। গদ্যছন্দ নয় পদ্যছন্দেই তিনি খাঁটি তা ও নান্দিত্য আনলেন। আর তা রবীন্দ্রনাথের থেকে অবশ্যই আলাদা। বাঙালী পাঠক ছন্দ মিলের কবিতা পাঠেই সুস্থিবোধ করেন সেই দিক থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাদের কাছে বরণীয় হলেন। কারণ তখনকার কবিতায় ছন্দ মিলের অভাব পাঠকের অতৃপ্তির কারণ ছিল। অশ্রুকুমার সিকদার এ বিষয়ে বলেছেন —

> যে প্রগাঢ় রীতিবোধ ও ছন্দবোধের পরিচয় এই বয়সে সুভাষ মুখোপাধ্যায় দেখিয়েছিলেন তা সেদিন যেমন বুদ্ধদেব বসুকে বিস্মিত করেছিল, আজও তেমনি বিস্ময়ের বিষয়। [৫]

আগেই বলা হয়েছে আধুনিক কবিদের যে সাধারণ লক্ষণ হতাশা, ক্লান্তি বা নরর্থক জীবন ভাবনা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ে তা ছিল না। যদিও তিনি জীবনের রুক্ষতা, সংগ্রামকে বিকট করবার হীন মানুষী ষড়যন্ত্র, যুদ্ধে নিষ্ঠুরতা, অভাব, দারিদ্র সবই দেখেছেন। কিন্তু তাঁর চোখে বড় হয়ে উঠেছে মানুষের প্রতিরোধের সংগ্রাম। এবং তিনি চেষ্টা করেছেন সেই সংগ্রামকে একটি ঠিকানায় পৌঁছে দিতে। সেই ঠিকানা কমিউনিস্ট আন্দোলন। তিনি যতখানি কবি ঠিক ততটাই কর্মী। তিনি নিজেই বলেছেন —

> মানবতা আর দেশাত্মবোধ থেকে রাজনীতি মোটেই দূরগত নয়। কাঙালী দরজায় এসে ভিক্ষে দিয়ে তাকে বিদায় করলাম। কেউ সেই মন-কাঁদাকে রাজনীতি বলবে না। কিন্তু তাতেই যদি দরদ থাকে, শুধু তাকে চোখের সামনে থেকে তখনকার মত বিদায় করেই

ক্লান্ত হব না। দারিদ্রকে বিদায় করার পথ দেখতে হবে। তখনই চলে আসবে রাজনীতির কথা এবং তাকে কাজে ফোটাবার জন্য দল বাঁধার কথা। দরদটাকে মুখের বদলে বুকের মধ্যে এবং তাৎক্ষণিকের বদলে বরাবরের করে নেবার কাব্যটাই হবে রাজনীতি। এ রাজনীতির সত্তা আমার কবিতার সত্তা থেকে পৃথক নয়।[৬]

এই রাজনৈতিক মতকে পুষ্ট করার জন্যই তিনি কলমকে অস্ত্রের মত হাতে তুলে নিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য এই রাজনীতি অথবা যে কোন রাজনীতির জন্ম নগরে। গ্রামজীবনে আমরা সেই নীতির ফলিত রূপকে প্রত্যক্ষ করতে পারিমাত্র এবং তাও নগরের মত প্রত্যক্ষগোচর হয়ে ওঠে না। অন্ততঃ চারের দশক পর্যন্ত তা দেখা যায় নি। তাই রাজনৈতিক কর্মী যখন কবি হয়ে ওঠেন তখন তাঁর অন্তরগূঢ় নগরভাবনা স্বভাবতঃই কাজ করে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় শহরের মানুষ—কবি হিসাবে তিনি গ্রামে গেছেন সেখানকার জীবন, মানুষের দুঃখকষ্ট প্রত্যক্ষ করেছেন কিন্তু মূলতঃ তিনি শহর জীবনের সুখ কষ্টে আন্দোলনে বেশী স্পন্দিত হয়েছেন। রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে তিনি শহরের যে রূপ দেখেছেন তা সমর সেন বা নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর দেখা থেকে আলাদা। মিছিলে মিটিংএ বা শ্লোগানে উদ্দীপিত যে শহর তা অনেক সময়ই ধরা দিয়েছে তাঁর কবিতায়। পদাতিকের 'দলভুক্ত' কবিতায় শহর কোলকাতার সেই রূপকে তিনি তুলে ধরেছেন ——

এখানে পার্কে সভা, লেনিন দিবস : লালপাগড়ি মোতায়েন,
আতঙ্কিত অন্তরাত্মা, ইস্টবেঙ্গল জপে রক্তকরু মাস্তোয়ারি,
নির্ভীক মিছিল শুধু পুরোভাগে পেতে চায় নির্ভুল গায়েন,

এরপরে অংশগুলিতে আছে ইতিহাসের শুকটবাদিতার কথা ধূর্ত অধ্যাপক গোয়েন্দা এবং ফিরিঙ্গি পাড়ার রঙ্গের কথা, আছে ধনতন্ত্রের নাভিশ্বাস ওঠার খবর —

এবং সবশেষে আবার মিটিং-এর খবর —

হাজরা পার্কে সভা কাল, নিরপেক্ষ থেকে আর চিত্তে নেই সুখ।'

প্রথম স্তবকের তিনটি পঙক্তিতে তিনি যে ছবি এঁকেছেন তাতে একটি সভা — মিছিল ইত্যাদির রূপ যেমন ফুটেছে তেমনি সেই মিটিং মিছিলের প্রতিক্রিয়ার ছবি ফুটেছে। এই সব কিছু নিয়েই স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

'আলাপ' কবিতাটি তিনটি স্তবকে বিভক্ত। প্রথম স্তবকে রয়েছে শহরের বসন্ত ঋতু কি রূপে আসে এবং কবির মনে তা কি প্রতিক্রিয়া ঘটায় তার কথা। কবিতায় তিনটি শীর্ষনাম ব্যবহৃত হয়েছে 'বার্ষিক', 'পঙক্তিগ্রন্থ' এবং পঞ্জিকাসূর্য। বার্ষিক অংশটি —

তবে কি নাছোড়বান্দা ফাল্গুন, কমরেড ?
বসন্ত বিস্মৃতি আঁটে ঘূর্ণিফল গাছে;
পর্দায় সর্দার হাওয়া কসরৎ দেখায়।
আকাশে অসংখ্য টর্চ, মেঘেরা ফেরার
গোলদীঘির গর্তে চাঁদ ধরা পড়ে গেছে।
বসন্ত সত্যিই আসবে? কী দরকার এসে?
বছর বছর দেখা দিয়েছে সে ক্যান্সেলের ভিড়ে।।

কবির কাছে ফাল্গুন নাছোড়বান্দা, মেঘমুক্ত আকাশের তারার ঔজ্জ্বল্য যেন টর্চের আলোর মত। চাঁদের প্রতিচ্ছায়া তিনি দেখেন গোলদীঘির গর্তে। এই বসন্ত কবির কাছে স্বাগত নয়— কারণ এই সময়ে ভীড় বাড়ে ক্যান্সের হাসপাতালে। প্রকৃতির বসন্ত নয় কবির মনে জাগে রোগ বসন্ত কথা। অনেকটা রবী-দ্রনাথের পুরাতন ভৃত্যের 'কোথা যা হন্ত। চির বসন্ত আমি বসন্তে মরি'র মত। যদিও সেখানে ব্যক্তিগত কষ্টের অনুভূতি— এখানে

সমষ্টির দুখে উদ্বেলিত কবি।

'প-ত্রয়' অংশে তিনি জানান খিদিরপুরের ডক অঞ্চলে তাঁর কাব্য খুঁজতে হয় 'গরু খোঁজা করে'— পেছনে লেগে থাকে সচরিত্র গুপ্তচর। তাই গভীর রাতে যখন কারো ডাকে সাড়া দেন তখনই তার হাত থেকে রেহাই পান। কাব্যকে গরু খোঁজা করা বা গুপ্তচরের বিশেষণ সচরিত্র এগুলি লক্ষ্যণীয়।

পরের অংশে জানান নেতাদের মধ্যে লেনিন, এঙ্গেলস, মার্কস কিন্তু তারা মহাত্মার অনুগামী-কারণ লক্ষ্য তাদের উচ্চ। বিধ্বস্ত চীন তাদের মনে প্রতিক্রিয়া জাগায় না, তারা জানেন অচিরে ভারতেও বিপ্লব আসবে। এই অংশটিতে তিনি সুবিধাবাদী নেতাদের বিদ্রূপ করেছেন।

এই কবিতার প্রথম অংশ থেকে বোঝা যায় প্রকৃতির বিষয়ে সুভাষবাবুর ভাবনা। তাঁর মনোরাজ্যে প্রকৃতির ভূমিকা নগন্য। সুভাষ বাবুর অন্যান্য বৈশিষ্টের মত এটিও একটি যে তিনি প্রকৃতি বিষয়ক কোনো কবিতা লেখেন। গদ্যময় পৃথিবী দেখে সম্ভবত: সেই বাসনা তাঁর মনে জাগে নি। কিন্তু সচরাচর কবিদের কবিতা রচনা আরম্ভ হয় প্রকৃতি বা প্রেমের কবিতা লিখে। এই বিষয়ে বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন

> সুভাষ মুখোপাধ্যায় বোধহয় প্রথম বাঙালী কবি যিনি প্রেমের কবিতা লিখে কাব্যজীবন আরম্ভ করলেন না। এমন কি, প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাও তিনি লিখলেন না, কোন অস্পষ্ট মধুর সৌরভও তার রচনায় নেই, যা সমর সেনেরও প্রথম কবিতাগুলিতে লক্ষ্যণীয় ছিল।৭

ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ফুল খেলবার বিলাস করা যে শোভা পায় না তা তিনি পদাতিকের প্রথম কবিতা 'সে দিনের কবিতা'তেই বলেছেন —

প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা,
চোখের আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য
কাটকাটা রোদে সেঁকে চামড়া।

দ্বিতীয় কবিতা 'সকলের গান' — এতেও তিনি আকাশের চাঁদের হাতছানিকে বুর্জোয়াদের মায়া বলেছেন আর এ ধরণের প্রজাপতি সন্ধানীদের জন্য তিনি যে ব্যবস্থা দিয়েছেন তা হল —

কুঁড়ো হয়ে যারা ফুলের মূর্ছা দেখে
পৌঁছয় না কি হাতুড়ি তাদের পিঠে?
কিংবা বনে পাঠিয়ো সে মহাত্মাকে
নিশ্চয়, নিঃসঙ্গ লাগবে মিঠে।

আমাদের থাক মিলিত অগ্রগতি,
একাকী চলতে চাই না এরোপ্লেনে,

কবিতাদুটির মধ্য দিয়ে কবির বিশেষ জীবনদৃষ্টি ফুটে উঠেছে। ব্যক্তি-গত সুবিধা নয় তিনি সমষ্টিবদ্ধ জীবনকেই ভালোবেসেছেন। লালউল্কি, হতবুদ্ধি শ্রিশঙ্কু, বুর্জোয়াদের মায়া, ফুলের মূর্ছা এরোপ্লেন ইত্যাদি শব্দ শাণিত বিদ্রূপ ও রাজনৈতিক মত বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন।

পদাতিকের 'বধূ' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের মানসী কাব্যের 'বধূ' কবিতার ব্যঙ্গরূপ বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ শুরু করেন এভাবে —

বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল
পুরানো সেই সুরে কেযেন ডাকে দূরে —
কোথা সে ছায়া সখী, কোথা সে জল।

সুভাষবাবু লিখলেন —

গলির মোড়ে বেলা যে পড়ে এলো
পুরানো সুর ফেরিওলার ডাকে,
দূরে বেতার বিছায় কোন মায়া
গ্যাসের আলো জ্বালা এ দিন শেষে।
কাছেই পথে, জলের কলে সখা
কলসি কাঁখে চলেছি মৃদু চালে
হঠাৎ গ্রাম হৃদয়ে দিল হানা
পড়ল মনে, খাসা জীবন সেথা—

শহুরে বধূটির মনে হল গ্রামের জীবন খাসা। সেখানে দীঘির কালো জলে মেলে কাৎলা মাছ অথবা অঙ্গে গেরুয়াবাস দিলে মিলতে পারে কানাকড়ি। শহরে সে সুবিধা নেই। এই বধূটিরও মনে হচ্ছে এই রাজধানী পাষাণকায়া। চোরাকারবারি ছাড়া লাভ নেই। এখানেও ছাদের ওপর চাঁদ ওঠে কিন্তু পাওনাদারের ভয়ে দরজার খিল দিতে হয়। এরই মাঝে যখন প্রিয়তমও সরে পড়ে তখন মনে হয় —

—লোকলোচন উঁকি মারে—
সবার মাঝে একেলা ফিরি আমি
লেকের কোনে মরণ যেন ভালো।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় গ্রামের মেয়েটিকে শহরে এনে তার দুঃখ দেখিয়েছিলেন। কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বধূ গ্রাম্য নয়— শহুরে। তিনি নিজের কাল ও দৃষ্টিভঙ্গী মত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই জীবনে এই বধূটির অসুবিধা, লাঞ্ছনা দেখে তারও মনে হয় মৃত্যুই শ্রেয়। কবিতার ভঙ্গীতে ব্রিদ্রূপ থাকলেও দুঃখটাও অনুভব করা যায়।

'আদর্শ,' 'নির্বাচনিক' 'অতঃপর' কবিতায় তিনি আপাত সুখ নিয়ে সুখী যে জীবন তাকে ব্যঙ্গ করেছেন। 'আদর্শ' কবিতায় বলছেন — কৃত্রিম হ্রদে পায়চারি করে, প্রকাশ্যে পরস্পরকে ছলনা করে মুখে কমিউনিস্ট সুলভ কথা আর কাজে অহিংস আন্দোলনের সমর্থন করে, সখের সাহিত্য পাঠের মধ্য দিয়ে এই সুখী জীবন কাটে। মজুর ধর্মঘট বা চেক চীনা সংকটের মত সার্বজনীন বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায় না এরা। এদের জীবনের আদর্শ নিজেকে সুখী করা। 'নির্বাচনিকে' বলছেন —

ফাল্গুন অথবা চৈত্রে বাতাসেরা দিক বদলাবে।
কথোপকথনে মুখ হবে দুটি পার্শ্ববর্তী সিঁড়ি
"অবশ্যকর্তব্য নীড়"। (মড়াকাটা ঘর — স্থানাভাবে?)

অবশ্যকর্তব্য নীড় কবির কাছে কি-তা বন্ধনীর ভেতরে অংশেই জানাচ্ছেন। স্বার্থপর এই ঘর জীবন্ত মানুষের নয়। কবিতাটিতে 'মসৃণ সূর্য মূর্ছা যাবে লেকে প্রত্যহ' এই চিত্রকল্প অথবা 'মন্দভাগ্য কার্সিনোমা রেস্তোরা' ইত্যাদি কথাগুলি লক্ষ্যণীয়।

'অতঃপর' কবিতাটি বঙ্কচন্দ্র পালের লেখা চিঠি পত্রিকার সম্পাদককে। তার কিছু ভূসম্পত্তি আছে তাই বুদ্ধিহীন যুবারা চাষীদের বক্তৃতায় মুগ্ধ করছে দেখে 'দুশ্চিন্তায় হাত পা হিম'। তবু যদি রাজ্যভার

নিজেদের হাতে আসে তবে 'চমৎকার কিবা'—'ধনীদেরতো পোয়াবারো'। কারণ ভারতবর্ষের একচেটিয়া নেতা গান্ধী — আর তিনি তাদেরই নেতা। জমিদারী যদি যায় তো যাক এখন বঙ্কচন্দ্র ব্যবসায়ী হবেন। তাই 'বণিকের মৌলিক প্রতিভা দেশী শিল্পে মুক্তি পাবে'— এই বিষয়ে যুক্তি চাই সংবাদপত্রে — এই হচ্ছে বঙ্কচন্দ্র পালের দাবী। কবিতাটির সর্বাঙ্গে তীব্র বিদ্রূপ। আরো লক্ষণীয় বঙ্কচন্দ্র পালের 'বিদ্যার্থী দুলাল শেখে নৈশবিদ্যা কলকাতায়। বোতলে আগ্রহ তার অবশ্য অগ্রিম'— ইত্যাদি পঙক্তি।

কবিতার বিষয়বস্তু নয় কোন একটি কথা বা পঙক্তির মধ্য দিয়ে কবি তাঁর পরিচয় মুদ্রিত করেছেন।

'রোমান্টিক' কবিতায় লিখছেন তিনি রোমান্টিক ভ্রমণবিলাসীর ভাবনা থেকে মুক্তি পেয়েছেন—'মনকে কাব্যের প্রতিপর্কে নিয়ে গিয়ে জনতার সাথে মিলেছেন। লিখছেন —

ভুলেছি জ্যোৎস্না হারিয়ে হরিৎ ধান্য
এখানে বন্দী আনা তিনেকের বাল্‌বে।

জ্যোৎস্না ভুলে যাওয়া, হরিৎ ধান্য হারানো অথবা অস্পষ্ট আলোয় বন্দী হওয়া-শহরের বন্দী মানুষের প্রতিচ্ছবি।

'পলাতক' কবিতায় 'চন্দ্রাহত যুবকের' দুর্ঘটনা ঘটে 'ট্রামের চাকার নিচে', নির্জন মাঠের চিৎকারে তিনি ছুঁড়ে দেন 'বিকালের মিছিলের গানে'। কিন্তু তবু তার কাছে —

শহর বিস্বাদ ঠেকে, ডাকি, 'বাউ বুমবুমির ছায়ায় এসো হে
প্রজাপতি পায় না কো এরোপ্লেনের শব্দ বাতাসের কানে'।

সকলের জন্য যে জীবন কবি খোঁজেন কোন দুর্বল মুহূর্তে তিনি যেন সেই জীবন থেকে পলাতক হয়ে যান। অদৃশ্য অথবা বিষাদের বিষে তাঁর জীবন কবিতা লিপ্ত হতে চায়। শূন্যতাকে প্রেম বলে ভুল করেন। শেষে দেখেন —

পশ্চিমের লাল মেঘ অন্ধ হয় পৃথিবীর আশ্চর্য ধাত্রীরে
হলুদ ঘাসের প্রান্তে ট্রামের নিষ্ফল দীর্ঘযান তারে।

কবিতায় ট্রামের চিত্রকল্প বারবার ফিরে আসছে এটা লক্ষণীয়।

'নারদের ডায়রি' কবিতায় 'ডায়মন্ড হারবার থেকে হাওড়া' আসছে কলকাতায়। স্থান যান দুটি উল্লেখযোগ্য।

'পদাতিক' কবিতায় তিনি দেখেন —

প্রতিদ্বন্দ্বী সব্যসাচী ডবলডেকারে
(চাক্ষুস আমার দেখা) ফাল্গুনী কবিরা
অর্ধেক চাঁদের মত কি করুণ চ্যাপ্টা হয়ে গেছে।

কবিদের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি বা ডবলডেকার কথাগুলি কবির মনো বৈশিষ্ট্য বোঝায়।

'এখানে' কবিতায় তিনি —

সেই নাগরিক ধূসর জীবন
পিছনে ফেলে
সব থেকে দ্রুতগামী ট্রেনে করে আজ

এসেছেন আসানসোলে। এখানে এসে দেখেন আকাশ আর পাহাড়ের মেশামেশি, দেখেন বিস্তৃত ধানের ক্ষেত। তারই মাঝে চিমনিরচূড়ে জাগিয়ে রাখে যান্ত্রিক

জীবনকে। উঁচু নীচু টিলা, দুইবালুতীরে বহু শীর্ণ নদী আবার নির্জন মাঠে রেলপথ। প্রকৃতির অবারিত সৌন্দর্যের মাঝে মানুষের যান্ত্রিক কীর্তি। তারই মধ্যে দেখেন —

তাড়িখানা খোলা, রাস্তায় খালি
লোকের মেলা।
স্ত্রীপুরুষ মেলে মুখোমুখি শুধু
মুখর ভাঁড়ে।

চিমনির ধোঁয়ায় যে নাগরিক জীবন প্রচ্ছন্ন ছিল তাড়িখানায় তার নগ্ন প্রকাশ। নগরায়নের হাত বহুদূর বিস্তৃত-প্রকৃতির নির্জনতাকে, সৌন্দর্যকে, এমন কী মানুষের রুচিবোধকেও তা অনায়াসে ধ্বংস করে। এসব দেখে কবির মনে হয় —

নগরের সেই নীড় ছেড়ে এসে
এখানে ভাবি,
সিনেমা ছায়ায় রাজধানীতেই
ছিলাম ভালো।

কথাকটির মধ্য দিয়ে কবির অন্তরের খবরটি মেলে। যত দূরেই তিনি যান না কেন এই রাজধানীই তাঁর নিজস্ব বাসভূমি।

:: তিন ::

১৯৪০-এ পদাতিক প্রকাশের পর দীর্ঘকাল সুভাষ মুখোপাধ্যায় আর কোন বই প্রকাশ করেন নি। ১৯৪৮-এ একটি কাব্যপুস্তিকা প্রকাশ হল 'অগ্নিকোণ' নামে। ১৯৪৯-কবি জেলে গেলেন। তখন পদাতিক-এর পরবর্তী ও অগ্নিকোণের পূর্ববর্তী সময়ে লেখা কিছু কবিতা ও অগ্নিকোণের কবিতাগুলি একত্র সংকলিত হল 'চিরকুট' নামে। 'চিরকুটের কবিতা ১৯৪০-৪৬-এর মধ্যবর্তী।

ঐ সময়ে ভারত এবং বহির্বিশ্বের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল সংকটজনক। এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায় শুধু রাজনৈতিক সচেতন কবিই নন, তাঁর কবিজীবনের দীর্ঘ সময় ধরে প্রত্যক্ষত: এবং প্রধানত: রাজনীতি অবলম্বন করেই কবিতা লিখেছেন, সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদে তাঁর বিশ্বাস ছিল। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যুক্ত ছিলেন। অন্যান্য কমিউনিস্ট কবিদের মত তিনিও বিশ্বাস করতেন তাঁর কবিতা লেখা রাজনৈতিক কর্মকান্ডের অন্তর্গত। প্রসঙ্গত বলা যায় পূর্ববর্তী কবি সমর সেন ও কমিউনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং এই দল ও মতের সঙ্গে তাঁর বৌদ্ধিক যোগাযোগ ছিল। কিন্তু তিনি কবিতাকে কবিতা হিসাবে দেখেছেন রাজনৈতিক মত প্রকাশের হাতিয়ার করে নয়।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম বই-এর সঙ্গে দ্বিতীয় বইটির প্রকাশের ব্যবধান বেশ দীর্ঘ। এই সময়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির চিন্তাধারায় এক প্রচন্ড পরিবর্তন এসেছিল। দেশ স্বাধীন হবার অব্যবহিত পরে কমিউনিস্টরা দেশের পরিচালকদের ওপরে আস্থা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেন এমনকী তাঁদের নেতৃত্বে প্রাপ্ত স্বাধীনতাও যথার্থ নয় বলে মনে করেন। ১৯৪৮ সালে কোলকাতায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় এবং এখানে বি.টি.রণদিভের

নেতৃত্বে স্থির হয় কৃষক সম্প্রদায়ের বিপ্লবী চরিত্রকে বাড়িয়ে তুলে সরকারের জনবিরোধী নীতিকে পর্যদুস্থ করতে হবে এবং গ্রামভিত্তিক জঙ্গী কৃষক নেতৃত্ব বিস্তারের দিকে পার্টির সর্ববিধ কর্মপ্রয়াস চালিত করা হবে।

সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও পার্টির এই চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটে। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত প্রতিষ্ঠিত গল্পকার বা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মত কবি পার্টির নতুন সাহিত্যনীতি অনুসরণ করে গল্প কবিতা লিখতে শুরু করেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় যে বিপ্লবী চেতনার পরিচয় আগের কাব্যগ্রন্থে ছিল তা এইখানে আরো জঙ্গী হয়ে ওঠে। সারা পৃথিবী জুড়ে তখন—সেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী পুঁজিবাদ বিরোধী গণ আন্দোলন বিস্তৃত হচ্ছিল,—সোভিয়েত, চীন, ভিয়েতনাম নতুন রাজনীতির পথনির্দেশ করছিল তাকে সরাসরি আমন্ত্রণ জানানো হতে থাকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায়। 'চিরকুট'-এর বহু কবিতায় এই ধরণের রাজনৈতিক অত্যুৎসাহ এবং ঔদ্ধত্য প্রতিফলিত। স্বভাবতই কবির নগরচেতনা এই কাব্যে প্রকাশিত কবিতাগুলিতে, একদিকে বিশ্বে পরিব্যাপ্ত অন্য দিকে বিপ্লবী আন্দোলনের দ্বারা গাঢ়ভাবে রঞ্জিত। গ্রাম ও শহরের ভেদ দেশ ও বিদেশের পার্থক্য এই রাজনৈতিক চেতনার সূত্রে মাঝে মাঝেই অবলুপ্ত। কিন্তু এই অবলেপের মধ্য দিয়েও নাগরিক বোধ, নাগরিক মন, নগরের জীবন, নগরের মানুষ প্রাধান্য পায়। তবু এই মানুষ একটু বিশেষ ধরণের মানুষ — মিছিলের মানুষ, এই মন একটি বিশেষ ধরণের আন্দোলনমুখী উত্তেজিত বদ্ধমুষ্টি মন— এদের উৎস যদি পল্লীতে হয়, কৃষক নরনারীর সমাবেশে ঘটে তবুও নগরের জনসমুদ্রে এর চরম পরিণতি। কারণ সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবগুলি তা কৃষিভিত্তিক যদি হয়ও শেষ পর্যন্ত নগরগুলির অধিকারের মধ্যেই চূড়ান্ত চরিতার্থতা লাভ করেছিল। গ্রামীণ মহাচীন জুড়ে যে লংমার্চ তার পরিণাম নানকিন, সাংহাই লুণ্ঠ করার মধ্যে। বরা কমলাপুর বা কাকদ্বীপের চাষীদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম কোলকাতার ময়দানের মোহনায় সমাকীর্ণ।

এইজন্যই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কমিউনিজমের সঙ্গে তাঁর নগরচেতনার কোন বিরোধ বাঁধে নি।

চিরকুটে-এর কবিতা লেখার সময়ে সুভাষবাবু পুরোপুরি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত। শ্রমিক আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন এইসবের সাথে যুক্ত হয়ে তাঁর অনুভূতির তীক্ষ্ণতা যেমন বেড়েছে তেমনি বেড়েছে দলের প্রতি আনুগত্য। সেই সময়ে পার্টির পত্রিকার কাজে তিনি বাংলাদেশের গ্রামে ঘুরেছেন, দেখেছেন মানুষের সীমাহীন দুঃখ কষ্ট। শহরের মানুষ হলেও এই দেখা তাঁকে ক্ষিপ্ত করেছে, স্পর্শকাতর করেছে। এর প্রভাব পরেছে তাঁর কবিতাতে। এই বৈশিষ্ট্য চিরকুটের কবিতায় আছে। আছে আনুগত্য, নিরপেক্ষকে দলে আনার চেষ্টা, বিপক্ষকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করার প্রবণতা, দুঃখভোগের সীমান্তে পৌঁছে রুখে দাঁড়ানোর চেষ্টা। যদিও 'চিরকুট' কাব্যগ্রন্থে তিনি বলেছেন —

সেদিনকার শাণিত ধার হারিয়েছি,
হৃদয়ে শুধু স্মৃতির ভার, ভিড় শুধু
বেড়াই ঘুরে পাড়ায় আপন খুশিমত।

কিন্তু তাহলেও চিরকুটের কবিতায়ও তীব্রতা ছিল। কিছু কবিতায় দুর্ভিক্ষ ও অনশনে গ্রামের মানুষের ক্ষোভকে তিনি যেভাবে প্রকাশ করেছেন তাতে মরিয়া মানুষের ছবি ফুটেছে স্পষ্ট। অতলস্পর্শী খাদের কিনারায় এসে প্রাণীমাত্রই চায় বাঁচার জন্যে শেষ লড়াইটি দিতে। সেই ছবি ফুটেছে 'চিরকুট' কবিতায়।

শতকোটি প্রণামান্তে
হুজুরে নিবেদন এই—
মাপ করবেন খাজনা এ-সন
ছিটেফোঁটাও ধান নেই।

এ দুর্দিনে পাওনা আদায়
বন্ধ রাখুন, মহারাজ
ভিটেতে হাত না দেয় যেন
পাইক বরকন্দাজ।

* * * * *

পেট জ্বলছে, ক্ষেত জ্বলছে
কে খাজনা শুধবে?
হজুর, এবার না বাঁচালে
আগুন জ্বলে উঠবে॥

দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের বাঁচার এই শেষ চেষ্টা সুভাষবাবু প্রত্যক্ষ করেছিলেন গ্রাম বাংলায় ঘোরার সময়। কবিতাটির আবেদনের তীব্রতা এসেছে প্রকাশভঙ্গীর বিশিষ্টতার জন্য। লক্ষণীয় এর ভঙ্গীতে গ্রামের সাধারণ মানুষের মুখের কথার ঢঙ টিও এনেছেন।

তা এলেও সুভাষবাবুর নাগরিক বৈশিষ্ট্য হারায় না। হারায় না বলেই সাধারণ চাষীর ক্ষোভ প্রকাশিত হয় হুমকিতে। এই হুমকির মধ্যে শহরের শিক্ষিত কৃষি বিপ্লবীদের সুর মিশে থাকে।

চিরকুটের কবিতাগুলি অনেক জায়গায় গ্রামের ছবি, সাধারণ মানুষের ছবি আছে। কিন্তু সেই গ্রাম আমাদের চিরদিনের চেনা গ্রাম নয় সুজলা সুফলা নিস্তরঙ্গ গ্রাম নয়। বরং এই গ্রাম বিসর্জন দিয়েছে তার সরসতা, সামনে তার সর্বনাশের বিরাট গহ্বর।

'গ্রামে' কবিতায় তিনি লিখেছেন গ্রামে কাজ নেই, খাদ্যের সংস্থানও নেই। তাই শ্রমে মানুষ শহরের দিকে চলেছে—

যেখানে ধাঁধার মত অলিগলি টানে জনতা,
কর্মখানির আশাতে হাঁটুর কাটে জড়তা,
যেখানে মিলের পাঁখুনি আকাশে হাত বাড়ায়—
সেখানে ফুরানো গরীব গ্রাম্যজনের কথা।

গ্রাম্য মানুষটি তার সব হারিয়েছে জমিজমা, খানা বাসন এমনকী আত্মীয় বন্ধুদেরও। একা বসে স্মৃতির জাবর কেটে চলে কারণ তার পালাবার পথও বন্ধ। প্রশ্ন জাগে কবিতার মানুষটি সত্যিই গ্রামের মানুষ কিনা। সব হারানোর দুখের রিক্ত প্রকাশ নেই, রয়েছে তীর্যক প্রকাশভঙ্গী-যা তৃতীয় ব্যক্তির পক্ষেই শোভা পায়। হয়তো কবির নাগরিক সত্তাই সবহারানোর দুখের সাথে এক হয়ে যাবার বাধা সৃষ্টি করেছে।

'এই আশ্বিনে' কবিতায় যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের মাঝে গ্রামকে দেখেছেন —

পথের দুদিকে বাসা
বেঁধেছে কঙ্কাল;
গ্রাম করে খাঁ খাঁ
শোকাচ্ছন্ন পড়ে থাকে
ভগ্নদূত শাঁখা।

যুদ্ধ মড়ক ও অত্যাচার পৃথিবীতে ঘনীভূত হলেও পৃথিবী প্রস্তুত তারমোকাবিলায়। দিকে দিকে জীবনের ঘোষণা আসন্ন মৃত্যুকে চ্যালেঞ্জ করে-তাই 'আশ্বিনের আশ্চর্য সকালে কবি দেখেন মৃত্যুর মাঝখানে 'আগত দিনের স্বপ্ন'। দেখেন —

যরাগাঙে কলোচ্ছ্বাসে
নেমে আসে অস্থির জোয়ার।
করাঘাতে খুলে যায়
জীবনের রুদ্ধ সিংহদ্বার।

এই স্বপ্ন ও জীবনের জয়গান যথার্থ কমিউনিস্টসুলভ।

'স্বাগত' কবিতায় তিনি লক্ষ্য করেছেন 'গ্রাম উঠে গিয়েছে শহরে' তাই ঘরগোনা শূন্য পড়ে আছে, তুলসীতলায় প্রদীপ নেই, উঠোন আগাছায় ভরা, ঢেঁকির শব্দ নেই, জলের ঘাটে ভিড় নেই, সন্ধেবেলায় শাঁখ বাজে না। তাঁতি, কলু, কুমোর, কামার বা দোকানী, যারা গ্রাম্যজীবনকে সচল রাখত তারা সবাই চলে গেছে শহরে। চণ্ডীমণ্ডপে ভিড় করেনা ষোড়লরা, চৌকিদারের হাঁক শোনা যায় না। কিন্তু এই সকল শূন্যতার মাঝেও মাঠে ফসল বেড়ে ওঠে আর সেই শব্দ শোনে দূর শহরে ভিড় করা গ্রাম্য আগন্তুকরা— ঘরে ফিরে চলে তারা মাটির টানে।

নদী করে সম্ভাষণ, পাখি করে গান
মাঠের সম্রাট দেখে মুগ্ধ নেত্রে
ধান আর ধান।

যে রিক্ততায় কবিতাটির আরম্ভ শেষ হয়েছে তার বিপরীতে-পরিপূর্ণতায়।

'স্বাক্ষর' কবিতায়ও রক্তাক্ত সময়ের মধ্যে ভিক্ষাপাত্র হাতে নেওয়া মানুষকে তিনি দেখেছেন প্রথমে। উদ্বাস্তু সংসারে 'বাৎসল্যস্নিগ্ধ প্রেম পরাভূত'— দেখেছেন শত্রুর দালালদের, যারা গোপনে লক্ষ মণ চাল আটকে রাখে, যাদের প্ররোচনায় দেশ পা বাড়ায় সর্বনাশের পথে। তা সত্ত্বেও তিনি জানেন প্রতিরোধ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মুক্তির নিশান উঠে আসবে।

জানি তবু জয়োদ্যত মুক্তির নিশান,
আন্দোলিত জনস্রোত প্রবল প্রতাপে
নিজের মুঠিতে আজ নিয়তিকে টানে।
সম্মিলিত হাত তুলে আনে
উন্মুক্ত আলোয় অন্ধ ঘরের ফসল।
দৃঢ়পণ প্রতিরোধে নিরন্নের ত্রাণে
ছুটে আসে সেবাপ্রাণ বাহু।
মাঠে মাঠে ক্লান্তি নেই, অসংখ্য লাঙল
নবান্নকে ডাকে।
যদিও সম্মুখে ঝড়
কণ্টকিত আসে বিপর্যয়
তবু জানি আমাদের জয়,
অমর প্রতিজ্ঞাপত্রে রাখি সেইদিনের স্বাক্ষর॥

এই কবিতাগুলিতে নিরন্ন গ্রামের কথা, উদ্বাস্তু হয়ে আসা মানুষের কথা আছে। আর কবিতার শেষে আছে প্রতিরোধে প্রতিজ্ঞায় সর্বস্বান্ত মানুষের উজ্জীবিত হয়ে ওঠার কথা। বস্তুতঃপক্ষে সংগঠনের কাজে কবি সেই সময়ে বাংলাদেশের গ্রামে গঞ্জে ঘুরে বেড়িয়েছেন— দেখেছেন সাধারণ মানুষের দুসহ অবস্থা। কিন্তু সেই অবস্থাকেই শেষ কথা বলে মেনে নিতে পারেন নি তিনি। আশা করেছেন সুন্দর সোনালী দিনের, শত্রুক বিনাশ করে যেদিন মানুষ জয়যুক্ত হয়ে উঠবে। বিশেষতঃ তিনি জানতেন চীন রাশিয়া ইত্যাদি সমাজতান্ত্রিক দেশের কথা, যেখানে শেষ অবধি মানুষ জয়ী হয়েছে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে। তাই সামগ্রিক কমিউনিস্টসুলভ দৃষ্টিভঙ্গীতে তিনি সেদিনকার দুঃখ-কষ্টকে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর গ্রাম দেখার দৃষ্টিতে তাঁর সেই শিক্ষা ছাপ ফেলেছে।

'জনযুদ্ধের গান', 'চীন,' 'স্টালিনগ্রাড,' 'অগ্নিকোণ,' 'রামরাম' ইত্যাদি কবিতায় রাশিয়া, চীন, শ্যামদেশ, তেলেঙ্গানা-র মানুষের যুদ্ধ প্রতিরোধ ইত্যাদির কথা লিখছেন।

কখনো আগ্রাসী জাপানের বিরুদ্ধে চীনের জনগনের দারুণ সংগ্রামকে বাহবা দিচ্ছেন— সেই প্রসঙ্গে ভাবী সমাজের কাছে আমাদের দায়বদ্ধতার কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। কখনো গ্রাম-নগর বন্দর জুড়ে চীনের যুদ্ধের কথা লিখেছেন। বিপ্লবীদের হাতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পরাজয়ের কথাও লিখেছেন। লিখেছেন ট্যাঙ্ক, কামান এইসব বিধ্বংসী যুদ্ধাস্ত্রের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের প্রাণ তুচ্ছ করে লড়াই করার কথা। আবার 'রামরাম' কবিতায় লিখেছেন স্বাধীন ভারতের সরকারের অত্যাচারের কথা। তেলেঙ্গানার মানুষের বিরুদ্ধে তারা সেইভাবেই অত্যাচার করেছে যা করত বিদেশী শক্তি। বোঝাতে চেয়েছেন এই স্বাধীনতা প্রকৃত স্বাধীনতা নয়, অত্যাচারীর জাত বদল ঘটেছে মাত্র।

'পনেরোই ফের আসবো,' 'ময়দানে চলো' কবিতা লেখা হয়েছে সেই সময়কার বামপন্থী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে। বন্দীমুক্তির দাবী নিয়ে বামপন্থী ছাত্রদের আন্দোলন পনেরোই ফের আসব কবিতা। আর ময়দানে চলো কবিতা অল-ইন্ডিয়া কর্মীদের আন্দোলন নিয়ে লেখা।

এইসব কবিতার মধ্য দিয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবি চেতনার অবস্থানটি সহজেই নিরূপণ করা যায়।

'অগ্নিকোণ অংশের দুটি কবিতায়(একটি কবিতার জন্য ' এবং 'মিছিলের মুখ') একটু স্বতন্ত্র সুর শোনা যায়। কবিতা দুটি থেকে কবির

রাজনৈতিক পরিচয় চিনে নিতে যদিও অসুবিধা হয় না– তবু এই দুটি কবিতার সুর এই কাব্যগ্রন্থের অন্য কবিতার মত নয়।

'একটি কবিতার জন্য' কবিতায় তিনি জানান কত বিচিত্র ভাবাবেগ, প্রকৃতির কী বিপুল বৈচিত্র একটি কবিতার জন্ম দেয়।

একটি কবিতা লেখা হবে। তার জন্যে
আগুনের নীল শিখার মতন আকাশ
রাগে রী-রী করে, সমুদ্রে ডানা ঝাড়ে
দুরন্ত ঝড়, ...

আকাশের ঝড়, সমুদ্রের উদ্দামতা, বিদ্যুতের ঝলকানিই যথেষ্ট নয় একটি কবিতা লেখার জন্য অনাগত দিনের ফতোয়া নিয়ে মৃত্যু ভয়কে জয় করে, গানে গানে আকাশ বাতাস মুখরিত করে মিছিল আসে ——

নখদর্পণে আঁকা
নতুন পৃথিবী, অজস্র সুখ, সীমাহীন ভালবাসা।
একটি কবিতা লেখা হয় তার জন্য ॥

কবিতা সৃষ্টির ঘটনা সামান্য নয়— এই যেন কবি বলতে চান কিন্তু তার জন্য যে চিত্রকল্প ব্যবহার করেন, যেভাবে মিছিলের গান এনে যেখান তা লক্ষণীয়।

'মিছিলের মুখ' কবিতাটিতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রেমকে প্রথম স্বীকৃতি দিয়েছেন একথা স্বীকার করেছেন অনেক সমালোচকই। এর আগে পর্যন্ত, প্রেম তাঁর কাছে বিলাস বলে মনে হত। অবশ্য চিরকুটের জন্য দুএকটি কবিতায় তিনি অন্য কবিতার প্রসঙ্গে প্রেমের স্বীকৃতি দিয়েছেন (সীমান্তে চিঠি,

কাব্যজিজ্ঞাসা)। তবে সেখানে প্রেম এসেছে রাজনৈতিক বক্তব্যের সূত্র ধরে। কিন্তু মিছিলের মুখ' কবিতায় প্রেম এসেছে রাজনৈতিক সচেতনতার সঙ্গে উজ্জ্বল হয়ে। কবি নিজে এই কবিতা প্রসঙ্গে বলেছেন —

> 'মিছিলের মুখ বলে আমার একটি কবিতা আছে, তাতে মিছিলে দেখা একটি মেয়ের কথা বলা হয়েছে। কবিতাটা আমি লিখেছিলাম প্রথমবার জেল থেকে বেরোবার পর। সেই সময় কলকাতায় একটা নেতিয়ে পড়া ভাব ছিল, তার আগে যে রাজনৈতিক উত্তাল তরঙ্গ, সেটা ছিলো না। এবং আমি শুধু নয়, আমরা অনেকেই তখন চাইছিলাম যে কলকাতায় আবার সেই মিছিলের জীবন ফিরে আসুক। আমার সেই চাওয়াটা আবার মিছিল হোক কলকাতায়, এই চাওয়াটা আমার 'মিছিলের মুখ' কবিতার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল।[৯]

কবিতাটি থেকে বিশুদ্ধ প্রেম ভালবাসা বা উজ্জীবনী শক্তিই নয়— কোলকাতার জীবনের জন্যে তিনি কী চান তাও জানা যায়।

পদাতিক কাব্যগ্রন্থে সুভাষ মুখোপাধ্যায় যে মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়েছিলেন তাতে আরো স্থির হয়েছেন চিরকুট পর্যায়ে এসে। এই স্থৈর্য তাঁর বাচনিক তীব্রতাকে কিঞ্চিৎ ভোঁতা করে দিয়েছে একথা সত্য। তবু বিদ্রূপের ছোঁয়া কখনো কখনো লক্ষ্য করা যায় —

১. স্বরাজে সেনামী মিলবে : প্রভুরা পেটায় ঢাক।
অধুনা সরস ঘুষ জিভে, অহো। বন্ধবাক।[১০]

২. মনে মনে উড়ডীন আকাশে বাসা বাঁধি,
কেবলি নিষ্ফল বাদ্য ছিদ্রময় ঢাকে
পুরানো অভ্যাসবশে চিরুনীর পঞ্চম টাকে, [১১]

৩. একটু তেল চাই কামানের চাকায়।
দিয়ে বহাল তবিয়াতে থাকলেন নিজাম
এখনবজ্রাতগুলোকে টিট করা দরকার– [১২]

আগেই বলা হয়েছে চিরকুট পর্যায়ে কবির বক্তব্যের মধ্যে সদর্থক ভাবনা এসেছে— কবির রাজনৈতিক মতবাদের সূত্র ধরেই তা এসেছে– আর সেই জন্যেই পদাতিক অংশের নাগরিক সুলভ তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ এখানে কমে এসেছে।

॥ চার ॥

'ফুল ফুটুক' কাব্যগ্রন্থটির প্রকাশ কাল ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দ। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই গ্রন্থটির বিষয়ে অধিকাংশ সমালোচকই উচ্ছ্বসিত। এখানে 'পদাতিক' 'চিরকুটের' উচ্চ ঘোষণা নেই কিন্তু তিনি মত ও পথে আরো স্থিতধী হয়েছেন। কবিতায় এসেছে কাব্যময়তা। সাহিত্য একাদেমির " invites you to Subhash Mukhopadhyay ------- [১৩] এই কাব্যটির সম্পর্কে বলা হয়েছে —

His next collection of poems, Phul Phutuk (Let the Flowers Bloom, 1957) is a definite twening point in his literary career. Words like 'procession','fire' 'drum' 'bullet', have come naturally as before but at the same time a call to the thunderstrom to be quiet may be heard, an appeal to his comrades not to break everything around may be listened to and the poets waiting for the Sandhyamani flower to bloom in the evening may be seen. What these poems lost in fire and militancy, they gained in sensitivity and humane appeal. ১৯

'পদাতিক' এবং চিরকুট-অগ্নিকোণের' কবির কবিতায় সমাজ পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধতা যত ছিল কাব্যের প্রতি তত নয়। অগ্নিকোণের 'একটি কবিতার জন্য' বা 'মিছিলের মুখ' কবিতার কথা মনে রেখেও তা বলা যায়। বস্তুতঃপক্ষে এই দুটি কবিতাতেও তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসের ধ্বনি বেশ স্ফুট। 'ফুল ফুটুক' পর্যায়েও কবি সেই বিশ্বাসের ভূমিতে আমূল প্রোথিত— কিন্তু তারজন্য তারস্বরের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তিনি এখন অনুভব করছেন 'শুধু ভাঙ্গা নয়— প্রয়োজন আছে সৃষ্টিরও-সেই সুরইকাব্যগ্রন্থে ধ্বনিত হয়েছে।

এই পর্যায়ে গ্রাম নিয়ে প্রত্যক্ষ কবিতা কমেছে। কিছু কবিতায় গ্রামের মানুষের জীবন সংগ্রামের কথা আছে। তবে তুলনামূলক ভাবে শহর, ফসল, এবং গ্রামের মানুষের শহরে আসার কথা আছে বেশী।

'অগ্নিকোণ' পর্যায়ের 'মিছিলের মুখ' কবিতাটি

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য কবিতা হিসাবে চিহ্নিত। কারণ এই কবিতার মিছিলের মুখ বার বার তাঁর কাব্যে ফিরে এসেছে। 'ফুল ফুটুক' গ্রন্থেরও বেশ কটি কবিতায় সেই মুখের কথা পাই— যা কবিকে উজ্জীবিত করে।

'জয়মণি স্থির হও' কবিতায় পৃথিবীর আদিম জন্ম বৃত্তান্তের মত কবি সীমাহীন শূন্যতায় ঘূর্ণ্যমান মনে হয় —

এক জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড
কলকাতার ভিড়াক্রান্ত পথ চেনে
সামনে এগিয়ে চলেছে

এই এগিয়ে যাওয়ার পেছনে আছে এক স্বপ্নের আলোড়ন তাঁকে ডেকেছে —'মিছিলের সেই মুখ'। কিন্তু তারপরেই সেই ছলনাময়ী মুখ হারিয়ে গেল। এখন —

এই পৃথিবীতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে,
দেখ,
আমি জটায় বাঁধছি
বেদনার আকাশগঙ্গা।।

তোমার মুখ' কবিতায়ও যে মুখে কবি উদ্বেলিত হন সেই মুখের ডাকে দুহাতে অন্ধকার সরিয়ে উদ্যত সঙ্গীন তুচ্ছ করে, বাঁধার দেয়াল ভেঙ্গে কবি আসছেন— আনছেন পৃথিবীতে 'দুরন্ত দুর্নিবার শান্তি'।

'নান টুকটুক দিন' কবিতায় সারাদিন যে মুখের সন্ধানে তিনি পথ হেঁটেছেন সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে দেখেন সে মুখ তাঁর প্রতীক্ষায়। এই মুখ তাঁর প্রেরণার আলো।

তুমি আলো, আমি আঁধারের আল বেয়ে
আনতে চলেছি
লাল টুকটুকে দিন॥

'সুন্দর' কবিতায়ও উজ্জীবিত মুখটি কখন সবচেয়ে সুন্দর তার খবর জানাচ্ছেন কবি। দমকা হাওয়ায় যখন একা একা আঁচল উড়ছিল তখন নয়, বিকেলের পড়ন্ত রোদে নয়, আকাশ উদ্ভাসিত করে হাসার সময়ও নয়।

যখন ভোঁ বাজতেই
মাথায় চটের ফোঁসো জড়ানো এক সমুদ্র
একটি করে ইস্তাহারের জন্যে
উত্তোলিত বাহুর তরঙ্গে তোমাকে ঢেকে দিলে
যখন তোমাকে আর দেখা গেল না—
তখনই
আশ্চর্য সুন্দর দেখাল তোমাকে॥

চারটি কবিতাতেই একটি মুখের কথা আছে – যে মুখ দেখে কবি প্রেরণা পান, উজ্জীবিত হন। এই মুখ মিছিলের। এই মুখই কোলকাতার পথে ঘাটে তাঁকে উদভ্রান্ত ঘোরায়। মিছিল কথাটি নগরের অনুষঙ্গে জড়ানো। তাছাড়া যে দৃঢ় শপথ আছে 'শান্তি' অথবা 'লাল টুকটুকে' দিন আনার তাও দীক্ষিত পার্টি কর্মীর। 'চটের ফোঁসো জড়ানো সমুদ্রও শিল্পাঞ্চলের ইঙ্গিত বহন করে।

'রাস্তার গল্প' আর 'দাঁড়ানো' কবিতা দুটিতে নির্বাচন প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে সরকারের প্রতি ব্যঙ্গ বিদ্রূপ রয়েছে।

রাস্তার মোড়ে লালবাতি জ্বেলে
শকুনেরা দেয় সঙ্কেত
জোড়া বদনকে দেয়ালে লটকে
ঠোঁট চেটে বলে
ভোট দে॥

এই বিদ্রূপের সাথে সাথে এও লক্ষণীয় রাস্তার মোড়ে লাল আলোর বিপদ সঙ্কেত। সহজেই ট্র্যাফিক আলোর সংকেতের কথা মনে জাগে। যারা ভোট চাইছে তারা পাঁচ বছরে দেশের জন্য কিছু করে নি দেশকে বিকিয়ে দিয়েছে অন্যের দরজায়। পিঠে ফোঁকার স্বাধীনতা ছাড়া সাধারণ মানুষের আর কিছু নেই। জমিতে রক্ত এদেরই পাইক-পেয়াদা— তাই খাদ্য মেলে না। শুধু তাই নয় মানুষের স্বাধীন মত পোষণেও এরা হস্তক্ষেপ করে।

যমদূত দেয় চৌকি।
সাবধান।
বাঁয়ে যাস কে ?
ভান চাস যদি ভোট দে
উঁড়ি দাসদের বাক্সে॥

'দাঁড়ানো' কবিতায়ও এই নির্বাচনে দাঁড়ানোকেই ব্যঙ্গ করেছেন। পাঁচ বছর পর পর রাজা যেন ভবিতব্য হাঁকেন— বুনো বর্বরদের সভ্য করার। আর তারই জন্যে —

লাগ লাগ করে নেগে যায়
এর ঢান ওর তরোয়ান
ভোট কুচনিরা কেড়ে নেয়
ঘুঁটে কুড়ুনির দেওয়ান।

ভোট, বক্তৃতা বা দেওয়াল-লিখন নির্বাচন প্রক্রিয়ার অঙ্গ— সারা দেশ জুড়েই চলে কিন্তু শহরেই-এর ব্যাপক বিস্তার।

এই কাব্যগ্রন্থের কিছু কবিতায় দলের প্রতি বিশ্বাস এবং সেই পথে চলার বিঘ্নের কথা রয়েছে। এই বাধা বিঘ্ন কখনো আসে বাইরে থেকে কখনো তা ভিতরের।

'বাঁয়ে চলো, বাঁয়ে' কবিতায় তিনি বাঁদিকের পথকে চলার জন্য চিহ্নিত করেছেন। এই পথেই আনা যাবে রক্তিম সকাল, আনা যাবে সুখ, হওয়া সম্ভব মাঠের অধীশ্বর।

'যেতেই হবে' কবিতায় মানুষের মিছিলে চলার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা ঘোষণা করছেন। যত বাঁধাই আসুক গ্রাম-নগর-বন্দরের বঞ্চিত আর শোষিত মানুষরা একসময় মিছিলে চলবেই।

'ডাইনে বাঁয়ে' কবিতায় বিপথগামীদের দলভুক্ত করতে গিয়ে অসুবিধায় পড়ছেন —

বাঁয়ে আনতে না আনতে দেখছি
একেবারে সাফ ডাইনে।

এখন 'বাদিকে চলা 'বে-আইনী'— তাই ময়দানে গেলেও দেখছেন পেছনে 'ফেউ' লাগছে।

'অগ্নিগর্ভ', 'একটি নড়াকু সংসার,' 'আগুনের ফুল,' 'বাসিমুখে,' 'এক অসহ্য রাত্রি' ইত্যাদি কবিতায় তিনি রাজনীতির কথাই বলেছেন তবে

পটভূমি পরিবর্তিত – এখানে গ্রাম বা গ্রাম থেকে শহরে আসা মানুষ অথবা শহরতলীর মানুষের সংগ্রামের কথা আসছে।

'অগ্নিগর্ভ'তে দেখা যায় পাড়ারলোকের চেষ্টায় ক্ষুধার দুরন্ত জ্বালায় গলায় দড়ি দিতে যাওয়া লোকটি বিরত হয়। এখানে গোটা দিন নয়— দিনের আধখানা জীবন। আর নিষেধের জ্বালাতেই একসময় বোঝে আর অন্ধকারে থাকা নয়— তাই বেরিয়ে পড়ে রাম-রহিমের দল।

'একটি নড়াক্ সংসার' কবিতায় শহরতলীর শিল্পাঞ্চলের একটি পরিবারের কথা বলেছেন। যেখানে একদিন উনুন জ্বলে নি, ভাতের হাঁড়ি দাড়িতে ঝুলছে। গোটা পরিবারের সাথে পোষা বেড়ালটিও উপবাসী। বাড়ির উপার্জনশীল মানুষটির আয় বন্ধ —

জেলা আপিস রিক্ত হস্ত
কলকাতা থেকে খালি হাতে ফিরে
দাওয়ার ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে
রেশানের ভাঁজ করা থলি।

সংসারটির সকলেই ব্যস্ত কিছু জোগাড় করার জন্য – শুধু আসন্নসম্ভবা বউটির অনাগত সন্তানটি চুপ করে আছে অনাগত দিনের মত। এই প্রতীক্ষা যেন কবিরও।

এই কবিতার সংসারটি যে কোন শিল্পাঞ্চলের ধর্মঘটী বা ছাঁটাই পরিবারের ছবি। যেখানে নেতারা নির্ভরশীল কোলকাতার ওপর- যখন সাহায্য আসা বন্ধ হয়,তখন সংগ্রামী মানুষগুলি আরো কঠিনতর সংগ্রামের আবর্তে পড়েন।

গ্রামের নিরন্ন মানুষের শহরে তাদের দাবী আদায়ের জন্য আসার কথা রয়েছে 'আগুনের ফুল' কবিতায় —

মাঠের কাদা-লাগা ফাটা পায়ে
শান বাঁধানো পাথরে
আগুনের ফুল তুলে
আমরা আসছি।

এক সময়ে এদের চোখে জল ছিল এখন আগুন— এরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ গ্রাম খালি করে এসেছে— খালি হাতে ফিরবে না। প্রতিজ্ঞায় দৃপ্ত মানুষগুলি শহরেই এসেছে তাদের দাবী আদায় করার ইচ্ছা নিয়ে।

'বাসিমুখে' কবিতায়ও ব্যঞ্জন হেঁড়িয়া গ্রামের কথা আছে— যেখানে রাস্তার আলোর বাল্ব চুরি গেছে, ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত, জোনাদের ছোট বউ পাড়ে 'ল্যাম্পো' রেখে বিশ নম্বর সুতো আছড়ায় আর ভাবে কাল উনুনে আঁচ পড়বে কিনা।

'আরও একটি দিন' কবিতায় আছে আশা। বৃষ্টি কাদায় নড়বড়ে দিনটা যখন কোনমতে চলে যাচ্ছে তখন বাড়ীর বউটি পুকুরে গা ধুয়ে উঠে আসতে আসতে বলে 'জলায় এবার ভাল ধান হবে'। এই আশাই তো মানুষের বেঁচে থাকার মন্ত্র!

'সালেমনের মা' কবিতায় বাবরালির মেয়ে সালেমন মিছিলের সঙ্গে এসেছে কোলকাতায় তার মাকে খুঁজতে। কিন্তু

এ কোলকাতা শহরে
অলিগলির গোলক ধাঁধায়
কোথায় লুকিয়ে তুমি
সালেমনের মা ?
বারবালির চোখের মত এলোমেলো
এ আকাশের নিচে কোথায়
বেঁধেছো ঘর তুমি,কোথায়
সালেমনের মা ?

আকালের দিনে সালেমনের মা-র মত অনেক মা প্রাণ বাঁচানোর দুরন্ত তাগিদে স্বামী-সন্তান ত্যাগ করে রুটি রুজির চেষ্টায় এসেছিল কোলকাতায়। তারপর এই বিশাল কোলকাতা শহর তার বাহু বাড়িয়ে এদের গ্রাস করে ফেলেছে। সালেমনরা তাদের হারানো মায়ের কোল ফিরে পাবে না, বৃথাই খুঁজে ফেরে।

সালেমনের মা, ব্যঞ্জনহেরিয়া গ্রাম বা চড়িয়ালের রাস্তা তাঁর কবিতায় এমন জীবন্ত হয়ে উঠে এসেছে যে সন্দেহ থাকে না এদের সাথে তিনি একসময় প্রত্যক্ষ পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তিনি তাদের একজন যে নন তাও বোঝা যায়।

'ফুল ফুটুক' কাব্যগ্রন্থের সব চাইতে বড় বৈশিষ্ট্য কবির আশাবাদ। তিনি এতদিন ধ্বংস আর বিপ্লবের কথা বলেছেন — এখন তিনি আর ধ্বংস নয়— সৃষ্টিও চান। বলেন 'ভেঙো না কো, শুধু ভাঙা নয়'। 'শুধু ভাঙা নয়' কবিতায় জানান— মানুষের ছোট ছোট সাধ আহ্লাদ নিয়েই গড়ে ওঠে জীবন সংসার— তাকে নষ্ট করতে নেই। রাত্রি আছে, আছে অন্ধকার মৃত্যুও আছে— তবুও মানুষের এই সৃষ্টি অন্ধকার অথবা মৃত্যুর চেয়ে বড়।

ভেঙো না কো শুধু ভাঙা নয়।
মন দাও আজ
এর চেয়ে আরও তাজা রঙে এঁকে
দেখ জুড়ে আরও ভালো এক ছবি
টাঙানোয়।
আস্ত একটা জীবনকে ঘরে আনা যাক্
একটুও যার ভাঙা নয়॥

'সন্ধ্যামণি' কবিতায় দু:সময়ের মাঝে তাঁর সুপ্রময় আশার কথা বলেছেন। যখন সামনে কি আছে দেখা যায় না, অন্ধকার আচ্ছন্ন করে আছে গোটা পথকে, কিন্তু তাই তো সব নয়— এই অন্ধকার সরলেই দেখা দেবে ফসলে ভরা মাঠ— সৃষ্টি আর প্রাণের আশ্বাস! যতক্ষণ এই অন্ধকার না কাটবে কবি তাঁর কাজ করে যাবেন —

আমিই বা বসে থাকি কেন ?
উঠোনে সন্ধ্যামণি ফুল ফুটিয়ে তুলবার
এই তো সময়॥

'এখন ভাবনা' কবিতায় কবি একটা অবলম্বন চান যার হাত ধরে তিনি তাঁর সুপ্ত ভালোবাসাগুলোকে একটা ঠিকানায় পৌঁছে দিতে পারবেন।

'ড্যাং ড্যাং করে' কবিতায় 'লজ্জাকে মাথার মণি করা' ছোট জীবনের কথা বলেছেন — যে জীবন গড়ে উঠেছে এই মহানগরীর ফুটপাথ আর ফুটপাথের গাছের তলায়। এই জটাধারী গাছটি কবির প্রিয়। এর বিশেষণ থেকে একটা ত্রিকালদর্শীতার ছাপ পাওয়া যায়। আবার রসহীন কঠিন কোলকাতার ফুটপাথের এই গাছের মধ্যে জীবন সংগ্রামের দুর্দান্ত ছবিটিও

হয়তো কবি দেখতে পান। গাছ-পালার বেঁচে থাকার এই কঠিন চেষ্টা কিন্তু গ্রামে দেখা যায় না। শহরেই এই লড়াইটা চোখে পড়ার মত।

ট্যাকে বাচ্চা নিয়ে
এ বাড়ি ও বাড়ি বাসন মাজে
রাত্তিরে গাছতলায় মাদুর বিছিয়ে শোয়'

বর্ণনায় ফুটপাথের জীবনটা প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। এদের বাচ্চারা 'শানের ওপর হামা'দিয়ে বড় হয়ে ওঠে। এরাও জীবনীশক্তি সংগ্রহ করে এই রসহীন জীবনের গভীর থেকে। তাই এরা বেড়ে উঠবে— একসময়ে মাথা তুলে দাঁড়াবে তাও কবি জানেন।

'ফুল ফুটুক না ফুটুক' এটি এই গ্রন্থের সবচেয়ে উজ্জ্বল কবিতা,সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বহু আলোচিত কবিতারও একটি। যে বসন্ত বা প্রজাপতিকে তিনি পদাতিকে বিদায় দিয়েছিলেন, বসন্তকে শুধু মাত্র ক্যান্সেলের হাসপাতালেই ভিড় করতে দেখতেন তিনিই বললেন —

ফুল ফুটুক না ফুটুক
আজ বসন্ত
শান বাঁধানো ফুটপাথে
পাথরে পা ডুবিয়ে এক কাঠখোট্টা গাছ
কচি কচি পাতায় পাঁজর ফাটিয়ে
হাসছে।

এই কবিতাটির প্রসঙ্গে শঙ্খ ঘোষ বলেছেন —

'বসন্ত'শব্দটি এই কবির রচনাকে এমন ভাবে তার নিজের ভিতর দিকে টেনে নিচ্ছে। পদাতিকের দিনগুলোতে মনে ছিল একরোখা যৌবন, গলায়

ছিল বাঁকা সুর, তাই এই ধরণের কথা : 'সদলে বসন্ত তাও পদত্যাগপত্র পাঠাবে না ?' অথবা 'বসন্ত সত্যিই আসবে ? কী দরকার এসে ?' কিন্তু অগ্নিকোণে এসে বিমুখ বসন্তের প্রয়োজন বোঝা গেল : 'পোড়া মাঠে মাঠে বসন্ত ওঠে জেগে।' এই ছবিতে লেগে থাকে নিশ্চিত সফলতার আশ্বাস, সমাজ বিপ্লবের স্বপ্ন পূর্ণ হবার দীপ্ত ভরসা। কিন্তু পোড়া মাঠে কি বসন্ত তার সমস্ত সম্ভার নিয়ে জেগে উঠতে পারে শেষ পর্যন্ত ? সন্দেহের কি কিছুই থাকে না, নেতির কোনো চিহ্ন ? তার উত্তরে জানতে পাই এখন, 'ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত।' নিরাশ্বাসের বস্তু-পরিবেশকে মেনে নিয়েও যখন তার থেকে মাথা তুলে দাঁড়াতে চাই, তখন স্পর্ধার সুরে বলতে পারি 'ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত'। তাই কবিতাটি লিখবার মাত্র দশ বছরের মধ্যে এখন এটি এক প্রবাদ প্রতিম লাইন। [১৪]

এই কবিতাটিতে কোলকাতার নগরজীবনের ছবিটি স্পষ্ট চোখে পড়ে। শান বাঁধানো ফুটপাথে যে গাছের জন্ম যে পাথরের গভীরে শিকড় চালিয়ে জীবনী রস শোষণ করে-তারই মধ্যে বসন্ত এনে পত্রসম্ভার নিয়ে দৃষ্টি-নন্দন হয়ে ওঠা সেই গাছটি নিঃসন্দেহে কোলকাতার।

> '..... ফুটপাথে যে সমস্ত গাছ বড় হয়ে ওঠে, যার চারদিকে শান বাঁধানো জমি, যেটা আমার জীবনে বারবার এমন একটা ছবি, এমন একটা প্রতীক হিসেবে দেখা দিয়েছে যা এখনও ভোলা যায় না। এবং সেই গাছে বিশেষ করে যখন নতুন পাতা দেখা দেয় ॥ তখন কলকাতার চেহারাটা অনেকটাই বদলে যায়। [১৫]

নিঃসন্দেহে বোঝা যাচ্ছে কবি এই গাছটিকে কোলকাতার পথ থেকে নিয়েছেন। তাছাড়া আলোকে কালো করা, জীবনকে মৃত্যু পরিকীর্ন করে তোলা যে সময় বয়ে গেছে তাও কোলকাতার ওপর দিয়ে। সেই সময়ের ডাকেই হারিয়ে

গেছে আর একটি মানুষ — হরবোলা ছেলেটি, যে দুপয়সা পেলে কোকিলের ডাক ডেকে ফিরিয়ে আনতে পারে নগর কোলকাতায় গ্রামের বাতাবরণকে।

গলির মোড়ে রেলিঙে বুক চেপে যে কালো কুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়েটি নানা ভাবনা ভাবছিল সে কোলকাতার — কিন্তু শুধুই কোলকাতার নয়— সারা বাংলাদেশের। এই আইবুড়ো কালো মেয়েটির কথা বলতে গিয়ে কবি বলেছেন —

> '.... আমি এমন একটা সময়ে এ কবিতাটি লিখেছিলাম যখন মোটের ওপর কলকাতার খুব একটা আশাভঙ্গের অবস্থা। নানারকম রাজনৈতিক কারণে মানুষের একটা দমবন্ধ ভাব।..... এর মধ্যে একটা যেমন বেদনা আছে, যেমন একটা কালো মেয়ের কথা আছে আইবুড়ো কালো মেয়ে, দেখতে ভালো নয়। এটা যারা বাংলাদেশে বড় হয়েছে, গ্রামে থেকেছে, মফস্বলে থেকেছে, তারা এ কালো মেয়ের যে বেদনা সেটা জানে। এবং তার গায়ে প্রজাপতি উড়ে এসে বসলে যে আশা জাগে এবং পরক্ষণেই সে আশা যে পূরণ হবে না একথা মনে পড়ে যাওয়ায় তার যে আশাভঙ্গ, এ সমস্ত কিছু আশা, আশা-ভঙ্গ, এবং তা সত্ত্বেও ফুল না ফুটলেও বসন্তের জেগে ওঠা— এটা কোনো ব্যক্তি-জীবনের নয়, হয়তো সেই সময়ের খানিকটা প্রতিচ্ছবি এ কবিতায় পড়েছিল। [১৬]

সময়ের দমচাপা অবস্থা বা দুর্ভাগা মেয়েদের বেদনা নিয়ে 'ফুল ফুটুক না ফুটুক' সুভাষবাবুর অন্য কবিতার চাইতে ব্যাতিক্রমী, অনেক নম্রভাষী তিনি এখানে।

'সহজিয়া' নামে যে কবিতাটি তাতে ভাড়াটে বাড়ি, ছাপোষা বংশ ইত্যাদি কথায় ভাড়াটে বাড়ির বাসিন্দাদের যে দৃষ্টিতে দেখা হয় তা পরিষ্কার হয়। ভাড়াটে বাড়ি নগরের অনুষঙ্গে জড়ানো। কবিতার মূল বক্তব্য অবশ্য দলের মধ্যে কৌলিন্য বিচারের প্রচেষ্টা। কিন্তু তা বোঝানোর জন্য যে চিত্রকল্প এনেছেন তা আমাদের চেনা।

॥ পাঁচ ॥

১৯৫৭ - ১৯৬৪ - এর মধ্যে দেশের রাজনীতিতে গুরুতর পটপরিবর্তন সূচিত হয়েছে। বিশেষত চীন-ভারত বিরোধ এবং ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে তীব্র মতভেদ এবং পার্টি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাওয়া' কমিউনিস্ট কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'যতদূরেই যাই' প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে। ১৯৬৪তে এই বইটির জন্য তিনি 'সাহিত্য একাডেমী' পুরস্কার পান। স্বাভাবিক ভাবেই গ্রন্থটির উৎকর্ষ বিষয়ে দ্বিমত নেই। পুরোনো দিনের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর শোনার আশা এখন আর তাঁর কবিতায় করা যায় না। কবিতায় এসেছে প্রত্যাশিত স্থিরতা। অবশ্য 'ফুল ফুটুক' পর্যায় থেকেই উচ্ছ্বাস কমে আসছে – এখানে এসে তা আরো ধীর। কিন্তু তাহলেও —

অবশ্য শোষণের স্বরূপ সম্পর্কে কবি সচেতন আছেন, তিনি জানেন, ধনবাদী শক্তিই আমাদের দেশটাকে নিয়ন্ত্রিত করছে, গদি আগলে যারা আছে, টাকার থলি তাদের উঠবস করাচ্ছে, এই বন্ধ থলির মুখগুলি তিনি জনসাধারণের জন্য খুলে দিতে চান, অর্থাৎ শোষণযন্ত্রকে তিনি বিলুপ্ত করতে চান। কিন্তু এই পরিবর্তন যারা ঘটাতে পারে, সেই শোষিত মানুষের তেমন মনোবল এখন আর কবির চোখে পড়ছে না, যারা আন্দোলনকে পরিচালিত করবে, তাদের মধ্যেও দূরদৃষ্টির অভাব তিনি দেখতে পাচ্ছেন। এজন্য একটা বিষাদবোধ কবিকে স্পর্শ করছে। [১৭]

কবি তাঁর লক্ষ্যে স্থির, চারপাশের অস্থিরতা, দ্বিধা দ্বন্দ্ব, হানাহানি তাঁকে আরো স্থিরতা দিয়েছে। তাছাড়া জীবনকে দেখার এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীও তিনি লাভ করেছেন। তাই এখানে কিছু কবিতায় প্রবহমান সময় বা জীবনকে রূপ দিয়েছেন, কখনো বা দুঃখকে হাসিমুখে মেনে নেবার কথা বলেছেন।

'যেতে যেতে' কবিতায় দেখি নদী বা সময়ের চলার কথা বলেছেন যা থেকেও নেই আবার না থেকেও আছে। কিন্তু মানুষতো এই গল্পে ভুলবে না। তাই রূপকথার ঢঙে বলেন 'আলো জ্বালা প্রকান্ড এক শহর'-এর কথা যেখানে বসে আছে এক রাজকন্যা — যে তাঁর আশা, তাঁর জীবন। তারপর- 'সেই রাজসি আমাকে খেলো।'

এই আশার কথা আবার বলেছেন 'পায়ে পায়ে' কবিতায়। সেখানে অপূর্ণ আশাকে নিয়ে খেলা করে 'বিষাদ' কিন্তু কবি তাকে স্থান দিতে চান না হৃদয়ে। কারণ তিনি জানেন মৃত্যু ভাবনা সত্ত্বেও এই সৃষ্টিশীল জগৎ

সুন্দর। তবে শেষ পর্যন্ত বিষাদকে ডেকে নেন জীবনে। এই কবিতা দুটিতে তিনি যেন জানান— আশা-নিরাশায় ভরা মানবজীবন থেকে তিনি দূরে নন।

শহর-শহরতলী

যতদূরে যাই গ্রন্থে গ্রাম সম্পর্কিত কবিতা নেই। এখানে তার নানা তুচ্ছ ঘটনার মধ্য দিয়ে ধরা দিয়েছে।

'পোড়া শহর' কবিতায় তেলচিটে সবুজ ঘাসে তিনি দেখতে পান আশ্বিনের অনন্তর্য সকালকে। শহরের রুক্ষতার মধ্যেও ক্ষুদ্র পরিবর্তনের এক সূক্ষ্ম স্পন্দন ধরা পড়ে। দেখতে পান 'বেলা দশটার ট্রাম' দাঁড়ানো মানুষগুলোকে বগলদাবা করে তুলে নেয়।' বুলতে বুলতে যাওয়া মানুষগুলির যে বর্ণনা দেন তাতে প্রতিদিনের দেখা ছবিটি অমরে ফুটে ওঠে—

কালো কালো মাথাগুলো অদৃশ্য পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে
যেন আত্মসমর্পনের এক ভঙ্গিতে
হাত উঁচু করে আছে।
কালো কালো মাথাগুলো
চোখে ফুটছে।

বেলা দশটায় অফিসযাত্রী মানুষের আশ্চর্য ছবি!

'কে জাগে' কবিতায় তিনি দেখেন —

এই শহর
তার প্রকাণ্ড মুঠোটা খুলে
দূরে দূরে
দূরে দূরে
আমাদের ছাড়িয়ে দিয়েছিল

তারপর সন্ধ্যে হলে আবার সকলকে জড়ো করল এক জায়গায়। সকলের কাজে ছড়িয়ে পড়া মানুষ আর সন্ধ্যেয় দলবেঁধে ঘরে ফেরা মানুষের যথাযথ ছবি ফুটে উঠেছে এই কবিতায়।

'রাস্তার লোক' কবিতায় শবদেহে ভরা দুঃস্বপ্নময় কোলকাতার স্মৃতি। লোকটি রাস্তার খোঁদলে জমে থাকা ট্রাম লাইনের মরচে পড়া জলকে রক্ত বলে ভুল করছে। রাস্তাকে তার মনে হচ্ছে —

মাথায় লাঠির বাড়ি খেয়ে পড়ে যাওয়া
পাঁয়ের হাড় জির জিরে বুড়োর মত।

এই স্মৃতির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য লোকটি মাথা উঁচু করে হাঁটে দেখতে চেষ্টা করে পুরোনো গির্জার ওপারের আশ্বিনের নীল আকাশ। সামনে পা ফেলে চমকে ওঠে —

ইস্, আরেকটু হলেই সে মাড়িয়ে দিয়েছিল
মায়ের কোল-ছেঁড়া
একটা দুধের বাচ্চাকে।

তারপর ভালো করে তাকিয়ে বুঝল আজ রাস্তায় কোন লাশ নেই। কিন্তু সেই স্মৃতি রয়েছে তার মনে। স্মৃতির হাত থেকে বাঁচার জন্য সে অলিগলিতে ঢোকে— দুহাতে কান চেপে ধরে। কিন্তু তার মনের মধ্যে জ্বলছে রাবণের চিতা— স্মৃতি তার পিছু ছাড়ে না। কবি যেন বলতে চান শহরের বুক পরিষ্কার করা যায় সরিয়ে ফেলা যায় মৃতদেহ কিন্তু মানুষের মন থেকে সেই সব পরিকীর্ণ শহরের স্মৃতি ঘোচার নয়।

'কেন এল না' কবিতায়ও রয়েছে সেই দুঃস্বপ্নের কথা কবিতাটি গল্পের মত করে বলা যেখানে পুজোর কেনাকাটার জন্য অধীর আনন্দে ছেলেটি বসে আছে বাবার আগমনের প্রতীক্ষায়। রাত হয় বাবা আসছে না। পড়তে বসলেও মন পড়ায় নেই। মায়ের রান্নাশেষ, গা ধোয়াও সারা।তিনিও ভাবেন মানুষটা কেন আসছে না। একসময়ে ছেলেটি আর ঘরে থাকতে না পেরে ছিটকিনি খুলে গলির মুখে দাঁড়ায়। সেখানে থেকে দেখতে পায় রাস্তায় ভিড়,কালো একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আর খুব বাজির শব্দ হচ্ছে। ছেলেটি দেখার জন্য পায়ে পায়ে এগিয়ে যায়। তারপর অনেক রাতে অনেক রাস্তা ঘুরে অনেক বিপদকে পাশ কাটিয়ে বাবা ঘরে ফেরে— ছেলেটি ফেরে না। কবিতাটি থেকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা-গুলি-গোলায় ভরা কোলকাতার স্মৃতি স্পষ্ট হয়।

'বারুদের মত' কবিতায় বিকেলের পর রাত ঘনিয়ে আসার বর্ণনা দিয়েছেন। এই বর্ণনায় কবির বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীটি লক্ষ্য করার মত। অস্তগামী সূর্যের রক্তিমাভাকে রক্তচক্ষু আকাশ বলায় তেমন বিশেষত্ব ফোটে না— কিন্তু যখন বলেন

পরাদ্দের এপারে দেখো
কয়েদীর জেরাকাটা পোশাকে
একটুকরো রোদ
মেঝেতে মাথা ঠেকিয়ে
হাঁটু মুড়ে
যেন মগরবের নামাজ পড়ছে।

তখন সেই বিশেষত্ব ফুটে ওঠে। জোনাকিকে উড়োজাহাজের আলোর সংকেতের মত মনে হওয়া বা রাস্তায় ভারি বুটের শব্দে ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া, অথবা অন্ধকারকে বারুদের মত মনে হওয়ার মধ্যেও সেই বিশেষত্ব রয়েছে।

'আলো থেকে অন্ধকারে' কবিতায় তিনি নগর জীবনের যন্ত্র বড় এক ফলকে তুলে ধরেছেন। ' এ শহরে' ধোয়া ওঠা রাস্তার আলোর নীচে পাউডার মেখে মেয়েরা এসে দাঁড়ায়। তারা তাদের লজ্জা-ভয় বা ভালোবাসাকে ঘুঁচিয়ে দিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে-তাদের রাত্রির শিকার রাস্তা থেকে ধরে নেবার জন্য। তারপর তারা ময়দানের অন্ধকারে মিশে যায়। সভ্যতা ভুলে গিয়ে খুলে দেয় নরকের দ্বার। তাদেরএই পরিস্থিতির কারণ 'পেটের ক্ষুধা'— তা জানাতে কবি ভোলেন না। তিনি দেখান শহরের আলোর নীচে যেমন ধোয়া ওঠা রাস্তাটি দাঁড়িয়ে থাকে তেমনি আমাদের সভ্যতার পাশেই আছে অসভ্য বর্বরতা।

'পা রাখার জায়গা' কবিতায় একটি অনুভূতির বর্ণনা। এ্যাকসিডেন্ট হতে হতে বেঁচে গিয়ে একটি লোক মনের বিপর্যস্থ অবস্থায় হঠাৎ বুঝতে পারল সে বেঁচে আছে—'সমস্ত শূন্যতা ভরিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে যে দুটো হাত'— তা তার সঙ্গেই রয়েছে— তখন সে আবার যেন নতুন করে বেঁচে উঠল। কবিতাটিতে ফুটপাথ, রাস্তার রেলিং, চায়ের দোকান, শো-কেসে বাহারি জিনিস সাজানো দোকান, ইত্যাদি নিয়ে ধীরে ধীরে যে ছবিটি গড়ে ওঠে তাই পূর্ণতা পায় — ছুটন্ত বাসের হাতল ধরে ঝোলা লোকটির বাজখাঁই কণ্ঠস্বরে —

হাতটা সরিয়ে নিন না, দাদাই।
ও দাদা, একটু এগিয়ে যান—
দয়া করে
স্যার একটু পা রাখার জায়গা॥

কবিতার পটভূমি পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

'ফলশ্রুতি' কবিতায় নগরের নিষ্ঠুরতার কথা বলা হয়েছে। মানুষ নিজের খুশীর জন্য, বিনোদনের জন্য বন্দী করে রাখে পশু-পাখীকে এদের কষ্ট না বুঝে তাতে আনন্দ পায়।

ফলের দোকানের সামনে বাঁধা থাকতো একটা হরিণ-সেও তার দৃষ্টিতে দেখত এই শহরকে। দেখত সকাল হলেই গলিগলি থেকে মানুষ বেরিয়ে হনহনিয়ে চলে যেত— নিশ্চয়ই শিকারে!

বাসগুলো ছেড়ে দিত হুমহাম শব্দে
তাদের বন্ধ খাঁচায় গররগরর করত
ছোট ছোট বাঘের বাচ্চা,
ট্রাকগুলো চলে গেলেই
তারের খেলা দেখাতে দেখাতে যেত
ছুরিতে শান দেবার একটানা হিস হিস শব্দ।

দোকানের সামনে দিয়ে যাওয়া আসার পথে লোকেরা থমকে দাঁড়িয়ে বলত 'বা : কী সুন্দর'। হরিণটা মুখ বিষ করে তাকাত। গলায় শিকল পরিয়ে এই শব্দ উচ্চারণ তার সহ্য হত না। মনে সন্দেহের বাষ্প ঘনাত —

শহর বসানো এই অরণ্যের ভেতরে ভেতরে
আসলে খুব হিংস্র একটা ব্যাপার চলছে
মানুষ মানুষকে আর
মানুষকে মানুষ এখানে শিকার করছে
কিন্তু রক্তের কোনো দাগ কোথাও রাখা হচ্ছে না।
'বা:, কী সুন্দর' বলে একটা দারুণ নিষ্ঠুরতাকে চাপা দেবার
চেষ্টা চলছে।

হরিণের মনে হয় এর চাইতে সুন্দর ছিল প্রাণ হাতে– করা অরণ্যের সৌন্দর্য। সেখানে অকপট জীবন। হিংস্রতাকে সুন্দর বলে সেখানে চালানো হয় না। ক্রমে সেই সন্দেহের বিষে হরিণের মুখে শহরের কেনা ঘাস জল রুচল না— অবশেষে একদিন গলার শেকল খুলে চার হাত পা শূন্যে তুলে শহরের বাইরে চলে গেল। কবিতাটিতে একই সঙ্গে শহরের যান্ত্রিকতা মানুষের প্রতি মানুষের হিংস্রতা ও স্বাধীনতা হীনতার বেদনাবিশ্ব রূপকে প্রকাশ করা হয়েছে।

'ছেই' কবিতায় শহর ধরা দিয়েছে ভাজা ইলিসের গন্ধে, পার্কে বেড়ানো বৃদ্ধদের মধ্যে বা মেড-ইন-লণ্ডন পাত্র কেনায়। রাস্তায় রজনী-গন্ধার হেঁকে যাওয়ায়রোয়াকের আড্ডায় দমকলের-পুরুতের মত ঘন্টা নেড়ে নেড়ে চলে যাওয়ার মধ্য দিয়ে ছবিটি স্পষ্ট হয়।

এই কাব্যগ্রন্থেও কিছু কবিতা আছে যাতে কবি তাঁর নিজের মনের প্রতি বিশ্বাসের কথা উচ্চারণ করছেন। আছে সমাজবাদী ও সংগ্রামশীল মানুষের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসার কথা। যেমন 'কে জাগে' কবিতায় কালের প্রহরী রূপ করেছেন খেটে খাওয়া মানুষকে 'আরো গভীরে' কবিতায় বলেছেন ঝড় এলেও যারা মাটির কাছের তারা শিকড় চালিয়ে দেবে আরো গভীরে–ঝড় চলে গেলে দেখা যাবে এরা মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

'ঘোড়ার চাল' কবিতায় বলেছেন ঘোড়াই খেলবে বাঘের মত। খেলা তাদের সারা পৃথিবীকে বান্ধি রেখে। শক্তি ও অস্ত্র যেভাবেই সাজানো হোক না কেন একদিন ঘোড়া হাতের মুঠোয় তুলে নেবে খেলাটাকে।

'গণনা' কবিতায় তিনি দেখতে পাচ্ছেন রক্তের মত লাল, আগুনের মত উদ্দীপ্ত বা নিশানের মুষ্টিবদ্ধ হাত —

যার পাঁপড়িতে ঢাকা
এক ভয়ঙ্কর সুন্দর কুটিল শপথ।

লাঠি গুলি গ্যাসে নিহত আহত বা নিখোঁজ হওয়া এর ভাগ্যলিপি কিন্তু তা হলেও হাত দৃঢ়বদ্ধ।

'রুট' কবিতায় বলছেন একবার হারলেই যুদ্ধ শেষ হয় না। লড়াই তো হারজিতের। বরং

এসো নিচু হয়ে ভরি
শূন্যে বারুদ
আশার নতুন খোলে।
বীরের হৃদয়
যেন লক্ষ্য না ভোলে।

আবার এক হও, দলছুটদের দলে টানো, নাম লেখাও—ময়দানে মিছিল কর।

'এখন যাব না' কবিতায় বলছেন এখন তিনি যাবেন না, পৃথিবী কামড়ে পড়ে থাকবেন— যতক্ষণ না

মানুষের কাজ স্বাস্থ্য খাদ্য শিক্ষা নিরাপত্তার
একটা ভাল ব্যবস্থা না হচ্ছে
ততক্ষণ
মৃত্যুর গলায় পা দিয়ে হলেও আমি বাঁচব।

'মেজাজ' কবিতায় তিনি আফ্রিকার সংগ্রামী মানুষের প্রতি আবেগপ্লুত। কবির এ কবিতার নায়িকা কালো ধিঙ্গী বউটি মাতৃত্বের সম্ভাবনায় নতুন করে বেঁচে

থাকার, প্রতিবাদ জানানোর জোর পায়। অথচ সেই একসময়ে মরার জন্য বিষ খেয়েছিল। আজ সে আশা করে তার সন্তান হবে তারই মত কালো, তার নাম সে দেবে 'আফ্রিকা'— কারণ 'কালো মানুষেরা কী কাণ্ডই না করছে সেখানে।'

এই কবিতাগুলি ছাড়া আরো দুএকটি কবিতা আছে যেখানে দলের বিভেদ ও বিভ্রান্তিকে রূপদান করেছেন। কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙে যাবার পর দলীয় কর্মীদের মধ্যে যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস ঘনিয়ে উঠেছিল সংবেদনশীল কবি তাতে দুঃখ পেয়েছেন।

'বোকা' বা 'দূর থেকে দেখো' কবিতায় কবি তাই বলতে চান স্বভাব পাল্টে নেবার কথা অথবা সহকর্মীদের দুঃখে দুঃখী না হয়ে দূরে থাকার কথা— এই অবস্থায় কবি দুঃখিত।

'মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ' নামে যে দীর্ঘ কবিতাটি আছে তাতে তিনি স্পষ্ট করেই হিসেবে মেলাতে বসেছেন। এ যেন কবির নিজের সঙ্গে বোঝা-পড়া। তিনি অনুভব করছেন কৃতকার্য না হলে কেউ মনে রাখে না। তাই গুছিয়ে নেবার নীতির দিকে ঝুঁকেছে মনুষ।

কিন্তু তা হলেও তিনি জানেন, ধ্বংসের চেয়ে সৃষ্টির, অন্ধকারের চেয়ে আলোর পাল্লাই ভারী হচ্ছে। ঘৃণার হাত মুচড়ে দিচ্ছে ভালবাসা। এও দেখছেন পৃথিবী আলো করে কালো মানুষের দেশ আফ্রিকায় স্বাধীনতা আসছে। আর

শুধু ভাঙা শিকলগুলো এক জায়গায় জুটে
এই দিনকে রাত করবার কড়ারে

ওনারে ফলার পাকাবার
ষড়যন্ত্র আঁটছে।

পৃথিবীর মানচিত্র পাল্টে যাচ্ছে, ভূগোল নতুন করে শিখতে হবে। ধনতন্ত্র বাঁচার পথ নেই— এবং সমাজতন্ত্র পৃথিবীর দখল নেবে। বাড়াবাড়ি শোনালেও এটাই হবে বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।

তিনি এও লক্ষ্য করছেন বাইরের পৃথিবীটা যখন অমন সুন্দর তখন আমাদের ঘর হয়ে আছে আগোছালো। এদেশের মানুষের দুঃখ কবিকে গভীর ভাবে বিদ্ধ করে। এদেশের ওস্তাদ কারিগর মিস্ত্রিকে পরের জমিতে লাঙল ঠেলতে হয়, এখানে কোথাও রুগীর অভাবে ডাক্তার মরছে, কোথাও বা ডাক্তারের অভাবে রুগী। অরণ্য কেটে মানুষ নগর বসাচ্ছে কিন্তু কবি খুশী হতে পারেন না, যখন দেখেন, সামর্থ থাকা সত্ত্বেও মানুষের কাজ নেই, পেটে ভাত নেই। এই অবস্থার সৃষ্টি করেছে যারা তারা হয়তো সহজে জায়গা ছেড়ে দেবে না— কিন্তু একদিন তাদের হটতে হবে। কবি এও জানেন যারা তাদের হটাবে তারা এখনো তৈরী হয় নি। তাদের তৈরী করতে হলে চাই সাহস, সত্যকথা বলার এবং ঘটনার যথাযথ ব্যাখ্যার। যে আগুন জ্বলেছিল তাকে নিভতে দিলে চলবে না বলে কবি মনে করেন।

সহযোদ্ধার প্রতি যে ভালোবাসা একদিন ছিল
আবার তাকে ফিরিয়ে আনো,
যে চক্রান্ত
ভেতর থেকে আমাদের কুরে কুরে খাচ্ছে
তাকে নখের ডগায় রেখে
পট করে একটা শব্দ তোলো
দরজা খুলে দাও,
লোকে ভেতরে আসুক।

মধুভাণ্ডে তুমি লেখো॥

এই কবিতায় কবির ব্যক্তিগত সততা, পার্টির প্রতি আনুগত্য, সহকর্মীর প্রতি ভালবাসা সবই প্রতিফলিত। কবির নাগরিক মনের পরিচয়ও তার থেকেই লাভ করা যায়।

আগেই বলা হয়েছে কাব্যগ্রন্থটিতে তিনি গ্রামগঞ্জের উল্লেখ করেন নি। এমন কি মিটিং মিছিল প্রসঙ্গেও সে কথা বা সেখানকার মানুষের উল্লেখ করা হয় নি।

॥ ছয় ॥

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পরের কাব্যগ্রন্থ 'কাল মধুমাস' প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬১-এ। জীবনদর্শন, দলের প্রতি আনুগত্য এইসব বিষয়ে আগের কাব্যগ্রন্থগুলির পুনরাবৃত্তি ঘটলেও দ্বন্দ্ব সংকুল মনটির আভাসও এখানে রয়েছে। চীন ভারত সীমান্ত যুদ্ধ এবং কমিউনিস্ট পার্টিতে বিভাজন কবির মনে বিরাট আলোড়ন তুলেছিল তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষত: পার্টি ভেঙে যাওয়ার ফলে দলীয় কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ অবিশ্বাস তাঁর কাছে বেশী বেদনাবহ হয়ে উঠেছিল। রাজনীতির এই উচকিত অবস্থায় তিনি তাঁর মত ও পথে সুস্থির আছেন একথা মাঝে মাঝেই দৃঢ় উচ্চারণে ঘোষণা করার প্রয়োজন মনে করেছেন। তবে তাঁর এই ঘোষণা অনেকসময় সন্দেহ

জাগায় যে বিশ্বাসের মূল ভূমিতে হয়তো কবির অগোচরেই ঘুণপোকা আক্রমণ করেছিল। অথবা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলতা থেকে মুক্তি পাবার জন্যই এত জোর গলায় বিশ্বাসের কথা বলেছেন। অবশ্য এও ঠিক তখনো পর্যন্ত তিনি তাঁর লক্ষ্যে স্থির থেকেছেন— সন্দেহের বাষ্প ঘণীভূত হলেও তা উড়িয়ে দেবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। এই চেষ্টাও কম প্রশংসনীয় নয়।

আটত্রিশটি কবিতা নিয়ে সংকলিত 'কাল মধুমাস' কাব্যগ্রন্থে একটি দীর্ঘ আত্মজীবনীমূলক কবিতা রয়েছে 'কাল মধুমাস' নামে। এই কবিতাটি আপাতভাবে বিশ্লিষ্ট মনে হলেও এতে এক গভীর আত্মরিকতার সুর রয়েছে। কবিতাটিতে কোন কোন স্থানে খণ্ড খণ্ড ভাবে গ্রামের চিত্র এসেছে —

যাই
গিয়ে দেখে আসি
কোথায় আকাশটা খুব বড়ো।
দেখে আসি পড়ো পড়ো,
কোথায় কখন কোন্ ধুঁটি।
যাই
গিয়ে দেখে আসি
কী বীজ বুনছে মাঠে চাষী।

অথবা,

যাই
কিছুক্ষণ গিয়ে বসি
যে পুকুরে মাছগুলো
জলের গভীরে দিচ্ছে ঘাই।

এই কথাগুলির মধ্য দিয়ে খুব শান্ত এক গ্রামের খণ্ডচিত্র চোখের সামনে ফুটে ওঠে।

কিন্তু এই ছোটখাট চিত্রগুলির জন্য কবিতাটি গ্রামের অনুষঙ্গে লেখা তা বলা যায় না। কবির স্মৃতিতে যখন যে চিত্র উঠেছে তিনি তারই রূপ দিয়েছেন। শহরের কথা, কোলকাতার কথা নওঁগা শহরের কথা একই সঙ্গে আছে। যখন বলেন, 'ঘমটে ঘমটে যাচ্ছে ট্রাম' তখন কোলকাতা শহর রূপ লাভ করে।সেই রূপ আরো স্পষ্ট হয় সন্তরের জনতার মিছিলে কবির চলা, কবির মানসিকতায় —

বিকেলে মিছিল থাকলে আজ
ছোকরাদের সঙ্গে যাব পান্না দিয়ে হেঁটে
সারিবদ্ধ দুটো হাত দোলাতে দোলাতে।
পরদিন পড়ে নেব, এই যুক্তি- এই
সভায় যা বলা হবে না শুনে সাফাতে
দল বেঁধে দোকানে চা খাব।

কবিতার পরের অংশে আছে নওঁগা শহরের বর্ণনা।

ওপরে টমটম যায় গুড় - গুড় - গুড় - গুড়
নিচে চাও যদি
হিজিবিজি হিজিবিজি
নদী নৌকা নদী নৌকা নদী।

এই রেলটি গাছে ঘেরা শহরটিকে ঠিক শহরের পর্যায়ে যেন ফেলা যায় না। এ যেন কোন স্বপ্ন দেখা জগৎ, যেখানে ঘন্টা দুলিয়ে হাতি যায়, দুনকি চালে চলে উট, ছুটে চলে রানার। যেখানে বেল জুঁই,

তুলসীমঞ্চ, হাস্নাহানায় বাড়ির স্নিগ্ধ পরিবেশটি গড়ে উঠেছে। সেই পরিবেশকেই পূর্ণতা দিয়েছে তিনটি হাঁস আর কোণে বাঁধা লক্ষ্মী গাই। সেই শহরে সার্কাস আসত, চড়কের আগে আসত বহুরূপী, কিন্তু খেলার জন্য আসত নামী-দামী প্লেয়ার। 'এস. ডি. ওর জামাই' এসে রেডিও শোনানোর হাস্যকর ব্যর্থ চেষ্টা করত। কবির বাড়ীতে 'খেতান চাষীরা' এসে ভিড় করত পাটা নিতে, তৃষ্ণার জল পেয়ে তারা আল্লার কাছে দোয়া মানত— এত সহজ সুন্দর ছিল সম্পর্ক। আবার স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ এসেও সেই শহরকে মাতিয়ে দিত। এই পর্যন্ত বর্ণনা থেকে মনে হয় কী লোভনীয় স্নিগ্ধজীবন। কিন্তু পৃথিবীর কোন কিছুই নিরবচ্ছিন্ন ভাল নয়— তাই বলেন বর্ন্যার্ড অঞ্চল থেকে আসা জমিদারের কথা, যার উচ্ছৃঙ্খল আমোদ আবিল করে জীবন যাত্রাকে। দেখা যায় গিন্নিমা ধাটে শুঠেন তার গৌরবর্ণ নীল করে। আবগারী দারোগা হয়েও কবির পিতা ঘুষ খাননি কিন্তু তবু তাঁকে আত্মহত্যার চেষ্টা করতে দেখা যায় মেয়ের বিয়ের দেনা পাওনার অপমানে। এইসব ভালো মন্দ মিশিয়ে একটি চিত্র এঁকেছেন একবিতায়। নওগাঁ শহরটি না গ্রাম না শহর এমন এক স্থান। তাই এই কবিতায় দুটো পরিবেশের ইমেজই ফুটে ওঠে।

'পার ঘাটের ছবি' কবিতায় ফেরিলঞ্চ, মাটি কাটার জাহাজ ধানের দর, ভাল হোটেল, চা-পান-বিড়ি, সবেদা কলা নিয়ে বসা গ্রাম গঞ্জের বাজারকে বর্ণনা করেছেন, ফেরিঘাটের ছবিটি স্পষ্ট হয়েছে এইসব পঙক্তিতে —

ঝোলানো ব্যাগ। পোঁটলা পুটলি। টিনের সুটকেসে
পড়ার বই,
সিঁদুর কৌটো
মেলায় তোলা ফটো,
গলার কণ্ঠী, পুরনো তাস,
কাঁথা এবং আদালতের নথি।

নাচতে নাচতে আসছে লক্ষ্ণ।
নাচতে নাচতে যাবে।

এই দুটো কবিতায় পুরোপুরি গ্রাম নয় তবু গ্রামের বা আধা গ্রামের একটা ছোঁয়া কবি দিয়েছেন।

'খোলা দরজার ফ্রেমে' কবিতায় পুরোপুরি শহরের চিত্র ধরা পড়েছে। একটা চায়ের দোকানে বসে কবি বাইরের চলমান জীবন, দোকানে বসা মানুষের মানসিকতা, ইত্যাদির ছবি দেখেছেন।

টেবিলের ওপর ফাটলধরা পাথরটায়
একবাকস দেশলাই
একরাশ ছাই
আর বিস্তর ধোঁয়াটে কথা

ফেলে ছড়িয়ে রেখে

তিনজন ছোকরা উঠে চলে গেল

এতক্ষণ রাস্তা আড়াল করে বসে ছিল ওরা এখন দরজার খোলা ফ্রেমে বাইরের ছবি ধরা পড়ল। তিনি দেখলেন ন্যাশপোস্টে ঝুলছে পুরনো বিজ্ঞপ্তির ছেঁড়া চাটাই, পাগড়ি বাঁধা একটি লোক গাড়িতে তুলে নিল 'রাস্তায় টহলদার একঠো বাঘিয়া মাল।' তার পেছনে পেছনে যেন,

মাথার ওপর নয় একটা লাঠি উঁচিয়ে
কোনো পো কাঁধে পো হয়ে
একটা ট্রাম

তার পেছন পেছন
তেড়ে গেলে
তারের গায়ে অনেকক্ষণ ধরে ঝুলে থাকল
একটা একটানা
ছি
ছি
শব্দ
- .. ..
একটা দোতলা বাস
একটু দাঁড়িয়ে
জানালায় একটা মিষ্টি মুখ দেখিয়ে নিয়ে চলে গেল

ল্যাম্পপোস্টের নিচে অনেকক্ষণ ধরে যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে সে পকেটমার না পুলিশ চেনা যাচ্ছে না। তারপরই আবার দরজাকে আড়াল করে যাত্র বয়সী লোক কটা লোক সামনে এসে বসল— আবার চা- সিগারেট তর্ক। কবিও অপেক্ষা করছেন এরাও দেশনাই-এর কথা তোলে কিনা দেখার জন্য।

দেশনাই-এর বাকসটি সম্ভবত: রূপক হিসাবে এসেছে কিন্তু ট্রাম দোতলা বাস, ল্যাম্পপোস্ট সাদা পোষাকের পুলিস ইত্যাদি নিয়ে কোলকাতা শহর ধরা দিয়েছে। বিশেষত: ট্রামের বর্ণনাটি একেবারে যথাযথ।

'কুকুর - ইঁদুর- মাছি- ফুলের গাছ' কবিতায়-চেনে বাঁধা কুকুর, বারান্দার সারবন্দী ফুলের টব, ইলেকট্রিক পাখে বিঁ বিঁ নাগা ফ্ল্যাটবাড়ি থেকে আশ্বিনের কাল মেঘ কোথায় রোদ আর বৃষ্টিতে নিজেকে দ্বিভাগ করেছে তা দেখতে যেতে চান। এ যেন শহর ছেড়ে প্রকৃতির সান্নিধ্যে যাবার বাসনা।

'সকালের ভাবনা' কবিতায় দুধের গাড়ি, সকালের প্রথম ট্রাম আর চলন্ত সাইকেল থেকে ছুঁড়ে দেওয়া খবরের কাগজে কোনকাতার সকালের রূপ ফুটে ওঠে।

'এদিকে' কবিতায়ও রয়েছে কুমোরটুলি আর তার পাশের গলি যেখানে 'সুশীলা, ফুসিলা ' রা দাঁড়িয়ে থাকে তার কথা।

'কালো বেড়াল' কবিতায় ট্রাম থেকে দেখতে পান পুকুরে হুমড়ি খেয়ে পড়া মাছ ধরা দেখার দৃশ্য। শোকেসের জানালায় নিজের ছবি, মনুমেন্টর নিচে দেখেন সভার বদলে 'দাঁত তোলার আগে বক্তৃতা দিচ্ছে ডাক্তার দেখানেওয়ালা এক হেকিম'। গলিতে মিছিলের বদলে, মনুষ রেশনের লাইনে দাঁড়িয়ে-হাতের মুঠো খুলে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে খনি।

'আশ্চর্য কলম' কবিতা লেখা হয়েছে ট্রেনের হকারের বলার ভঙ্গীতে। নতুন ফর্মুলায় আবিষ্কৃত খলিফা চাঁদের আশ্চর্য কলম 'খাই-খাই' দিয়ে চোর-জোচ্চর, লম্পট, খাজা খোজা, পণ্ডিত-মূর্খ সকলেই চোখ বুজে লেখক হতে পারবে।

রাঘব বোয়াল থেকে চুনোপুঁটি
হরেক সাইজের পাওয়া যায়,
দাম উত্তম মধ্যম হিসেবে।
সঙ্গে বিনামূল্যে চুন এবং কালি।

এ লাইনে
যদি কোনো ভদ্রলোকের আবশ্যক হয়
বলবেন।

'বন্ধু' কবিতায় চাঁদনিতে মুড়িমুড়কির মত টর্চ বিক্রি হবার খবর আছে। আছে জলের পাশ থেকে হরেক রকম শব্দ ওঠার কথা।

'ধড়ির দাগ' কবিতার রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে' একে ওকে তাকে হাত দেখানো ট্রাফিক পুলিস বা ফুটপাথে ধড়িপেতে বসে গণৎকারের হাত দেখা শহরের রাস্তার চোখে পড়ে।

'হানুম' কবিতায় রয়েছে রাত্তিরের শো দেখে ফেরা সচরিত্র দর্শকদের কথা। আছে বজবজের ভেন, বাটার জুতো ঘাড়ে নিয়ে রাত দশটায় মালগাড়ি যাবার শব্দ। আর আছে চিড়িয়াখানার বাঘের কথা, যারা গাঁক গাঁক ডেকে 'শহরটাকে চলকে দিল'।

এই কাব্যগ্রন্থের কিছু কবিতায় . . দেশের প্রতি কবির ভালবাসার কথা আছে, কিছু কবিতায় দেশকে নষ্ট করছে যে শাসক শক্তি তার প্রতি ব্যঙ্গ, বিভক্ত মনের কর্মীদের অবস্থা ও মনের প্রতি ভালবাসার কথা আছে কিছু কবিতায়।

দেশের প্রতি কবির গভীর ভালবাসার কথা ধরা পড়েছে 'জননী জন্মভূমি' 'ভুলে যাব না,' 'এই ভূমি' প্রভৃতি কবিতায়। জননী জন্মভূমি কবিতায় তিনি বলেছেন, —

আমি যা কিছুই স্পর্শ করি
যেখানেই,
হে জননী,
তুমি।

আমার হৃদয় বীণা
তোমারই হাতে বাজে।

জন্মভূমি কে জননী বলা নয় কবির মনোভঙ্গীর বিশিষ্টতা ধরা পড়ে যেখানে তিনি বলেন যে বিদেশী শক্তি স্বদেশের মাটিতে হাত বাড়িয়েছে তাকে শাস্তি দেবার কথা। চীন ভারত সীমান্ত যুদ্ধ এই কবিতার পরিপ্রেক্ষিত হিসাবে কাজ করছে।

ভুলে যাব না কবিতায়ও বিদেশীর হাতে কয়েদনী দেশ জননীর কথা আছে। নানা বড় ঝঞ্ঝার পরও সেই দুখের স্মৃতি মনে জাগে।

এই জমি কবিতায় তিনি কারো মুখের কথায় বিশ্বাস করতে রাজী নন— অন্য কেউ করুক তাও চান না। জিঘাংসা, যুদ্ধ বা মৃত্যুর যত রমনীয় নামই দেওয়া হোক তিনি তাতে ভুলবেন না। তিনি জানেন —

আসমুদ্র হিমাচল
আমার বিশ্বাসের জমি।
আমাকে কথায় ভুলিয়ে
সে জমি কেউ কেড়ে নিতে পারবে না॥

কমিউনিস্ট পার্টি ভিন্ন হওয়ার ফলে দলীয় কর্মীদের মধ্যে যে অবিশ্বাস, সেই বেদনা থেকে লেখা 'হাত বাড়ালে' 'বন্ধু' 'সকালের ভাবনা' কবিতায়। ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী মানুষ একসময়ে কবির মনে প্রেরণা জাগাত— সেই প্রেরণা নষ্ট হলেও তার স্মৃতি তিনি ভোলেন নি, এও আশা করেন যে আবার সব কিছুর পরিবর্তন হবে।

ছিন্নভিন্ন সময়ের বেদনা আছে 'হাত বাড়ানো' কবিতায়। সঠিক রাস্তা, যথাযথ উত্তর এই অন্ধকারে খুঁজে পাওয়া যায় না—

কোন দিকে ? কোথায় তুমি যাবে ?
মোড়ে মোড়ে
অন্ধকারে ধরে আছে জন
সারি সারি প্রশ্ন চিহ্ন—

অবস্থা এমন যে কে কাকে উত্তর দেবে বোঝা যায় না। সভার বিরুদ্ধে পাল্টা সভা তৈরী হচ্ছে, শত্রু হচ্ছে তারাই যারা একসময়ে বন্ধু ছিল। এখনো পিছনে তাকালে মনে হবে সেই মধুর স্মৃতির কথা। এখন রক্তাক্ত নিষ্ঠুর সময়ে পৃথিবী যেন রসাতলের দিকে ছুটে চলেছে। অথচ সামনে একটু হাত বাড়ানো, একটু বুঝে নিলে পরস্পরকে, পাওয়া যায় বন্ধুর হাত —

যদি একবার বোঝা তুমি
খু খু দিয়ে জোড়া যায় না,
জুড়তে হয় ভগ্ন মনোরথ
এ আগুনে,
এই রাং ঝনে।

'বন্ধু' কবিতায় বলেছেন পাশ দিয়ে যারা হেঁটে যাচ্ছে আজ তাদের অচেনা লাগে। এ সময়ে কেউ কাঁধে হাত রাখলে, আলো ধরে রাস্তা দেখানেও বিশ্বাস জাগে না কারণ এখন এই দুঃসময়ে অপরিচিতি বা অন্ধকারকেই মানুষ বন্ধু বলে ভুল করছে।

সকালের ভাবনা-য় তিনি যেভাবে দিনটাকে পেতে চান তা পান না।

হাত মুঠো করছি
আর ধুনছি।
মুঠো করছি
আর ধুনছি।
যে দিনটাকে আমি চাই
কিছুতেই মিলছে না।।

এই মিছিল এই রাস্তায়' 'লাল পোশাকের জন্য ''ফোঁটা''আমার কাজ' কবিতায় দল দেশ এবং সহকর্মী বন্ধুদের জন্য কবির ভালবাসা ও বিশ্বাসের কথা আছে। এই মিছিল এই রাস্তায় কবিতাতে তিনি ভুল পথে ঘুরে বেড়ানো মানুষকে একটি মিছিলে এক পতাকার নিচে সমবেত হতে বলেছেন। লাল পোশাকের জন্য কবিতায় তাঁর প্রিয় রঙ লাল, প্রিয় ফুল লাল পোলাশ— সংগ্রামের এই চিহ্নকে ভালবেসে লড়াই কবির। এখানো পৃথিবীর ফত পুরুষ নি, পৃথিবী সরে আসে নি সর্বনাশের কিনারা থেকে। এখন—

চষা মাটির মতো এবড়ো খেবড়ো সময়,
চলতে কষ্ট হলেও
জানি তার গর্ভে ছড়ানো আছে বীজ।

এই বীজ থেকে ফসল করার জন্যই লড়াই চালাতে হবে। ফোঁটা-কবিতায় ভাই-এর প্রতি গভীর ভালবাসার কথা বলেছেন— ভাই ফোঁটার ম শ্লোকের মত করে। যাই ঘটুক যত ঝগড়া হোক ভাই যদি নাকি- ঝাঁটা মারে তবু কবি চান যমের দুয়ারে কাঁটা দিয়ে সেই ভাই বেঁচে থাকুক।

আমার কাজ কবিতায় তিনি তাঁর কথাকে পায়ের ওপর দাঁড় করাতে চেয়েছেন। চোখ ফোটাতে চেয়েছেন মানুষের। কবি নয় তিনি কর্মী হতে চেয়েছেন। চেয়েছেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অন্যায় লড়াই করতে।

আমি যেন আমার কলমটা
ট্রাকটরের পাশে
নামিয়ে রেখে বলতে পারি—
এই আমার ছুটি
তাই আমাকে একটু আগুন দাও॥

ট্রাকটর আর কলম দুইই সমার্থক কারণ দুটোই আধুনিক জীবন ও মনন তৈরীর কাজে লাগে।

'ছিন্নতর,' 'হে-হে আলির ছড়া', 'খড়ির দাগ' কবিতায় শাসক দলের প্রতি কবির ব্যঙ্গ আছে।

ছিন্নতরে-এ আছে আধুনিক কালের নতুন মন্ত্র —

ওঁ হ্রীং স্বাহা ওয়াপান ফট।
যে বেটা নজর দিবি সে বেটা হট॥

ভেলকি লাগিয়ে যারা হুকুমতের আশ্চর্য খেলা দেখায় তাদের কথাই এখানে বলেছেন।

'হেঁ হে আলি ছড়ায় মহাকুম সদরের নানা কাণ্ডের কথা আছে, আছে ভালবাসাকে বাঁধে খাওয়ার কথা। আর খড়ির দাগ কবিতায় তিনি কর্তা ব্যক্তিদের জন্মদিনে দিতে চান সেই খেলনা যা দিলে মারলে পরে রুনঝুন শব্দ ওঠে।

'তোমাকে বলি নি,' 'শূন্য নয়,' 'কাছে দূরে' কবিতায় ব্যক্তিগত অনুভব এবং শাশ্বত ভাবনার কথা আছে।

তোমাকে বলি নি তে একান্ত অনুভব; শূন্য নয়— এ ভুল ভ্রান্তি অন্ধকার এবং আলো নিয়ে গড়া জীবন ভাবনা; আর কাছে দূরেও ভালবাসার আশ্চর্য অনুভব।

থাকতে দেখি নি চেয়ে একপটে
তার সে মুখছবি
দেখি আকাশের প্রচ্ছদপটে
ছাপা সে মুখছবি
নেমে গেল এফুণি
ট্রেন খালি করে ডোরের শেফালি
নেমে গেল এফুনি॥

এই কবিতাটির প্রসঙ্গে অলোক রায় বলেছেন —

'বধূ কবিতায় যার সূচনা, 'কাছে দূরে' কবিতায় তারই পরিণতি। রাবীন্দ্রিক ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে তাকে অতিক্রম করার এর চেয়ে ভাল দৃষ্টান্ত আর মনে পড়ছে না।— ১৬

কাল মধুমাস কাব্যগ্রন্থে কবির ব্যঙ্গ বিদ্রূপ প্রধান যে মনটি প্রথম দিকের কাব্যগ্রন্থে ছিল তা প্রায় নেই বরং আবেগপ্রবণ কবিতা বেশী আছে। দেশের জন্য এক গভীর ভালবাসাও তিনি দেখিয়েছেন। গ্রামের কথা প্রায় নেই-ই বলা চলে। নগর জীবনের কিছু চিত্রকল্প এবং ভাবনা ধরা পড়েছে।

॥ সাত ॥

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'এই ভাই' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৭১-এ মোট একচল্লিশটি কবিতা এতে আছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজন যে রাজনৈতিক পরিবর্তন এনেছিল এবং তার ফলে পার্টি কর্মীদের মধ্যে যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছিল তাতে সুভাষবাবুর বিশ্বাসের মাটিতে চিড় ধরেছিল। এতদিন তিনি যে আদর্শের জন্য লড়াই করেছেন সেই আদর্শই যেন নষ্ট হতে বসেছে বলে তাঁর মনে হয়েছে। তার ওপর সত্তর-একাত্তর সালে নকশাল আন্দোলন কবিকে আরো টাল-মাটাল অবস্থায় এনে ফেলেছিল। মারামারি হানাহানির সেই বাতাবরণ তাঁকে আরো দ্বিধান্বিত করেছে। রাজনৈতিক ঘটনার টানাপোড়েন শহরের মানুষের ওপর বেশী ছাপ ফেলে। যদিও নকশাল আন্দোলনের ক্ষেত্রে গ্রামই ছিল লড়াই-এর ময়দান কিন্তু নীতি প্রবক্তরা শহরের, আর নীতির দিক থেকে ত্রুটি বিচ্যুতি থাকার ফলে যখন পারস্পরিক ঘাত প্রতিঘাত শুরু হল তখন যুদ্ধ গ্রাম থেকে ক্রমে শহরে চলে এল। শহরের মানুষ তার বিচার প্রবণ মন নিয়ে সমস্ত ঘটনার বিশ্লেষণ করেছে। সুভাষবাবু নাগরিক বুদ্ধিজীবী তাই তাঁর কাছে এই সব ঘটনা আরো বড় হয়ে ধরা দিয়েছে। তাঁর কবিতার সুরে পরিবর্তন এনেছে। এই ভাই-এর কবিতাগুলিতে সেই পরিবর্তন অনায়াস ভাবেই ধরা পড়েছে। তিনি ক্রমশঃ আন্দোলন থেকে মিছিল মিটিং থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছেন তবে তাঁর মূল বিশ্বাস এখনো যে অব্যাহত তাও জানিয়েছেন তিনি।

'পূর্বপক্ষ' এবং 'উত্তরপক্ষ' কবিতায় দুটিতে তিনি পুরোনো দিনের সঙ্গে নতুন দিনের মানুষের ভাবগত পার্থক্য দেখিয়েছেন। পূর্বপক্ষে নিরাপদ শান্তি ছিল কাম্য কিন্তু উত্তরপক্ষের কাছে তা নয়— উত্তরপক্ষ —

বাঁধা রাস্তায় পেটোর পর পেটো চমকাতে চমকাতে
আমরা হাঁক দিই।

এই বর্ণনা ৭০-৭১-এর কলকাতার সাথে মিলে যায়। পাত্র-পাত্রীদের মানসিকতাও লক্ষণীয়। এরা কারো সামনে হাত জোড়ো করে না, হাঁটু মুড়ে বসতে রাজী নয়, দুনিয়াকে পা দেখিয়ে এরা চলে। এরা প্যান্টের পা সরু করে সেজন্যই। শত্রুর চোখকে ফাঁকি দেবার জন্য ফুল লতা পাতা আঁকা ফৌজী জামা পরে। ভালবাসা এদের সয় না। কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া বলতে এদের ভদ্রতায় বাঁধে না। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়েই এরা উত্তর পায়।

'বাস্তবন্দী কবিতায় কবি যে আশাবাদী এখনো তা বলেন। এখনো রাস্তায় কিছু হলে তিনি বাইরে এসে দাঁড়ান, খবর নেন মিছিলের। কিন্তু তারপরই আবার যখন দেখেন সব চুপচাপ তিনি মনে মনে গুমড়ে ওঠেন।

যখন সিনেমাভাঙা যাত্রীদের ট্যাকে গুঁজে
রাত্রের শেষ ট্রাম
ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে গুমটিতে ফেরে—

ময়দানের খুব কাছে থেকে
বন্দী বাঘ খাঁচার মধ্যে ডেকে ওঠে॥

নিরুদ্বেগ মানুষদের দেখে কবিও অন্তরে গর্জন করেন কিন্তু তিনিও বন্দী এই চিড়িয়াখানায়। এখানে সিনেমা ফেরত যাত্রীদের নিয়ে ট্রামটির গুমটিতে ফেরা লক্ষণীয়।

'ছাই' কবিতাটি বাসে পাশে বসা তরুণ সহযাত্রীর জানালা বন্ধ করার প্রচেষ্টা দেখে লেখা। ছবিটি নিখুঁত শহুরে মানুষের। বৃষ্টি এলেই জানালা বন্ধ করার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ওঠে, বাসের জংধরা জানালা ঘটাঙ্ঘট শব্দে নামানোর চেষ্টার সাথে পাশের যাত্রীর দিকে সাহায্যের আশায় তাকানো, বন্ধ জানালার শার্শিতে বৃষ্টির ছাট লাগার দৃশ্য, সবই যথাযথ ভাবে এঁকেছেন।

'সুখে থাকো' কবিতায় রোদে জ্বলা জি.টি রোডের বর্ণনা আছে, আছে বিড়ির দোকানে বাজা আলী আকবরের সেতারের শব্দ যা বাসের ইঞ্জিনের শব্দে মাঝে মাঝে চাপা পড়ে যাচ্ছে, আছে চা শেষ করে ভাঁড়টি ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া ড্রাইভারের কথা, আর আছে বাসের বর্ণনা —

ভেতরে প্রচণ্ড ভিড়, বেঞ্চি। জুড়ে কেনো পো কাঁধে পো
অস্থিসার
মষ্ঠী মা-ঠাকরুণ।
এ কোণে বড়াই বুড়ি নিজে বাচছে মাথার উকুন।
পাশে এক ক্লেছ বসে
তাই
প্যাঁচার মতন মুখ করে ঠেলছে
নামাবলী গায়ে দেওয়া পুরুত মশাই।

এতেই শেষ নয়, আছে একনাগেড়ে লোকটি যে হাঁটুর ওপর ধুতি তুলে পাঁচ আঙুলে পাঁচটি আংটি পরে কোণে ট্রানজিস্টার রেডিও আর ছেলের ভাতের টোপর নিয়ে বসেছে, সঙ্গে আছে ন্যাংড়া আম কারণ বি.ডি-ও ভালবাসেন। তাছাড়া ছুটিতে বাড়ী যাওয়া কেরাণী আর নাইটের ছাত্রও আছে বাসটিতে। এতেই শেষ নয় ছবিটি সম্পূর্ণ হয় যখন বাসটি ছাড়ার মুখে

'সুখে থাকো' নেধা টিনের সুটকেসটি নিয়ে একটি অনবদ্য মুখ উঠে এল।

'তানকুনের গলি'তে হাতিবাগানের মিষ্টি আর নিউমার্কেটের শাড়ির কথা আছে।

'পুপের মার পলে'-এর মত হাল্কা চালের কবিতায়ও তিনি কলকাতা শহরের কথা না বলে পারেন নি—

পুপের মা কী করে
কলকেতা শহরে।
উঠে ভোরে
পল ধরে
কল পেতে।

পুরোনো দিনের সাথীদের জন্য, বর্তমান ছিন্নভিন্ন সময়ের জন্য, কবির বেদনাও কিছু কিছু কবিতায় ধরা আছে।

'পাখির চোখ' কবিতায় বলেছেন— সামনে গড্ডলিকা ধাচ্ছে ভাই বন্ধুদের মাথা— আর পেছনে যে আততায়ী সেও ভাই— এই দুঃসময়ে বিষাদ সরিয়ে লক্ষে স্থির হতে হবে।

'ভাবতে পারছি না' কবিতায় আছে সাপের দংশনের জ্বালার মত বিষাক্ত সময়ের কথা।

'কে যায়' কবিতায় তিনি আর একবার পুরোনো সময়ে ফিরে দেখতে চাইছেন অবস্থার পরিবর্তন। দেখছেন যা ছিল তার জায়গা বদলে গেছে।

কবি তা চিনতে পারছেন না। পর্দা ঢাকা জানালায় চেনা মুখ আর নজরে আসে না। বন্ধুদের ডাকতে গিয়েও ফিরে আসেন তাদের নাম মনে আসে না। পুরোনো দিনের ছবি সব পাল্টে গেছে—যেখানে কবিরাজ মশাই-এর ফরাস ঢাকা বিছানা ছিল আজ সেখানে —

তাঁর নাতিরা ধুনেছে
ঠিকাদারের কোতদুরস্ত আপিস

আর তার কত রকমের হাল্লাই
মুখোমুখি আয়না বসিয়ে
হাফ দরজায়
চুনহাঁটার সেলুন

গোয়ালঘরে ছাপাখানা
উঠোনে নেদ

হরিসভার কানে তালা ধরিয়ে
টাইপ শেখার ইস্কুল

ঘড়ি ঘড়ি বদলাচ্ছে হে দুনিয়া॥

সময়ের স্রোতে কত কী পাল্টে যাচ্ছে তাই যেন কবি দেখছেন।

'এই ভাই' কবিতাতে আছে দুঃসময়ের কথা— যখন মানুষ পাথরের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়েও অন্যকে মধে ধুঁয়েছে।

তাই যেন –'এক অস্থায়ী চিত্র' কবিতায় কবির মনে হচ্ছে সময়মত চলে যাওয়ার মধ্যেই আছে জীবনের সৌন্দর্য।

'এইও' কবিতায় দেখতে পান দলের ভিতরে দল পাকিয়ে গদি দখলের লড়াই; 'তাঁর ইচ্ছায়' কবিতায় তিনি বোঝেন নাচনেওয়ালারা প্রয়োজন মত মুরগির লড়াই করাবে আর প্রয়োজন ফুরালেই গলায় 'আড়াই পোঁচ'। 'ভেনখানার গল্প' কবিতায় পুরোনো দিনের কৃষক আন্দোলন করা সাথীর সাথে দেখা হওয়ার গল্পে গল্প বলেছেন পাঠককে। প্রথম দর্শনে দুজনের মনে জাগছে কত মধুর স্মৃতি, মরণপন লড়াই এর কথা কিন্তু যেই বর্তমানের খবরে দুজনে এলেন অমনি এক ভয়ে দুজন আতঙ্কিত। আজ তাঁরা ভিন্ন দলের সমর্থক। এতদিনের বন্ধুত্বের দরজায় কপাট পড়ে গেল —

সামনে দেওয়াল শুধু
লোহার গরাদে ধরে
বাইরে অন্ধকার।
চেয়ে দেখি আমরা আবার সেই পাশাপাশি সেলে

নিজেদের জানে বন্দী, নিজেদেরই তৈরী করা জেলে।।

'ভালো লাগছেনা' কবিতায় কবির ভাল না লাগার কারণ ভ্রাতৃঘাতী লড়াই, ভালো না লাগার কারণ —

এই জন্যে যে,
রাক্ষসদের হাড় একদিকে, মাস একদিকে করতে পারে
রক্তবীজের বংশধর যে মানুষ

থমকে দাঁড়িয়ে তারা দেখছে
রামলক্ষণের চুলোচুলি।
আমার ভালো লাগছে না
ভালো লাগছে না
ভালো লাগছে না—

যখন দেখছি
আমরা আমেরিকার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে
ভিয়েতনামকে ভাই বলছি॥

'দেখ মাস্টের,' 'শুধু আজ বলে নয়,' 'জলদি জলদি'— এই কবিতাগুলিতে তিনি শত্রুকে পরাস্থ করার কথা, হেসে খেলে সুস্থ ভাবে বাঁচার কথা এবং করণীয় কর্তব্য তাড়াতাড়ি সমাপন করার কথা বলেন। আবার 'ন্যাং' এবং 'ছুয়ো' কবিতা দুটিতে রয়েছে এক স্বতন্ত্র সুভাষ মুখোপাধ্যায় – যা এতদিনের চেনা সংগ্রামী কবি-সুভাবের সঙ্গে মেলে না। এ যেন সুবিধাবাদী ও সংগ্রাম বিমুখ এক মানুষের কথা। এ হয়তো কবির নাগরিক মানসিকতার বিকৃত পরিণতি। এতদিন সুভাবের তলে চাপা ছিল এখন অনুকূল পরিবেশে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে॥

॥ আট ॥

আমাদের আলোচনার সময় সীমা সাতের দশক পর্যন্ত। সেই হিসাবের মধ্যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্য গ্রন্থে কালমধু মাসেই তা

শেষ করা যেত। কিন্তু 'এই ভাই' বইটির প্রকাশকাল যদিও ১৯৭১ কিন্তু কবিতাগুলি লেখা হয়েছে তার আগে-আগের অধ্যায়ে সেই কবিতাগুলির আলোচনা করা হয়েছে। 'ছেলে গেছে বনে' যদিও ১৯৭২-এ প্রকাশিত তাই আলোচনা না করলেও চলে কিন্তু সংবেদনশীল কবির মানসিকতায় আমাদের আলোচ্য বিষয় নগর ও নগর মানসিকতা কি ভাবে কাজ করেছে তা দেখানোর উদ্দেশ্যে খুব সংক্ষেপে এই আলোচনা সংযোজিত হচ্ছে। মনে রাখা দরকার সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক দলের প্রতি সমর্থন, রাজনৈতিক কবিতা রচনা, রাজনৈতিক দলাদলীতে নিজেকে ওতোপ্রোত ভাবে জড়িয়ে ফেলা আবার দল ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়া সবই কবির নগর মানসিকতার ফল মাত্র। দেশের প্রতি সংগ্রামের প্রতি ভালবাসায় উচকিত হওয়া, কখনো আবেগ-নম্র সুরে গভীর অনুভূতির কথা বলা এগুলি শিক্ষিত কবি মানসিকতা থেকেই লাভ করেছিলেন। 'ছেলে গেছে বনে' বইটিতে আবার অন্য একটি মাত্রাও যুক্ত হয়েছে, আমাদের নিকট প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ তখন মুক্তি-যুদ্ধের জন্য মেতে উঠেছিল— স্বাধীনতা লাভের জন্য তাদের যুদ্ধ কবিকে অনুপ্রাণিত করেছিল। বইটির উৎসর্গ পত্রে তার সুকৃতি রয়েছে। শুধু তাই নয়—

> 'বাংলাদেশের মুক্তি-যুদ্ধ যখন কবির মনে নতুন আশার বাতি জ্বেলেছে তখন এখানে সেখানে ছড়িয়ে থাকা সাথীদের ফিরে পাবার জন্য গভীর অপেক্ষা ও আগ্রহ নিয়ে লেখা এই কবিতাগুলি।[১৯]

তবে বাংলাদেশের যুদ্ধে প্রাণ দেওয়া মানুষের কথাই নয় আমাদের এখানে সেই সময়কার হানাহানির রাজনীতিতে যেসব তাজা প্রাণ নষ্ট হয়েছে তাদের জন্যও কবির গভীর মর্মবেদনা ধরা পড়েছে।

এই কাব্যগ্রন্থের কিছু কবিতায় নগরজীবনের চিত্র ধরা পড়েছে কখনো ছোটখাট চিত্রকল্পে, কখনো বাঁধরাবাঁধা' কবিতায় গলি, রোয়াক বা রাস্তার বর্ণনা দিয়েছেন তা শহরের।

'কে বা কারা' কবিতায় মাথার ওপর তার কেটে নিয়ে দূর পাল্লার ট্রেনকে দাঁড় করিয়ে দেবার কথা বর্ণনা করেছেন। অনকুনি ছাড়িয়ে কিছু দূর আসতেই ট্রেনটি থেমে পড়েছে তারপর যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তা অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে কবি বর্ণনা করেছেন।

'নিয়ে যাব শহর দেখাতে' কবিতায় বলেছেন ক্যাম্পের ট্রেনিং শেষে তিনি শহর দেখাতে নিয়ে যাবেন যারা মুক্তিযুদ্ধে জীবনপণ করে লড়ছে। তাদের শহর দেখাবেন বলেই তিনি চাইছেন সব কুশ্রীতা, অশ্লীলতা দূর করে শহরকে ঢেলে সাজাতে।

'সময়ের জানে' কবিতায় কবির সকাল হয় খবরের কাগজে সন্ধ্যে হয় ময়দানের খেলা ভাঙলে আর সময় মেলান ঘড়ি দেখেন দিনে একবারই নটার ভোঁ বাজলে।

'বলির বাজনা' কবিতায় লাল বাতি, কালো গাড়ি আর হরিণ বাড়ির পাগলাঘন্টিতে শহর জীবন রূপায়িত হয়।

পদাতিক থেকে ছেনে গেছে স্মৃতি— এর মধ্যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যের [illegible] নানা পালাবদল চোখে পড়েছে। কখনো তিনি আবেগে উচ্ছ্বসিত, কখনো প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় কখনো লক্ষ্যে স্থির- সমাহিত, কখনো

উদভ্রান্ত, কখনো পথভ্রষ্ট। পদাতিকের উচ্ছ্বাস চিরকুটে-অগ্নিকোণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হয়েছে, ফুল ফুটুক এ তিনি স্থির, যতদূরেই যাই থেকে সংশয় এসেছে আর এই ভাই ও ছেলে গেছে বনেতে তিনি বিশ্বাসের মাটি থেকে সরে এসেছেন। সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মনের পরিবর্তন ঘটেছে। গ্রাম বাংলার কথা তাঁর প্রথম দিকের কাব্য গ্রন্থে এসেছে। কিন্তু যেভাবে এসেছে তা গ্রামের কবিসুলভ নয়। তিনি সংগঠনের কাজে ওখানে গেছেন তাই সেই দৃষ্টিভঙ্গীতেই তিনি মানুষকে দেখেছেন ও কবিতায় রূপায়িত করেছেন। কিন্তু নগর জীবন যেহেতু তাঁর মূল ভিত্তি ভূমি তাই সেই জীবন থেকে কখনোই সরে আসেন নি। শহরের রূপ সবসময়ই তাঁর চোখে ধরা পড়েছে নানা চিত্রকল্পের আকারে আর তাকে রূপদানও করেছেন॥

:: সূত্র নির্দেশ ::

১. Invites you to Subhash Mukhopadhyay : Sahitya Akademi, 12 August, 1989.

২. ফুল ফুটুক না ফুটুক' কবির সঙ্গে লেখার নুৎসে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কবিতার বোঝাপড়া।

৩. অশ্রুকুমার সিকদার : আধুনিক কবিতার দিগবলয় । সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা।

৪. সকালের গান : পদাতিক

৫. অশ্রুকুমার সিকদার : সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা।

৬. কবি মনন ও কাব্যচিন্তা প্রসঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায় :'অন্যমনে' শরৎ সংখ্যা ১৩৭৬।

৭. বুদ্ধদেব বসু: সুভাষ মুখোপাধ্যায়: পদাতিক।'কালের পুতুল'।

৮. কাব্যজিজ্ঞাসা : চিরকুট – সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

৯. ফুল ফুটুক না ফুটুক : কবির সঙ্গে লেখার নুৎসে।

১০. মুখবন্ধ : চিরকুট ।

১১. কাব্যজিজ্ঞাসা ।৩ : চিরকুট।

১২. রামরায় : অগ্নিকোণ।

১৩. Invites you to Subhash Mukhopadhyay : Sahitya Akademi.

১৪. শঙ্খ ঘোষ : ফুল ফুটুক না ফুটুক : সারস্বত, ১।৭, কার্তিক ১৩৭৫।

১৫. ফুল ফুটুক না ফুটুক : কবির সঙ্গে নোখার নৃৎসে।
১৬. মুক্তি ফুটুক না ফুটুক : কবির সঙ্গে নোখার নৃৎসে।
১৭. জনচেতনার কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় : অমিন মজুমদার :
সাহিত্য ও সংস্কৃতি : কার্তিক - পৌষ, ১৩৯৫।

১৮. সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য : অনোক রায় ।
সাহিত্য ও সংস্কৃতি: শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭৭।

১৯. জামিন শরাফী : কবিতা সংগ্রহ : সুভাষ মুখোপাধ্যায় । দেজ
দেজ পাবলিশার্স। গ্রন্থপরিচয় : ছেনে গেছে বনে ।

.....

॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥

:: নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ::

।। এক ।।

কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর জন্ম ১৩৩১ সালে বর্তমান বাংলা দেশের ফরিদপুর জেলায়। তাঁর শৈশব কেটেছে সেখানেই। পরে তিনি কোলকাতায় পড়তে আসেন। সেন্টপলস কলেজ থেকে ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে বি.এ পাশ করেন। শৈশবের বাংলাদেশ-এর কথা তিনি নানা প্রবন্ধে বলেছেন।

তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সময় ১৩৬১ বাংলা অর্থাৎ ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দ। অবশ্য কবিতাগুলি লেখা হয়েছে আরো ছয়-সাত বছর আগে থেকেই।

সেই সময়ে অর্থাৎ পাঁচের দশকে বাংলা কবিতার জগতে নানা কবি নানা ভঙ্গী নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। এর আগে, বলা যায় কল্লোল যুগ থেকেই কবিদের সজ্ঞান চেষ্টা ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের বিরোধিতা করা। ত্রিশের রবীন্দ্র অনুসরণ, উত্তরণ বা বর্জন ছাড়াও একটা ভিন্নসুর কাব্য রচনায় দেখা দিল। কল্লোল যুগে বুদ্ধদেব বসু 'বন্দীর বন্দনা' লিখেছিলেন একথা বলার জন্য যে অতীন্দ্রিয়তা নয় মানুষ বাঁধা আছে ইন্দ্রিয় তৃষ্ণায়। অন্তরাত্মা কাঁদলেও মুক্তি নেই মানুষের। পরবর্তী সময়ে কবিদের কিন্তু আর এই রবীন্দ্র-বর্জনের সজ্ঞান প্রচেষ্টা তেমন চোখে পড়ে না। অমিয় চক্রবর্তী বা জীবনানন্দ দাস আপনা থেকেই স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছেন। অগ্রজ কবিদের থেকে তাঁরা স্বাভাবিক শিক্ষা পেয়েছেন যা তাঁদের পথকে চোখের সামনে উন্মোচিত করে দিয়েছে।

দুটো বিশ্বযুদ্ধ মানুষকে নানা ভাবে শিক্ষিত করেছে। কবিদের অনুভূতিশীল মনে এমন কিছু ছাপ ফেলেছে যা গতানুগতিক বললেও ভুল হয় না।

যুদ্ধ, অশান্তি, যান্ত্রিকতা এই সবই এখনকার কবিতার মূল বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য তারই মধ্যে কোন কোন কবি অন্যকোন 'বোধের' প্রতিও আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করেন।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী পাঁচের দশকেরই কবি। কবি হিসাবে তখন তিনি তরুণ হলেও বিষয় বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাঁর বিশিষ্টতা প্রথম থেকেই লক্ষ্য করা যায়। কবির প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের একটি তালিকা দেওয়া হল :

নীল নির্জন	১৯৫৪ খৃষ্টাব্দ
অন্ধকার বারান্দা	১৯৬১ ,,
নীরক্ত কবরী	১৯৬৫ ,,
নক্ষত্র জয়ের জন্য	১৯৬৯ ,,
কলকাতার যীশু	১৯৬৯ ,,
উলঙ্গ রাজা	১৯৭১ ,,
খোলা মুঠি	১৯৭৪ ,,

তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'নীল নির্জন' থেকেই দেখা যায় তিনি নানা বিষয়কে কবিতার বিষয়ীভূত করেছেন আর এই চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে তাঁর সাম্প্রতিকতম কাব্যগ্রন্থেও। কোন ছকবাঁধা পথে তিনি হাঁটেন নি। বস্তুতঃ পক্ষে তিনি অনুভূতিশীল এই জগতের দিকে উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে আছেন এখান থেকেই তিনি তাঁর বক্তব্য বা লেখার বিষয় আহরণ করছেন। তিনি বলেওছেন —

আমার চোখ আর কান আমি খোলা রেখেছি। টান টান করে বাড়িয়ে রেখেছি আঙুল। সব কিছু আমাকে দেখতে হবে। সবকিছু আমাকে শুনতে হবে। সব কিছু আমি ছুঁতে চাই। জানিয়ে যেতে চাই, কোন্ দৃশ্য আর কোন্ কণ্ঠ আমার কেমন লেগেছিল।[১]

দৃশ্যমান জগতের সমস্ত অনুভূতি তিনি অনুভব করে তাঁর কাব্যে রূপ দিয়েছেন বলেই কোন নির্দিষ্ট বিষয় নয় নানান বিষয় তাঁর কবিতার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

আমরা নীরেন্দ্রনাথের নাগরিক মননের কবিতার আলোচনা পরে করছি। কিন্তু নাগরিকতা তাঁর একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। নাগরিকতা ছাড়াও তাঁর কবিতায় আরো কিছু উপাদান আছে যার উল্লেখ না করলে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

নীরেন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় আজকের পৃথিবীর অস্থিরতা, বিকৃতি ও জটিলতার ছবি এঁকেছেন। সময়ের এই নগ্ন বাস্তবতা এখনকার কবিতার স্বাভাবিক বিষয়। নীরেন্দ্রনাথের কবিতাও তা এসেছে— নীল নির্জন গ্রন্থের 'ঢেউ' 'কান্না' 'অন্বেষণ' এ ' অন্ধকার বারান্দার' দেওয়ান, বারান্দা , 'নীরক্ত করবী'র সূর্যাস্তের পর যবনিকা কম্পমান, অন্ধের সমাজে একা, 'কলকাতার যীশু'র 'যুদ্ধক্ষেত্রে এখনো সহজে'—ইত্যাদি কবিতায় আমরা পাই এক জটিল, প্রেমহীন জীবনের কথা। কিন্তু কবি এই হতাশাতেও মগ্ন নন। তিনি জানেন এই অন্ধকার শেষ কথা নয়। রাতের কালো তাঁর কাছে কেবলমাত্র অন্ধকার নয় বরং —

রাত্রি হল মন, আর মন হল অরণ্যের মতো,
কোমল জ্যোৎস্নায় পোড়ে প্রসারিত দীর্ঘ শাখা তার।[২]

প্রেমহীনতা নয়— চরম দুখে আর নিরাশাতে প্রেমই সান্ত্বনার হাত বাড়ায় ——

— তারপর
যখন সে প্রায় ফুরিয়ে গিয়েছে,
শোকের আগুনে পুড়িয়ে পুড়িয়ে
প্রেম তাকে দিল সান্ত্বনা, দিল
স্বয়ংশান্তি তৃপ্তির ঘর। [৩]

মানুষের প্রতি নীরেন্দ্রনাথের এক গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ আছে। তাই মানুষের অপমান, মনুষ্যত্ববোধের ক্রমাবনতি তাঁকে ক্ষুব্ধ করে তোলে—

সারাটা দিন মানুষ দেখে, মানুষ দেখে,
এখন শুধুই অসম্মানের জ্বালায় জ্বলছি আমি।' [৪]

নীরেন্দ্র করবীর সংলাপ এবং আরো অনেক কবিতাতেও মানুষের 'অবিবেকী' চিন্তায় কবির ক্ষোভের কথা উচ্চারিত হয়েছে। কখনো কখনো এই ক্ষোভ তাঁকে নিয়ে গেছে প্রকৃতির কাছাকাছি। মানুষের সমাজ থেকে চোখ ফিরিয়ে তাকিয়েছেন প্রকৃতির উদার মুক্তিতে। কখনো বা তাঁর কবিতার নায়ক অমলকান্তি — উকিল, ডাক্তার বা মাস্টার নয় হতে চেয়েছে এক ফালি রোদ্দুর। কিন্তু তাঁর সেই ভাব স্থায়ী হয় নি। আবার তিনি মানুষের দুখের সাথী হয়েছেন, আশা করেছেন

শুধুই দুঃখ নেই দুয়োরানির সংসারে
দুঃখের সংসারে আছে পারুল দিদির ভালবাসা। [৫]

এই ভালোবাসা জীবনের প্রতি তাঁর আস্থা নীরেন্দ্রনাথের বড় বৈশিষ্ট্য। এই

পৃথিবীকে তিনি ভালোবাসেন এর রোগযন্ত্রণায় তিনি ব্যথা পান, হয়তো নিবারণ করতে পারেন না কিন্তু সান্ত্বনার হাত রাখতে ভোলেন না। তাছাড়া তিনি জানেন —

ভালবাসা থাকলে সব হয়
দেখো সব হবে।
যা কিছু বানানো যায়, আমি
দুই হাতে
দিনে দিনে বানিয়ে তুলব, তুমি দেখে নিও। [৬]

মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসারই চূড়ান্ত রূপ 'কলকাতার যীশু' কবিতা। ভালোবাসার বিশ্বাসের গভীরে পৌঁছে তিনি চকিতে অনুভব করেছেন ভিখারী মায়ের শিশুর মধ্যে বেথেলহামের সেই জ্যোর্তময় পুরুষকে। নিন্দা, ক্রোধ, ভয় সমস্ত কিছুকে জয় করে এই শিশুও নির্বিকার ভাবে পৃথিবী জয় করতে বেড়িয়ে যাবে।

শিশুর কথা তিনি তাঁর কবিতায় বহুবার বলেছেন। শিশু তাঁর প্রিয় প্রতীক। প্রতীক ভালোবাসার, জয়ের, উদার-স্বচ্ছ-দৃষ্টির। শিশুর মন মুক্ত, সংসারের আবিলতা তাকে স্পর্শ করে নি। সাদাকে সাদা আর কালোকে কালো সে বলতে জানে। সত্য-মিথ্যার ভেদও সে সহজে চিনতে পারে। তাই উলঙ্গ রাজায় তিনি ব্যাকুল অন্তরে খোঁজেন সেই রূপকথার শিশুটিকে যে রাজাকে বলবে 'রাজা, তোর কাপড় কোথায় ?' শহরের পথে নামা উলঙ্গতাকে একমাত্র শিশুটিই চিনিয়ে দিতে পারবে।

এই সব গভীর ভাব আর ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে এও লক্ষ্য করা যায় তিনি নিতান্ত সহজে ঘরোয়া বিষয় বা সংস্কারকেও তাঁর কোনো কোনো কবিতায়

স্থান দিয়েছেন। যেমন 'চিরন্তনী' কবিতাটি।

পল্লী প্রকৃতির কবিতাও তিনি কিছু কিছু লিখেছেন। তবে সেখানে বাংলাদেশের পল্লী নয় সাঁওতাল পরগনা বা গাড়োয়াল অঞ্চলের কথা তিনি বলেছেন। 'সাঁওতাল পরগণার বর্ষা'হেন, 'বৈশাখ', 'হঠাৎ হাওয়া' ইত্যাদি সে জাতের কবিতা।

নীরেন্দ্রনাথ নানা বিষয়ের কবিতা লিখেছেন। প্রকৃতি, জীবনের জটিলতা, বোধের অন্বেষণ, মানুষের প্রতি তাঁর নিগূঢ় ভালোবাসা এইসব নানা বিষয় তাঁর কবিতায় এলেও প্রত্যক্ষত রাজনীতি নির্ভর কবিতা কখনো লেখেন নি। যদিও তিনি বলেছেন যে মানুষকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় একটি রাজনৈতিক বিন্যাসের মধ্যে নিঃশ্বাস নিতে হয়[৭] তাহলেও পাঠক কখনো এই কবির বিশেষ প্রবণতার ইঙ্গিত পান না। অবশ্য তিনি সেই ব্যবস্থায় নিন্দা করেছেন যাতে নিজেকে নিরাপদ রেখে অন্যকে ঠেলে দেয় বিপদের আগুনে(রক্তপাত, পড়ন্ত বেলায় : উলুখরাজা)। কিন্তু এই নিন্দাবাদ বিশেষ কোন দলের প্রতি নয় বা মতবাদের নয়— এ নিন্দা সুবিধাবাদীর প্রতি। এতে কবি হিসাবে তাঁর প্রবণতার খবর জানা যায় না।

প্রকাশ্যভাবে এই কবি কখনো নির্দিষ্ট কোন দল বা মতের সঙ্গে নির্দিষ্ট ভাবে যুক্ত হন নি। তিনি তাঁর নিজস্বতা নিয়ে মুক্ত আছেন। এই স্বকীয়তাই এই কবির উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য। তিনি যে সময়ের কবি সেই সময়কার মানুষ, জীবন এবং মূল্যবোধের প্রতি আস্থা হারিয়ে হতাশায় বাস করছেন। অথচ নীরেন্দ্রনাথের মধ্যে রয়েছে এক গভীর বিশ্বাস, মানুষের জন্য ভালোবাসা, তাঁর এই বিশ্বাস আমাদের মনে করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের কথা— যিনি বিপর্যয়ের চূড়ান্ত সময়ে দাঁড়িয়েও মানুষকে ভালোবাসতে চেয়েছেন বলেছেন 'মানুষের প্রতি

বিশ্বাস হারানো পাপ।'

॥ দুই ॥

সাধারণত: কোন কবিকে কোন নির্দিষ্ট মনে পঙক্তি-ভুক্ত করা যায় না। নানা অভিজ্ঞতা এবং ঘটনা যেমন একটি মানুষের জীবনকে দৃঢ়মূল করে তেমনি নানা ধরণের কবিতা একজন কবির কবি হিসাবে পরিচিতিকে বাড়িয়ে তোলে। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মধ্যে আমরা নানা ধরণের কবিতা পাই। কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে তিনি অজস্র কবিতা লেখেন নি বরং অজস্র বিষয়ের ওপরে তাঁর কিছু কিছু কবিতা রয়েছে।

নীরেন্দ্রনাথ নানা ধরণের কবিতা লিখেছেন কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই যে তিনি গ্রাম বাংলা নিয়ে প্রায় কোন কবিতাই লেখেন নি। অথচ তিনি বলেন —

> '' কলকাতায় আমাদের বাসা ছিল, পুব-বাংলায় আমাদের বাড়ি বাড়ির কথা যখন মনে পড়ে, তখন খাল, বিল, নদী নালা, সর্ষেখেত হলুদফুল, বাঁশের সাঁকো, কাঠের 'খন', সন্ধ্যে, খামার, ধানের 'মলন', জলে ডোবানো পাটের গন্ধ, হাটের পাশে ডিঙির সারি, হিজলের ছায়া, বাঁশবনের মট্‌মট শব্দ, ভোরের আলো, আর সন্ধ্যার ম্লানতা আমাকে নিমেষে অধিকার করে নেয়। স্মৃতি বড়ো বেদনাবহ। কিন্তু আমাকে প্রশ্ন করে লাভ নেই, কেহায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে?'' আমি বাসি। কেননা, আমি জেনে গেছি যে, স্মৃতি চারণের এই বেদনাও বড়ো আনন্দময়।'' [৮]

পূর্ব বাংলার স্মৃতির প্রতি তাঁর এমন প্রগাঢ় টান থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকেই প্রায় সে বিষয়ে নীরব। প্রকৃতির কবিতা, পল্লী-প্রকৃতির কবিতাও তিনি লিখেছেন। কিন্তু সেই প্রকৃতি বাংলাদেশের পল্লী প্রকৃতি নয়। তিনি যেন সচেতন ভাবে এই বিষয়টিকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। বস্তুতঃ পক্ষে তিনি যে কবিতা লিখতে শুরু করেছেন এটি সেই সময়ের যুগ বৈশিষ্ট্য ও বলা যায়। পঁচিশের দশকে কবিরা পল্লী প্রকৃতি, দেহাতীত প্রেম ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য থেকে সরে আসতে চেষ্টা করছিলেন। নীরেন্দ্রনাথও তার ব্যতিক্রম নন।

নীরেন চক্রবর্তীর কবিতার যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি অনুসন্ধান আমরা করছি অর্থাৎ নগর মননের কবিতা বা নগর সংক্রান্ত কবিতা তা যে কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকেই পাওয়া যাবে তা আশা করা যায় না। বরং তার বিপরীতটি ঘটার সম্ভাবনাই বেশী। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'নীল নির্জন' (প্রথম প্রকাশ ১৯৫৪ খৃঃ) তে নগর জীবনের কথা বা তাঁর নগর মনের ছবিও তেমন ভাবে নেই। কিন্তু তা না থাকলেও কবি যে ভিন্ন মননের তা আমরা অনুভব করতে পারি। কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় কবিতাটি "সাঁওতাল পরগণার বর্ষা"। লক্ষ্য করার বিষয় কবিতাটি সাঁওতাল পরগণার অর্থাৎ বাংলাদেশের বাইরের। বাংলা দেশের বর্ষা নিয়ে তিনি লিখছেন না তা মনে করিয়ে দেবার জন্যই যেন 'সাঁওতাল পরগণা' স্থান নামটির উল্লেখ করলেন। কবিতাটি 'সাঁওতাল পরগণার' বলেই স্বাতন্ত্র্য মণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

'সাঁওতাল পরগণার বর্ষা' কবিতাটি তিনটি স্তবকে বিভক্ত। প্রথম স্তবকে কবি বলছেন ঝড় নেমে আসছে উদ্দাম উল্লাসে, ত্রিকূট পাহাড়ের চূড়া দূর নিরীক্ষ্য হয়ে পড়ে-হারিয়ে যায় মাঠ বা বন নদী। বৃষ্টি হচ্ছে যে জল ঝরে পরে তা গৈরিক স্রোত হয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায় কুড়েঘর, কোঠাবাড়ি বা দিয়ারা বাংলা যারা গ্রামকে। বৃষ্টি এই সাঁওতাল গ্রামটিতে কেন নামে —

দূরন্ত ঢেউ তোলা এই মাঠের সবুজ টানে
নামে জল, ভাঙে হাওয়ার আঘাতে উন্নত দেবদারু।

দ্বিতীয় স্তবকে তিনি মহুয়ামাতাল প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন। মেঘ জমার আগে এখানকার আকাশ ছিল মরকত মণির মত ঘন নীল, সেখানে যখন মহুয়ার গন্ধভরা মাতাল হাওয়া বইত তখন ঘুমও নেমে আসত আলগোছে পুথ পায়ে।

" হালকা সবুজে ছাওয়া
দুচোখে জড়ানো ঘুম হয়ে নামে পড়ন্ত রোদ্দুর।"

তৃতীয় স্তবকে-বৈশাখ আকাশের গায়ে গায়ে মেঘ ছড়িয়ে দেয়— আর—

" কোথায় ছুঁড়ে ফেলে দাও মহুয়ার ভালবাসা
মুছে দিয়ে যাও নীড়ের মমতা, শিথিল মৃত আবেগ
ঝোড়ো উল্লাসে মেতেছে কোথায় প্রমত্ত বৈশাখ।"

ঘুম ভাঙা রাতে দূরে শোনা যায় মেঘের গুরুগুরু ডাক।

প্রভাবে তিনটি স্তবকে তিনি সাঁওতাল পরগণায় বর্ষা নামার বর্ণনা দিয়েছেন। স্তবক তিনটিকে তিনি ব্যবহার করেছেন শিল্পীর তুলির মত। সাঁওতাল পরগণার উঁচু নীচু ভূমির বর্ণনায় তিনি বলছেন 'ঢেউতোলা মাঠ' উপমাটি সুপ্রযুক্ত। আবার দেবদারু শাখার ঋজু ভঙ্গী বোঝান'উন্নত দেবদারু শব্দটির মধ্য দিয়ে। মরকত আকাশ বলতে যেমন গাঢ় নীলিমা ফুটে ওঠে তেমনি'পড়ন্ত রোদুর' সার্থক হয় মিঠে আমেজের ঘুমের প্রকাশে। গৈরিক জলস্রোত ভাসিয়ে দিয়েছে কুঁড়েঘর মাচঘাট তাই বলছেন বৈশাখ ভাঙছে নীড়ের মমতা আর মহুয়ার মাতাল ভালোবাসা।

সাঁওতাল পরগণার বর্ষা কবিতাটি সুন্দর হলেও এতে রয়েছে শুধু মাত্র প্রকৃতির বর্ণনা। এই প্রকৃতি নগরের আগ্রাসী হাতে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কিনা সে কথা তিনি লেখেন নি। লিখলে হয়তো কবিতাটিতে অন্য একটা মাত্রা যোগ হত। যাই হোক এটি প্রকৃতির কবিতা হলেও একটা ব্যতিক্রমী কবিতা হিসাবে ধরা যায়।

সেই রকমই আর একটি কবিতা 'পরমক্ষণ' (৭নং)। এখানেও দুটি স্তবকে কবি কাংলামারুর মাঠে রাত্রির বর্ণনা দিচ্ছেন। জ্যোৎস্নার কাংলা-মারুর মাঠ ঝলমল করে। অরণ্য প্রাঙ্গন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। অরণ্যের মাঝখানে মাঠটিকে মনে হয় যেন দ্বীপ। সেখানে ঘুম ছড়িয়ে দেয় 'ঘুমের বুড়ি শূন্যমাঠে শান্তি নেমে আসে, চিন্তার গ্রন্থি খুলে যায় আর তখনই নেমে আসে পরমক্ষণ—'সকল আলো নিবলে পরমক্ষণ শুধু পায়ে নামবে'॥ এখানে 'পরমক্ষণ' বলতে সম্ভবত: কবি জীবনের শান্তিকে বোঝাতে চেয়েছেন। এই কবিতাটিও সাঁওতাল পরগণা নিয়ে লেখা বলেই উল্লেখ করা হোল। নগরীয় প্রকৃতির কথা বলতে গিয়ে, কবি বাংলার পল্লীপ্রাণতায় অতি ব্যবহৃত ধারা থেকে সরে গিয়েছেন সাঁওতাল পরগণায়। নগরবাসী কবির ভ্রমণ শিকড়ের সন্ধানে পল্লীব্যাকুলতা নয়।

'সন্ধী সংগীত' কবিতাটি ত্রয়োদশ সংখ্যক। কবিতাটি প্রকৃতি বা নাগরিক কোন শ্রেণীভুক্ত না হলেও উল্লেখযোগ্য। কারণ কবিতাটি কবির নাগরিক মনটিকে চিনতে সাহায্য করে। জীবনপথে চলতে চলতে তিনি কখনো হতাশ হয়ে পড়েন। আবার তারিমধ্যে মাঝে মাঝে তিনি শান্তিও আশ্বাসের বাণী শুনতে পান তখন —

... মনে হয়, এই অন্ধ ভয়ে ভরা রাত
সমস্ত দু:স্বপ্ন নিয়ে মুছে যাবে। সারাক্ষণ আর

জীবনের শত্রু তার পথে পথে সর্বনাশা জালে
শিকার খুঁজবে না।"

এই আশ্বাস আসে তখন, যখন মাতালের প্রলাপ থামিয়ে সংগীতের সুর ভেসে আসে। তাঁর প্রাণ মন জানে এই আশা মিথ্যা, ময়দানের সবুজ ঘাসের জাজিমের মত তা একসময় ছিঁড়ে যাবে ---

'তবু এই মুহূর্তে অন্তত
স্মৃতির বিবর্ণ ঝাঁপি ভরে রাখি রবীন্দ্রসংগীতে।'

জীবনের গ্লানির দিকটির ইংগিত দিলেও কবি তা স্পষ্ট করেন নি। এখানে তিনি আমাদের জানাচ্ছেন রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যে তাঁর আশ্রয় হবার কথা।

আজকালকার দিনে রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ে শহর ও গ্রামের মানুষ সকলেই জানে। স্থানে অস্থানে, সুরে-বেসুরে তারস্বরে এর ব্যবহারও আমরা লক্ষ্য করি কিন্তু পঁচের দশকে এই জনপ্রিয়তা ছিল না। তখন শহরের শিক্ষিত মানুষের মধ্যেই এর প্রচার ছিল। তাই রবীন্দ্রসংগীত প্রিয় এই মানুষটি যে একান্তই নগরের মানুষ তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

'নীল নির্জন' গ্রন্থের এই তিনটি কবিতাকে আমরা কিছুটা ব্যতিক্রম বলে উল্লেখ করলাম। প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ হলেও তিনি কিন্তু [illegible] কোথাও গ্রাম অর্থাৎ বাংলাদেশের গ্রাম নিয়ে একটা কবিতাও লেখেন নি। যে কবি জীবনানন্দের মধ্যে তাঁর শুধু বাংলার গ্রামকে খুঁজে পান তাঁর পক্ষে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। একমাত্র 'বাসী বকুল' কবিতায় তিনি বলেছেন ট্রেনের জানালা থেকে তিনি দেখেছেন ধানক্ষেত ভরা মাঠ, ঘুমন্ত গ্রাম, গ্রামের বধূ - কিন্তু এই দেখা নিতান্তই দর্শকের চোখে দেখা—যেতে যেতে ছুটন্ত ট্রেন থেকে

দেখা, শহরের মনই এর দর্শক। একে গ্রাম বাংলা বিষয়ক কবিতা বলা যাবে না।

এবারে আমরা 'গৈরিকগান' কবিতাটির উল্লেখ করব একমাত্র এই কবিতাতেই তিনি শহরের কথা বলেছেন, শহরে ফেরার কথাও বলেছেন। এ কবিতার শুরুই হয়েছে এভাবে 'ফের তো ফিরনে শহরে।' শহর ছেড়ে তিনি দূরে কোথাও বেড়াতে গেছলেন সুপু মেয়াদি ছুটির শেষে ফিরেছেন কোলকাতায়। ফিরে এসে এই সুল্প দিনের ছুটিটাকে তাঁর কখনো কখনো মিথ্যে স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে প্রকৃতির যে নিবিড় সান্নিধ্যে তিনি এই কদিন ছিলেন তাও মিথ্যে।

—— মিথ্যে দশ কি পনেরো
দিনের সুল্প মেয়াদি ছুটির শিখরে দাঁড়িয়ে হাওয়া খাওয়া,
মিছে নান বাবুডি'র
কাঁকড়ের গুঁড়ো পায়ে মেখে নিয়ে
বাতাসের সাথে ছুটে যাওয়া।

আবার কখনো মনে হচ্ছে নীড়ে ফেরার জন্য তাঁর যে ব্যস্ততা সেটাই হয়তো মিথ্যে। কিন্তু তা যদি মিথ্যে হয় তাহলে তো বছরের বাকিদিনগুলি মিথ্যে হয়ে যায়। দশটা পাঁচটার অফিস, ট্রামে ওঠার তাড়া সবই ফাঁকি হয়ে যায়। এই ব্যস্ত জীবন মিথ্যে হলে —

হঠাৎ নামলে সন্ধ্যা এ প্রাণ
উন্মনা হয় কেন ? কেন প্রাণে গৈরিকগান
তোলে প্রসূন
ছলো ছলো ঢেউ ?

কোলকাতা আর লাল বাড়ি'র দীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করে জ্যোৎস্নাধোয়া রাতে সেই নীল নির্জনে পাহাড়ের জন্য কবির মনে বেজে ওঠে বৈরাগী সুর।

কবি যেন বলতে চান জীবনের ছুটি আর কাজ দুই সত্য কোলকাতা আর বাড়ি কোনটিই মিথ্যে নয়। অথবা একটা মিথ্যে হলে অন্যটাও তাই হয়ে যায়। সব চাইতে বড় কথা কবি বলছেন নীড় হচ্ছে এই কোলকাতা। যতই তিনি ঘুরে বেড়ান তাঁর শেকড় রয়েছে এই শহরে। নীড়ের পাখি আকাশের জন্য উন্মুখ হলেও দিনের শেষে সে তার কুলায় আশ্রয় নেয়। কবিও অনুভব করেন নীড়ে ফেরার তাড়া। তাই বাড়ি অথবা কাংলামার যেখানেই তিনি যান না কেন সবই সুস্থ মেয়াদি। তিনি ফের এই শহরে ফিরবেন।

নীল নির্জনের তেতাল্লিশটি কবিতার মধ্যে মাত্র চারটি অন্য-সুরের-তারা মধ্যে একটিতেই তিনি শহরের কথা বলেছেন। কিন্তু সেই একটিতেই একটা দামী কথা জানিয়েছেন তা হোল শহর তাঁর নিজের ভূমি— তিনি ফিরে আসবেন এখানে।

॥ তিন ॥

'অন্ধকার বারান্দা' কাব্য গ্রন্থের (দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ : প্রথম প্রকাশ ১৯৬১ খৃঃ)'হাতে ভীরু দীপ' নামে কবিতাটিতে গ্রাম বাংলার বাইরে অন্য এক গ্রামের কথা বলা হয়েছে। কবিতাটি প্রেমের কবিতা। কবি বলছেন ভীরু হৃদয় নিয়ে অযৌঠিরঞ্জনীগ্রামে ফিরছেন কোন গ্রাম্য যুবক। সে আর কিছু আশা করে না, জানাতেও চায় না কাওকে তার ফেরার কথা।

সে শুধু একটু ঢালু জমির আশায় যাচ্ছে। কবিতাটি তিনি এমন কিছু স্থান নাম শোনাচ্ছেন যা বাংলা দেশের থেকে অনেক দূরে,হেলং পাহাড়, মৌঠি রঙ্গেলি, সিয়াসাও বা মানাগাঁও এসব স্থানের সাথে পরিচিত হলাম এই কবিতা থেকে।

এরপরের কবিতা 'হেলং'ও(৭ নং) পাহাড়িয়া অঞ্চল— গ্রাম বাংলা থেকে দূরের কবিতা। এই হেলং পাহাড়কে তিনি দেখেছেন বৃষ্টির তিমির ভেদ করে। পাহাড়ের ওপরে দেবতার চক্রান্তে মৃত্যু যেন 'পাখসাট' খায়, কিন্তু নীচে হেলং এর আশ্রয়ে আশ্রিত অঞ্চলে বাধা প্রতিহত। তখন এবং পরেও কবির মনে হয়েছে

তীব্রতম যন্ত্রণার গভীরে কোথাও
নিত্য প্রবাহিত হয় সেই আনন্দের স্রোতস্বিনী
যে জাগায় দারুণ ভয়ের
মর্মকোষে শান্ত বরাভয়।

লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই বরাভয় কবিকে দেবতা দান করে না— করে পাহাড় বা প্রকৃতি।

'হঠাৎ হাওয়া' (১১ নং) কবিতায়ও পাহাড়ের কথা। এখানেও হঠাৎ হাওয়ায় পাহাড়ে ঝড় উঠেছে সেই ঝড়ে মানোঠিগাঁও বিমূঢ়। মেঘের গর্জনের সাথে যুদ্ধাকিনী তান মিলিয়েছে। মেঘের গর্জনকে মনে হচ্ছে হরধনুর টঙ্কার। বৃষ্টি শিবের মাথার জটা জলের মত ছড়িয়ে পড়ছে। অথবা এও ভাবা যায়, কোন শিল্পী তার কালো রঙের বাটিটি উপুড় করে দিয়েছে। পাহাড়ে ঝড়ের বর্ণনার মাঝে তিনি পুরাণের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন— এতে এক গম্ভীর

ভাবনা দ্যোতিত হয়। পাহাড়ের প্রাচীন গম্ভীর ছবিটিও বেশ ফুটে উঠে ।

এই তিনটি কবিতার কোনটিতেই নগরের ছবি নেই তাহলেও তিনটি কবিতার কথা বলা হোল এই কারণে যে কবি প্রকৃতি বিষয়ক কবিতায় গ্রামকে টাঁই দেন নি। তাছাড়া এই কবিতা তিনটি থেকে দেখা যায় তিনি এখন আর সাঁওতাল পরগণাতেও নেই তাঁর ভাবনা আরো দূর প্রকৃতির দিকে সরে গেছে।

১৩ নম্বর কবিতা 'সকাল থেকে সন্ধ্যা থেকে রাত্রি' — বিপন্ন এক নাগরিক মানুষের সময় ভাবনা অথবা একাকীত্বের কবিতা। কবিতায় 'সকাল' শব্দটি থাকলেও মানুষটি ২৪ ঘন্টার হিসাবে সকাল খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ এর সকাল হয় 'প্রায় দুপুরে'। শহরের কিছু লোকের পক্ষে একথা নিদারুণ সত্যি। কবি লক্ষ্য করেছেন এদের সকাল মানে দুপুর। অনেক রাতে গানের আসর থেকে কি করে সে ঘরে ফিরল তা সে নিজেও জানে না। শূন্য পেয়ালার দিকে তাকিয়ে প্রায় দুপুরে সে চিন্তা করে —

..... কোনো ভাবে
দুপুরটা কাটবেই, মাঠে আড্ডা দিয়ে কিংবা সিনেমায়
তারপরে ? তারপরে সন্ধ্যা। সন্ধ্যাটা সে কি করে কাটাবে।'

কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে দেখি লোকটির বিকৃত বাসনার ছবি। টালি গঞ্জের 'ট্রিপল টোটের' বাজি জিতে লোকটি আনন্দে আত্মহারা। ট্যাকসির মিটারে তার চোখ নেই, চোখ নেই সুযোগ সন্ধানী বন্ধুদের 'শার্টের হাতায় মুখ ঢাকা' হাসিতে, সন্ধ্যেটা সে কাটায় রুমায় ফক্সট্রটে। তারপর নামে রাত্রি— রাত্রির আতঙ্ক পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে তার দিকে। ভয় পেলেও অন্ধকার রাতের আছে পরম সান্ত্বনার হাত।

সে সমস্ত দিন ভয় পেয়েছে রাত্রিকে, এবারে
রাত্রি তাকে টেনে নেবে জ্যোৎস্নার প্রসন্ন জানালায়

কবিতাটিতে দেখা যায় নগর জীবনের উন্মত্ত বিলাসের স্রোতে কিছু মানুষ ঘুরে বেড়ায়। সারাদিন হাটে মাঠে সন্ধান করে ফেরে সময় কাটানোর উপকরণের। একা নিজের মুখোমুখি হতে এই মানুষগুলি যেন ভয় পায়। সুন্দরের প্রকৃত ব্যঞ্জনা এদের জীবন থেকে যেন হারিয়ে যায়। এই কবিতার লোকটির অবশ্য শেষ অবধি উত্তরণ ঘটিয়েছেন কবি। দুঃখেই দুঃখের শেষ নয় একথা কবি বিশ্বাস করেন বলেই হাটে মাঠে ডুগডুগি বাজিয়ে বাঁদর নাচিয়ে বেড়ানো লোকটিকে এ অন্ধকারের নিঃসঙ্গতা থেকে জ্যোৎস্নার প্রসন্নতায় টেনে আনতে পেরেছেন।

কলকাতায় জীবন যাপনের ক্ষুদ্রতায় দৈনন্দিন তুচ্ছাতিতুচ্ছতায় মানুষ কেমন বিরক্ত হয়ে ওঠে তারই কবিতা 'সমুদ্রের সাধ'। প্রকৃতির থেকে বিচ্ছিন্ন লোকটি স্বপ্ন দেখে সমুদ্রের হাওয়া আর তরঙ্গের। ক্ষণিকের জন্য সে ভুলে যায় —

কোলকাতার সেই ফ্ল্যাট বাড়ির কথা
জল নিয়ে বাড়িওয়ালার সঙ্গে যেখানে তার নিত্য কলহ চলে
হাউমাউ অনটনের মধ্যে পা টিপে টিপে যেখানে পথ চলতে হয়'

জীবনের এইসব ক্ষুদ্রতার কথা ভুলে গিয়ে সে বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে, দুধ - কাঁকড়ার গর্তের ওপর দিয়ে হেঁটে যাবে, সমুদ্রের ঢেউ ভেজা হাওয়া গায়ে লাগাবে, শুনবে গাঙ চিল আর বন বাউয়ের কান্না- আর এভাবেই সে 'নিশ্বাস নিতে পারবে'।

নগর জীবনের প্রতি কবির বিরক্তি এবং অন্য এক উন্মুক্ত জীবনের জন্য গভীর ভালবাসার কথা এখানে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। অত্যন্ত

স্বাভাবিক বর্ণনাই এখানে সার্থক। কোলকাতার বাড়িওয়ালার সাথে জল নিয়ে ঝগড়া (আশ্চর্য কবির দৃষ্টি। সত্যই অধিকাংশ বাড়িওয়ালার সাথে জল নিয়েই কলহ চলে) বা নিত্য অভাব অনটনের মধ্যে পথ চলা সবাই সত্য। আবার অনটনের আগে 'হাউমাউ' শব্দটি জুড়ে দিয়ে অনটনের রাক্ষস প্রকৃতিকে ভালো ফুটিয়ে তুলেছেন। কোলকাতা ছাড়িয়ে যেখানে গিয়ে লোকটি বেঁচেছে সেই সুন্দর প্রকৃতির জন্য তিনিও উন্মুখ তাও বোঝা যায় —

> আ, কতদিন সে এই বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ির উপর দিয়ে হাঁটেনি
> কতদিন এই ঢেউ ঢেউ নবণাক্ত হাওয়ায়
> নিশ্বাস নেয়নি সে,
> কতদিন সে শুনতে পায়নি এই বন ঝাউ আর গাংচিলের কান্না,
> কত বছর।
>
> .. ..
> .. ..
>
> দুধ কাঁকড়ার গর্তের উপর দিয়ে হেঁটে গেল সেই লোকটা,
> সমুদ্রের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।
> আ, এতক্ষণে সে নিশ্বাস নিতে পারবে।[১]

কোন উপমা রূপক ব্যবহার না করে একেবারে স্বাভাবিক বর্ণনা দিয়ে তিনি পুরোটা বলেছেন কিন্তু সেই বলাটাই কবিতা হয়ে উঠেছে।

'আলো অন্ধকারে' কবিতার শুরু থেকেই বোঝা যায় এর প্রেক্ষাপট শহরের। 'আলো, আলো, আর আলো' অর্থাৎ চোখ ধাঁধানো আলো আর কানফাটানো কলতানির শব্দে শুরু হোল খেলা অর্থাৎ ম্যাজিক শো। নানা খেলা দেখালেন ম্যাজিসিয়ান— প্রত্যেকটাই সুন্দর তবে শেষ খেলাটা ভারী মজার।

ভদ্রলোক তাঁর টুপির মধ্যে পায়রা রাখলেন একটা,
ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিলেন।
তারপর সেই ঢাকনাটাকে সরিয়ে নিতেই দেখা গেল,
পায়রা নেই, তার বদলে রয়েছে
টাটকা একগুচ্ছ রজনীগন্ধা।
আলতো হাতে সেই ফুলগুলিকে তুলে নিলেন তিনি
দর্শকদের দিকে ছুঁড়ে দিলেন।

বাড়ী ফিরে স্নান খাওয়া দাওয়া সেরে অন্ধকার বারান্দায় বসে কবি দেখলেন — অন্ধকারেও জ্বলজ্বল করছে টবের রজনীগন্ধা। দেখতে দেখতে —

হঠাৎ একসময় মনে হল,
শেষ খেলাটা হয়তো দেখা হয় নি।
সেই গা ছমছম অন্ধকারে কিসে হয় বলা তো যায় না।

কিন্তু খেলাটা দেখার জন্যে আর অপেক্ষা করলেন না পালিয়ে এলেন।

এখানে কবি কল্পনা প্রবণ কিন্তু শহুরে মানুষ। যে অবাস্তব ও অসত্য ম্যাজিককে করতালি দিয়ে স্বাগত জানায় কিন্তু জীবনে সত্যের প্রকাশের জন্য অপেক্ষা করে না পালিয়ে বেড়ায়। কাল্পনিক ধারণাকে যাচাই পর্যন্ত করার মত মনের জোর যার থাকে না।

এই কবিতার পটভূমি শহরের। ম্যাজিকশো, আলো, টবের ফুল ইত্যাদি শব্দগুলিই তা প্রমাণ করে। কল্পনাপ্রবণ লোক, যে টবের ফুলকে সত্যিই পায়রা হতে পারে বলে মনে করে সে হয়তো শহরে গ্রামে সর্বত্রই আছে কিন্তু ভয়ে পালিয়ে যাওয়া দেখে গ্রামের সহজ বুদ্ধির মানুষ বলে মনে হয় না

নি:সন্দেহে মনে হয় এ শহরেরই।

'ফলতায় রবিবার' কবিতায় দেখি কবিতার বন্ধু অমিতাভ আর সিদ্ধার্থর সাথে ফলতায় রবিবারের ছুটি কাটাতে গেছেন। কিন্তু তারপর তিনি আর ফিরতে চাইছেন না। বার বার প্রশ্ন ভাসছে 'কেউ কি শহরে যাবে?' বলে কিন্তু কবি বা তাঁর বন্ধুরা যাবেন না ফিরে শহরে।

বরং ঘনিষ্ঠ এই সন্ধ্যার সুন্দর হাওয়া খাব,
বরং লুণ্ঠিত এই ঘাসে ঘাসে আকণ্ঠ বেড়াব

তারপর তাঁরা দেখবেন কি করে সূর্য অস্ত যায় নদীর বুকে, দেখবেন তরঙ্গের গায়ে কেমন করে নৌকার আলো পড়ে ভেঙে যায় ।

শহরে প্রচণ্ড ভিড় অকারণ তুমুল চিৎকার
নগ্ন নিয়নের বাতি। শহরে ফিরব না কেউ আর।

শহরের না ফেরার কারণ এগুলি। ঐ হৈ হৈ চিৎকারে ফেরার চাইতে অপচয়ী সূর্যের সোনা ওড়ানো দেখা বা অন্ধকারে নদীর কালো হয়ে যাওয়া দেখা অনেক ভালো বলে মনে হচ্ছে কবির কাছে, তাঁর বন্ধুদের কাছে।

নগর জীবনের প্রতি তাঁর বিমুখতার কারণগুলি অতি অল্প কথায় কবি বুঝিয়েছেন। মাত্র একটি বাক্যে — 'শহরের প্রচণ্ড ভিড়, অশ্ব অকারণ তুমুল চিৎকার, নগ্ন নিয়নের বাতি'– তাই তিনি ফিরবেন না শহরে। শহরের বিপরীতে রেখেছেন ফলতার শান্ত সৌন্দর্য এতে ছবিটি আরো স্পষ্ট হয়ে ফুটেছে।

সূর্যাস্তের বর্ণময় বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে– 'কতখানি সোনা ডুবে গেল' অথবা 'অপচয়ী সূর্য তার সবটুকু সোনা কি করে ওড়ায়' শব্দগুলি উচ্চারণমাত্রই ছবি হয়ে যায়। আবার অন্ধকারে নৌকার লণ্ঠন থেকে আলো পড়ার বর্ণনা দিচ্ছেন 'তরঙ্গের গায়ে নৌকার লণ্ঠন থেকে আলো পড়ে, আলো কাঁপে, আলো ভেঙে ভেঙে যায়'– স্বাভাবিক কিন্তু কাব্যময় বর্ণনা কবিতাটিকে সুন্দর করেছে।

'সমুদ্রের স্বাধ' অথবা 'ফলতায় রবিবার' দুটি কবিতাতেই তিনি শহর ছাড়িয়ে অন্য কোথাও আশ্রয় পেতে একান্ত উৎসুক তা বোঝা যায়।

'খাপছাড়া' কবিতাটি ঠিক শহরের নয় বরং গ্রাম্য যাত্রার কিছু আদল আছে। মাথায় পাগড়ি বুকে মালা আর কপালে শ্বেতচন্দনের ফোঁটা এঁকে, তলোয়ার উঁচিয়ে 'আমার মেবার দেব না' বলাতে যে অতিনাটকীয়তা তা ঠিক শহুরে নয়। কিন্তু কবি শহরের তাঁর ভাবনার প্রকাশভঙ্গী তা বুঝিয়ে দেয়। তাই শূন্য খাপে হতবুদ্ধি অভিনেতার মুখে আলোর যে সংকেত খেলা করে তা ট্রাফিক আলোর সঙ্কেত–'প্রথমে হলুদ, তারপরে সবুজ, তারপরে লাল' বিপদের তূরীয় অভিনেতাটিকে কবি এক মুহূর্তে উপস্থিত করে দেন।

'জুনের দুপুর' কবিতায় তেমনভাবে নগর জীবনের কথা বলা হয় নি বরং বলা হয়েছে 'অসীম ঊর্ধ্বলোকে বিশ্ববিহীনতার কথা। (অবশ্য এই ভাবনাটিকে তো নাগরিক মনের ভাবনাই বলা যায়। গ্রামের সীমাবদ্ধতায় এই ভাবনা ভাবা সম্ভব নয়।) কবিতায় ব্যবহৃত শব্দাবলী ও নগর জীবনের। যেমন এরোড্রাম শব্দটিই তো নগর সভ্যতার দান। এই কবিতায় যেসব স্থানের নাম,বস্তুর নাম আছে তা ভারতবর্ষের বাইরের। যেমন গাছ, গীর্জা খামার, হোটেল, কাফে, নোতরদাম গির্জা, কাইরো-রোমা এইসব শব্দ নিয়ে কবিতাটি

বিশ্ব নাগরিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অন্ধকার বারান্দা' গ্রন্থের আর একটি কবিতার উল্লেখ করা প্রয়োজন সেটি 'পলাশ ডিহি'। পলাশ ডিহি' নামের গ্রামটিতে তিনি একদিন ফিরে যাবেন বলে কথা দেন। অনেকটা জীবনানন্দের ভঙ্গীতে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন —

সেইখানে জানিও, ফিরে আসব আমি, ফিরে
আসব, ফিরে আসবই আবার।

তবে গ্রামটি রূপসী বাংলার গ্রামের মত প্রাণময় সবুজ নয় — বরং

মাঠটা পার হলেই গ্রাম। খাঁ খাঁ শান্ত। গোরু
নেই, মানুষ নেই। পথে
বুক সমান জঙ্গল। উঁচু ভিটে। কটা খুঁটি
টিনের চালটাকে ধরে রাখবে বলে হাত
শূন্যে তুলে স্তব্ধ হয়ে আছে।

তবুও কবি এখানে ফিরবেন। এতে হয়তো গ্রামের প্রতি তাঁর ভালোবাসার ইংগিত পাওয়া যাবে — কিন্তু গ্রামটি বাংলাদেশের কিনা তাতে সন্দেহ হয়। তাছাড়া প্রাণহীন এই গ্রামটি একথাও প্রমাণ করে জীবনানন্দের মত আজ আর গ্রামে ফেরা যায় না অন্ততঃ ফিরলে তা অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে পলাশ ডিহি বা অন্য কোন গ্রামে ফেরা আজ অবাস্তব হয়ে উঠছে ক্রমশ।

নীল নির্জন কাব্য গ্রন্থের মত এইখানেও তিনি সচেতন ভাবে গ্রামকে বর্জন করেছেন কবিতায়। এখানে আবার 'পলাশ ডিহি' কবিতাটি লিখে গ্রামকে আরো করুণ করে তুলেছেন।।

॥ চার ॥

'ফলতায় রবিবার' কবিতায় নীরেনবাবু শহরে না ফেরার কারণ হিসেবে বলেছেন নিয়নবাতির নগ্নতাকে। তাই পুনরুল্লেখ আছে 'নীরক্ত-করবী'র 'আকাসের মাঠে' কবিতায় দিনের বেলা মাঠটি অন্ধকার হয়ে থাকে আর রাতে নিয়নের আলোয় এর নগ্নতা প্রকটিত হয়। এই মাঠটি নিস্তৃণ। মাঠের ভূষণ তৃণ, তৃণহীন মাঠ কবির কাছে নগ্ন।

নিশীথে নিয়ন জ্বলে। বড় নগ্ন নিয়নের বাতি।
অথচ দিবসে নেই আলো।
অথচ দিবস ক্রমে অন্ধকার হয়।
উদ্যমী পিঁপড়েরা সেই অন্ধকারে শীতের সঞ্চয়
মুখে নিয়ে হাঁটে।
আমরা উদ্যমী নই।

দিনের অন্ধকার আর রাতের আলো আপাত বিরোধী কিন্তু শহরের জীবনে এমন বিরোধ প্রায়শই দেখা যায়। কবিতাটি নগর জীবনের সেই বিরোধের দিকেই আঙুলি নির্দেশ করছে।

'বাঘ' কবিতার প্রথম স্তবক দুটিতে বনের আতঙ্ক বাঘের বর্ণনা রয়েছে —

উঁচড়িয়ে কামড়িয়ে ফেঁড়ে কাঁটাকে ফুলন্ত গাছের
তখনও দাউ দাউ জ্বলে রাগ।
চিহ্নিত বিরাট বাঘ ফিরে যায় ঘাসের জঙ্গলে। ....
. . . . . .
বাঘ যায়। বনের আতঙ্ক হেঁটে যায়।

বাঘ হচ্ছে বনের আদিম নিয়তির প্রতীক। এই দুটি স্তবক পড়ে মনে হবে এটা বুঝি সেই আদিমতাকে নিয়ে লেখা কবিতা। কিন্তু সবশেষ লাইনটিতে এসে সেই আদিম হিংস্রতার ছবি মুছে যায় কবি বলেন 'আমরা নিশ্চিন্ত বসে বাঘ দেখি ডিসনির ছবিতে।' এতক্ষণের গড়ে তোলা ছবি ফিকে হয়ে গেল, বোঝা যায় এ হচ্ছে কৃত্রিম বাঘ। এই কৃত্রিমতা আধুনিক যুগ এবং নগর সভ্যতার দান। 'ডিসনির ছবি' সেই সভ্যতাকে আরো স্পষ্ট করে। তাছাড়া এতবোঝা যায় শহুরে মানুষের পক্ষেই জানা সম্ভব ডিসনির ছবির বাঘের কথা।

বাঘ কবিতার মতই 'স্বর্গের পুতুল' কবিতায়ও একটি লাইনই রয়েছে কবিকে চেনার জন্য। কবিতাটির বিষয় হচ্ছে প্রত্যেক মানুষ তার পূর্বনির্দিষ্ট ভূমিকানুযায়ী নত হয়। জীবনে কে কতটা নত হবে তা আগেই স্থির করা থাকে। মানুষ সে যেই হোক না কেন সম্রাট, সৈনিক, বেশ্যা, যাদুকর অথবা মাংসের দোকানের কশাই প্রত্যেকেই ঐতিহ্যানুক— স্বর্গের পুতুল মাত্র। স্বর্গের তটিনীর তীরে আলো জ্বেলে সারাদিন। তারপরেই বলেছেন —

কে বড় বাজারে যাবে, দুগজ মার্কিন এনে দিও
কে যাও পারস্যে, এনো সুন্দর গালিচা —

শুধু স্বর্গের তটিনীর তীরে যে যাবে তার কিছু আনতে হবে না তার শুধুই যাওয়া। এখানে 'বড়বাজার' শব্দটিই বোঝাচ্ছে কবির নাগরিক অবস্থানকে। কোলকাতার লোকেরা বড়বাজারের সাথে পরিচিত। তাই কবিতার বিষয় অন্য হলেও কবি তাঁর মনের অবস্থানকে ছোট্ট শব্দেই প্রকাশ করে দিয়েছেন।

'পুতুলের সন্ধ্যা' কবিতায় বলছেন 'শৈশবের স্মৃতি ধেনুগা' সবকিছুই সময়ের কাটাকে উল্টো ঘুরিয়ে আষাঢ় সন্ধ্যায় ফিরে আসতে পারে।

অর্থাৎ শৈশব কেবলমাত্র শৈশবেই শেষ নয়। 'স্মৃতির সারণী' বেয়ে কখনো কখনো তারা ফিরেও আসে। কিন্তু কবির কাছে তার কাগজের নৌকা, সাদা মাটির বিড়াল, জিরাফ সিংহ, আহ্লাদী পুতুল, উড়ন্ত কিন্নরী বা ভীষণ মোটা শালুক পুতুলটি কোন পথে ফেরে তাই লক্ষণীয় :

যেন অনায়াসে কোনো প্রাচীন জনতা
সমস্ত আইন ফাঁকি দিয়ে
সন্ধ্যার চৌরঙ্গি রোড় এক এক নির্বিকার পার হয়ে যায়—
সহজ আনন্দে, হাতে হারিকেন-লণ্ঠন বুলিয়ে।

চৌরঙ্গি রোড পার হতে এই প্রাচীন জনতা অন্য কোন আলোর সাহায্য নেয় না হাতে নেয় হারিকেন লণ্ঠন। কবির শৈশবের মনটির সাথে হারিকেন যেমন খাপ খেয়ে যায় তেমনি বর্তমানের কবি এদের ফেরার জন্য শহরের সবচাইতে জনবহুল ব্যস্ত পরিচিত পথটিই নির্দিষ্ট করে দেন।

এইসব কবিতাগুলিতে কবি একটি দুটি শব্দের মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দেন তিনি শহরের কবি এখানে তিনি আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে আছেন।

কিন্তু নীরক্ত করবীতে শহর নিয়ে, কোলকাতা নিয়েও কিছু কবিতা আছে। যেমন 'হঠাৎ শূন্যের দিকে' কবিতায় কবি ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারছেন কে সিংহ, হাতি, ঘোড়া অথবা কে 'বঙ্গোপসাগর থেকে উঠে এসে কলকাতার ভিড় ঠেলে সাঁতার কাটে, অথবা 'কে ধর্মতলায় পাঞ্জাবীর হাতা নেড়ে' উড়ে যেতে চায় হঠাৎ আকাশে। অর্থাৎ কবি ক্রমশ বুঝতে পারছেন মানুষ রূপে যারা কোলকাতায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, ভিড় বাড়াচ্ছে তারা কেউ মানুষ নয়। মানুষ রূপে কিছু জন্তু ঘুরছে।' কবির আরো মনে হচ্ছে —

ভিড়ের ভিতরে কেউ 'হু-শ'
বলে উঠেছিল, তাই ডানা ঝাপটিয়ে
নিখিল শূন্যের দিকে উড়ে চলে গেল
এক ঝাঁক সুন্দর মানুষ।

কোলকাতার ছদ্মবেশী মানুষদের কথাই এখানে কবির বলার বিষয়। প্রকৃত মানুষের যে অভাব ঘটেছে এখানে তাও তিনি আমাদের জানান।

'কলকাতায় শেখায়' কবিতায় নীরেন চক্রবর্তী জানাচ্ছেন কোলকাতা মানুষকে কি কি শেখাতে পারে। কোলকাতা শেখায় কিভাবে দূরত্ব রচনা করা যায় —

প্রতিটি মিছিল, সভা, ট্রাফিক আইল্যান্ড,
বাতিস্তম্ভ, বাস বোঝাই মানুষ, রমণী,
প্রত্নশালা, রঙ্গশালায়, সন্ধ্যার উনুন আলো,
পবিত্র হোটেল বাড়ি, শুঁড়িখানা,
কমিটি উদ্যান ইত্যাদিকে····
ইত্যাদিকে, ইত্যাদিকে
কান ধরে শেখাতে পারে, শিখিয়ে দিয়েছে,
এ ওর একমাত্র ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলেও তবু
কি করে উদাস দূরে থাকা যায়।

'কলকাতা'র কাছ থেকে কবিও এই দূরত্ব রচনার কৌশল শিখে নেন। আর শুধু দূরত্বই নয়— এই কবিতা শেখায় ভিড়ের মধ্যে আস্তিনে টান পড়লে, বা ঘাড়ের ওপর ডাকাতি হলে অথবা বাড়ির কড়া নড়ে উঠলেও কি করে চুপ করে থাকা যায়। কিভাবে তখন ভাবা যায় নির্দন্ত বাঘের কথা, আকাশী ফুলের কথা— এ ধরণের

উদাস ভাবনা। অর্থাৎ শুধু মাত্র দূরত্ব নয় আশেপাশের ঘটে যাওয়া ঘটনা থেকে সরে গিয়ে ব্যক্তি-গত ভাবনায় লিপ্ত হয়ে যাওয়া শেখায় কোলকাতা।

কবিও কোলকাতার 'ঘনিষ্ঠ সুদূর থেকে ভেবে যান'-বাবলার কাঁটা চিরকাল নির্দয় ছিল না'।

এখানে 'কলকাতা' নামক শহরটির উদাসীনতার কথা বলা হলেও এই উদাসীনতা যে কোন শহরেরই নিয়ম। কোলকাতা এখানে সকল শহরেরই প্রতিনিধি মাত্র। অন্যের বিষয়ে, পড়শীর বিষয়ে নির্বিকার থাকা নগর জীবনের প্রাত্যহিক বিষয়। কবিতাটি যে সকল নগরের প্রতি প্রযোজ্য তা আরো বোঝা যায় যিছিল, সভা, ট্রাফিক আইল্যান্ড, বাতিস্তম্ভ, প্রত্নশালা, রঙ্গালয়, পুঁথিখানা ইত্যাদি শব্দগুলির প্রয়োগ। এইসব জিনিস নিয়েই গড়ে ওঠে যে কোন একটি শহর।

কবিতায় 'দূরত্বের' সাথে উদাস কথাটি জুড়ে দিয়ে কবি দূরত্বকে আরো গভীর করে তুলেছেন। তেমনি করেছেন 'ঘনিষ্ঠ সুদূর' শব্দ ব্যবহারেও। দূরত্বে থেকেও অনেকক্ষেত্রে সাযুজ্য অনুভব করা যায় কিন্তু উদাস দূরত্বে সে সম্ভাবনা নেই। আবার তিনি কোলকাতায় ঘনিষ্ঠ-দৈহিক দিক থেকে; মনের দিক থেকে সুদূরে এ কথা বোঝাতে চাইছেন ঘনিষ্ঠ সুদূর শব্দ দিয়ে। অথবা প্রভাবেও ভাবা চলে স্বার্থান্ধ কোলকাতার থেকে তিনি সুদূরে কিন্তু এর বাইরে যা আছে তাতে তিনি মগ্ন ঘনিষ্ঠ। কারণ এরপরই তিনি বলছেন বাবলার কাঁটা নির্দয় ছিল না 'চিরদিন'। অর্থাৎ আজকের হৃদয়হীনতা এর চিরকালীন বৈশিষ্ট্য নয়– একদিন এখানকার মানুষজনও একে অন্যের প্রতি ভালবাসা অনুভব করত। মানুষের উদাসীনতা বোঝানোর জন্য যে কটি উদাহরণ দিয়েছেন তাও চমৎকার। ভিড়ের মধ্যে আস্তিনে টান পড়লেও নির্বিকার থাকা অথবা

পাশের ফ্ল্যাটে ডাকাতি হলেও খবর না নেওয়ায় শহুরে নিস্পৃহতা বোঝা যায়। গ্রামের যে মানুষটি আলাপ জমাতে চায় তাকেও উদাসীনতায় দূরে সরিয়ে রাখে। কবিতাটিতে শহরের মানুষের চরিত্র নিপুনভাবে কবি তুলে ধরেছেন তাতে বোঝা যায় এই মানুষদের তিনি কতদূর পর্যন্ত অনুধাবন করেছেন। মানুষের এইসব অমানুষোচিত ব্যবহার যে কবিকে ক্ষুব্ধ করে তাও বোঝা যায় কবিতার ঈষৎ তীর্যক বাগভঙ্গীমায়।

এই বইটির অনেক কবিতায়ই শহরের অনুষঙ্গ ফিরে ফিরে এসেছে। মূল কবিতার ভাবনার সাথে হয়তো নাগরিক ভাবনার কোন যোগ নেই কিন্তু একটি শব্দ বা পঙতি বুঝিয়ে দেয় কবির মনকে। যেমন বাঘ, স্বর্গের পুতুল, পুতুলের সন্ধ্যা ইত্যাদি কবিতা। এই কবিতাগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে একথা বলাও হয়েছে। সেই ধরণেরই আরো দুটি কবিতা 'নিয়ন মডেল অন্ধকারে' আর 'শকুন চৌরাস্তায়'। প্রথম কবিতায় কিছু শব্দের ব্যবহার করেছেন যা শহরের। যেমন 'প্রৌঢ় পালোয়ানের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট' 'প্রেস কনফারেন্স' অথবা 'নিয়নমন্ডল' শব্দটিই তো শহুরে। বিশেষত: নীরেন চক্রবর্তীর 'নিয়ন বাতি' শহরের প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছেন বারে বারে। তাই বোঝা যায় কবিতাটি শহরের ভাবনা থেকেই লেখা।

দ্বিতীয় কবিতায় দেখি একটি পুরোনের প্রথাকে মানুষ কিভাবে নিজের ব্যক্তিগত কাজে লাগায়। মৃতদেহ নিয়ে যাবার সময়ে হিন্দুরা পয়সা ছড়ায়। এটি পুণ্যলাভেচ্ছু মানুষের সনাতন বিশ্বাস থেকে জন্ম নিয়েছে। কিছু লোক সেই পয়সা তুলে নেয়। ধর্মভীরুরা তোলে না। তাই সেয়ানা কিছু লোকের কাছে এটি জীবিকার মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পয়সা কুড়াতে কুড়াতে এরা ক্রমশ মৃতদেহ লোভী শকুনের মত হয়ে গেছে। শুধু তাই নয় মৃতদেহের জন্য এরা জ্যান্ত মানুষকে খুনও করে ফেলতে চায়। জীবিকার এই বিকৃত বীভৎসতা, উপার্জনের জন্য উন্মত্ত লালসা ইংগিত দেয় শহরের মানুষের। কারণ গ্রামের

লোকেরা সচরাচর ধর্ম ভীরু হয়ে থাকে। তাছাড়া মৃতদেহটি যাচ্ছে শহরের বিসর্পিল ট্রাম রাস্তা দিয়ে। সহজেই বোঝা যায় এরা শহরের বিকৃত বুদ্ধি মানুষ—যারা অবস্থায় পড়ে শকুনে পর্যবসিত হয়েছে।

এভাবেই নীরেন্দ্র করবীর কোন কোন কবিতা নগরের না হয়েও নগরের। কবিতার ভাবনা অথবা পটভূমি কখনো নগরকেন্দ্রিক কখনো বা কবির মনটি অন্যকথা বললেও তাঁর শহুরে মনের প্রকাশ চকিতে কবিতাটিকে ছুঁয়ে যায়।

॥ পাঁচ ॥

'নক্ষত্র জয়ের জন্য' নীরেন্দ্রনাথের চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ (১৯৬১) কিন্তু এই কাব্যগ্রন্থে নগরবোধের কবিতার সংখ্যা অল্প। কবির অন্তর্নিহিত দার্শনিক মনটির প্রকাশ বরং এখানকার বেশী কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। এমনও দেখা গেছে কবিতাটি যে পথ ধরে চলছিল সেখানে হঠাৎ একটি এমন পঙক্তি তিনি লিখলেন যাতে কবিতাটি অন্য এক মাত্রা পেল। যা হতে পারত তা না হয়ে এক গভীর জীবনদর্শন সেখানে ফুটে উঠল। অথচ 'নীরেন্দ্র করবী'তে আমরা দেখেছি কবি অন্য বিষয় নিয়ে লিখতে লিখতে আমাদের হঠাৎ জানিয়ে দেন তিনি শহরের — একটি শব্দ বা পঙক্তি ব্যবহার করে। যেমন 'বাঘ' কবিতাতে বাঘের আতঙ্কিত বর্ণনা দিতে দিতে হঠাৎ বলেন আমরা নিশ্চিন্তে বসে বাঘ দেখি ডিসনির ছবিতে। নক্ষত্র জয়ের জন্য তে ঠিক তার উল্টো ঘটনাটি ঘটেছে।

একটি পঙক্তি তিনি এমন ব্যবহার করেন যা কবিতাকে নাগরিকতার সীমা ছাড়িয়ে নিয়ে চলে অন্য কোথাও। যেমন প্রথম কবিতা 'চুয়াল্লিশ পাউন্ড'। বিদেশ ভ্রমণের জন্য সঙ্গে কি কিনেওয়া হবে তার একটা দীর্ঘ তালিকা প্রথমে কবি দিলেন। কখন কি প্রয়োজন হয় এই ভেবে প্রাত্যহিক জীবনের দরকারী সব জিনিসই এতে ঠাঁই পেল।

ধবধবে ধোয়ানো শার্ট এক জোড়া,
অন্তত চারটে স্যুট, বাড়তি দু'জোড়া স্লিপার,
রুমাল, টাইপিন, কিছু বই
(হঠাৎ পড়বার ইচ্ছে হতে পারে),
বিছানা, বালিশ,
বেডকভার, বালিশের ঢাকনা, তোয়ালে,
মশারি, পেরেক,
পেরেক পুঁতবার জন্য হাতুড়ি একটা, দাড়ি
কামাবার সরঞ্জাম, আয়না, চিরুনি
জল খাবার গেলাস একটা, কিছু
এলাচ লবঙ্গ, মানে কোথায় কোনটা পাওয়া শক্ত জানিস তো, তাই

সব দেব।

কিন্তু কবি ঘোষণা করছেন প্লেন কোম্পানি মাত্র চুয়াল্লিশ পাউন্ড ওজনের জিনিস বইতে দেবে। এই বার সুদীর্ঘ তালিকা ছোট হয়ে গেল অনেক কিন্তু তবুও চুয়াল্লিশ পাউন্ড-এর শর্ত পূরণ হচ্ছে না। তখন কবি বললেন —

কিছুই দেব না। যাক্,
যে যেখানে যেতে চায়, নিতান্ত নির্ভার হয়ে
চলে যাক্।

শেষ পর্যন্ত এটা আর বিদেশভ্রমণ হয়ে থাকে না। কবিতায় অন্য এক যাত্রা যুক্ত হয়। এতক্ষণ ধরে চুয়ান্নিশ পাউন্ড, প্লেন কোম্পানি, মালের তালিকায় যে শহরের নোকটির পরিচয় আমরা পাচ্ছিলাম তা চলে গেল নির্ভার হয়ে চলে যাবার কথা বলাতে। কবিতাটি আর নিতান্ত নাগরিক মানুষের কবিতা হয়ে থাকল না।

অবশ্য কয়েকটি কবিতা এখানে আছে যাতে বিশুদ্ধ নাগরিক মনের ছাপ ধরা পড়েছে। সেই কবিতাগুলির আলোচনা আগে করা যাক।

'নিকেল তোমার জন্য' এই ধরণের একটি কবিতা। কবিতার নামকরণেই একটা গদ্যময় কঠিন ভঙ্গীর আভাস মেলে। নিকেল বলতে সেই বিশেষ শক্তর ধাতুযৌগটি বুঝিয়েছেন যা দিয়ে মুদ্রা তৈরি হয়। কবিতার বক্তব্য কোনকাতা শহরে প্রেম বা ভালোবাসা নেই। এ এক আজব জায়গা। কবি ইতস্তত: ঘুরে বেড়িয়েছেন প্রেমভিক্ষা চেয়ে। লোকের বাড়ির কড়া নেড়ে প্রেম যাচ্ঞা করেছেন। রাস্তা থেকে হাত বাড়িয়ে বাড়ির জানালায় প্রেম ভিক্ষা চেয়েছেন— এবং পরে বুঝেছেন—

এবড় আজব জায়গা। কলকাতা শহরে
পয়সা মেলে টাকাটা, সিকিটা তাও মিলে যায়।
কিন্তু ভিক্ষা কিছুতে মেলে না।

কিন্তু প্রেম ভিক্ষা পেলেই তিনি গঙ্গাতীরে অথবা ময়দানের ভিড়ে হারিয়ে যেতে পারতেন কিন্তু সেটা সম্ভব হল না। তিনি তাঁর ভিক্ষাপাত্র নামিয়ে রাখলেন। ইহাকালে আর গঙ্গার তীরে যাবেন না বরং আস্থানে করলেন নিকেলে নির্মিত বাড়ি আর রাস্তাঘাটকে।

নিকেলে নির্মিত বাড়ি, রাস্তাঘাট,
হৃদপিণ্ড, দোকান, হাট
তোমরাই তাহলে এসো আমাদের রক্তের গভীরে।

নাগরিক জীবন হৃদয়শূন্য আর প্রেম আসে হৃদয়ের গভীর থেকে। এই হৃদয়শূন্য নগরে তিনি প্রেমকে খুঁজেছেন-পাননি। বুঝেছেন কোলকাতা শহরের হৃদয় নেই তাই প্রেমিকের বেশ তাকে নামিয়ে রাখতে হল। ডিক্সপাত্রের মতই এর ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, মানুষের হৃদয়, কঠিন ধাতব।

কবিতাটিতে প্রেম আর ভিক্ষা সমার্থক করে দেখিয়েছেন। টাকা, সিকি বা পয়সা দেওয়া ভিক্ষা দেওয়া নয়। ভিক্ষা দেওয়ার সাথে হৃদয়ের উষ্ণতাকে মিশিয়ে দিতে হয়। ভালোবাসার ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। তাই প্রেমকে তিনি ভিক্ষা বলেই মনে করছেন। আবার নিকেলে নির্মিত ঘরবাড়ি হৃদপিণ্ড বলে এই শহরের প্রাণহীনতা বুঝিয়েছেন। নিকেল ধাতু এর প্রাণ নেই। এটি আধুনিক সভ্যতার দান– নগরও এই সভ্যতার দান– দুয়েরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রাণহীনতা।

পরের কবিতা 'প্লাসটিক, তোমার দিকে'– অনেকটা একই ধরণের নামকরণ। এও কারখানায় তৈরী যৌগ পদার্থ। প্লাসটিকে রয়েছে নানা রঙ। প্লাসটিক পারে —

' ..... লাল নীল বেগুনি সবুজ
রূপালি জাফরান
রঙের বিভাসে বিশ্বপূর্ণ করে দিতে।
যে রঙ পাই নি তুমি এনে দেবে,

যে রঙ দেখি নি তুমি তুড়ি দিয়ে অক্লেশে দেখাবে
এমন আশ্বাস তুমি দিয়ে ছিলে একদা, প্লাসটিক।

কিন্তু প্লাসটিক কবিকে সব রঙের বাহার এনে দিতে পারে নি। দিতে পারে নি গৈরিক রঙ এনে দিতে। তাই প্লাসটিক শুধু খেলা দিয়ে ভোলায়, কেবলমাত্র নর্মসঙ্গী হয়। গৈরিক রঙের মধ্যে যে ত্যাগ আছে সেই ত্যাগের জগত পর্যন্ত যেতে পারে না। ভোগে মগ্ন থাকে ত্যাগের পথে পা বাড়ায় না।

কবিতাতে প্লাসটিক বর্তমান কৃত্রিমতাকে বোঝাচ্ছে। এখানে বাসনার শান্তি হয় না। তবে এই কবিতায় নাগরিক ভাবনার চাইতে মহত্তর কোন বোধই কবির বিশেষ বলার কথা। ভোগবাসনা যে যুগ বৈশিষ্ট্য তাই যেন বলতে চান। 'নিকেল, তোমার জন্য' কবিতায় যেভাবে নগরজীবনের প্রাণহীনতার নিন্দা করা হয়েছে এখানে তা হয় নি। সেদিক থেকে দেখতে গেলে কবিতাটিকে আমাদের বিষয়ভুক্ত করা যায় না। আবার এই যে কৃত্রিমতা তাকে যদি নগরজীবনের দান হিসেবে মেনে নিই তাহলে কবিতাটি আমাদের শ্রেণীভুক্ত হয়ে যায়।

'কিচেন গারডেন' কবিতায় তিনি ফের কোলকাতার মানুষকে বিদ্রূপ করেছেন। সুন্দরের বোধ হারিয়ে এখানকার মানুষ প্রয়োজনকে বেশী গুরুত্ব দিচ্ছে বলে কবি বিদ্রূপ করছেন। প্রত্যেকেই এখন কিচেন গারডেনে সব্জির চাষ করতে ব্যস্ত। সেখানে গোলাপ ফোটা নিঃসন্দেহে অন্যায়।

ফুটছে গোলাপ, তুমি কলকাতার কিচেন গারডেনে
বিলক্ষণ অন্যায় করেছ। তুমি জানো,
এখন খাদ্যের খুব অনটন।

এখন চিচিঙ্গে, লাউ, ঢ্যাঁড়সের উদ্দেশে ধাবিত
জনতাকে ফেরানো যাবে না
অনদিকে।

প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ এখন সৌন্দর্যের কথা ভাবছে না। এখন খাদ্যের কথাই তাদের একমাত্র ভাবার বিষয়। এখন সবাই—

বাতিল কড়াই, গামলা, কাঠের বারকোষে
পালং, বরবটি, শিম, ধানি লঙ্কা
ইত্যাদি বসিয়ে যাচ্ছে।

গোলাপ তো সুন্দরের প্রতীক— সেই সুন্দরের দিকে তাকানোর সময় নেই আর যদিওবা কেউ তাকায় শত চীৎকারে তার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে যায়।

আরে স্বাস কতবড় গোলাপ ফুটেছে।
কে যেন উদ্ভ্রান্ত সুরে বলেছিল, কিন্তু তার ভোটার জোটে নি।

এখন ভোটার শুধু সব্জির দিকে, প্রাথমিক প্রয়োজনের দিকে-তাই সকলেই হিসেব করে চলেছে কত জমি একসঙ্গে চাষ করা যায়। গঙ্গার জেটি, ডক, নির্বাচনী মিটিং, ময়দান অথবা শতবার্ষিকীভবন যেখানেই হোক চাষ করে ফেলার হিসেবটাই বড় কথা। আর এই হিসেবের চিন্তায় মানুষ চার্লিনের তামাশার মত ফুলের বোঁটা সুদ্ধ খেয়ে ফেলেছে।

কলকাতার মানুষের নান্দনিক বোধের প্রতি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ এই কবিতা। 'কিচেন গারডেন' শব্দটিই কবির প্রথম তীর। মানুষ 'গারডেন' তৈরী করছে বাতিল কড়াই, গামলা, কাঠের বারকোষে। বাগান করার এই প্রয়াসের পাশে ফুটন্ত গোলাপের প্রতি অবজ্ঞাও দেখার মত। চ্যাপলিনের ফুল খেয়ে

নেওয়াতে যে ব্যঙ্গ ও হাস্যরসের দিকটি আছে তা তার চরিত্রগত অথচ এদের ফুলের প্রতি এই অবজ্ঞা কিন্তু সেই হাসি মনে এনে দেয় না। চ্যাপলিনের প্রসঙ্গ [১] এনে কবি তাঁর বিদগ্ধ নান্দনিক মনের স্বাক্ষর রেখেছেন কবিতাটিতে।

আগেই বলেছি, সম্পূর্ণ সচেতন ভাবে নম্বর দিয়ে কবিতার সংখ্যা এই গ্রন্থে অল্প— মাত্র তিনটিকে আমরা সেভাবে চিহ্নিত করতে পারি। কিন্তু অন্য কবিতার স্থানে স্থানে তিনি সেরকম দুএকটি পঙক্তির সংযোজন ঘটিয়েছেন যা তাঁর প্রবণতা বুঝতে সাহায্য করে। আবার কখনো বা কবিতা বলতে বলতে তিনি এমন একটি কথার উচ্চারণ করেন যেখানে কবির অন্তর্নিহিত দার্শনিকের দর্শন পেয়ে যাই।

'অমানুষ' কবিতাতে তিনি সেই মানুষদের দেখিয়েছেন যারা আকৃতিতে মানুষ হলেও পূর্বপুরুষদের সংস্কার এখনো ত্যাগ করতে পারে নি। তাই চিড়িয়াখানায় খাঁচায় বন্ধ শিম্পাঞ্জিটি যখন দোলনায় অর্ধমানবের মত কায়দায় দোল খেল না, অথবা কোন খেলা দেখাল না— দর্শকদের হাজারো রকমের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল তখন সেই মানুষ দর্শকেরা তাকে টিটকারী দিল পুরোপুরি 'বাঁদুরে কায়দায়'। এখন এই 'চিড়িয়াখানা' 'শিম্পাঞ্জি' অথবা 'বাঁদর রূপী দর্শক' এরা প্রত্যেকেই শহরের কিন্তু সমগ্র কবিতাটিতে রয়েছে আরো এক গভীর বোধের কথা।

'বাতাসি' কবিতাটি সম্পর্কে কবি তাঁর 'কবিতার দিকে ও অন্যান্য রচনা' গ্রন্থের 'কবিতার দিকে' লেখাটিতে কিছু তথ্য দিয়েছেন —

" মনে হচ্ছে, তখন শেষ হেমন্ত। রাত প্রায় আটটা নটা হবে। বাতাসে অল্প অল্প শীতের আমেজ। ধোঁয়ার সঙ্গে মিশেছে কুয়াশা,

কলকাতার রাস্তা বেশ-একটা রহস্যময় রূপ পেয়েছে। তেত্রিশ নম্বর বাসে আমি দক্ষিণ কলকাতা থেকে শ্যামবাজারের দিকে আসছিলুম। এই পার্ক-সার্কাসের দক্ষিণে এমন একটা রাস্তা দিয়ে আসে, যার পুব দিকে আছে বস্তি এলাকা। বাসের দোতলায়, ডানদিকে জানালার ধারে আমি বসে ছিলুম। সেই সময়ে একটা ব্যাপার ঘটে। জানালা থেকেই আমি দেখতে পাই যে, বাবরি চুল, মিশকালো, মজবুত মার্কা একটি লোক অকস্মাৎ একটি বস্তি বাড়ির ভিতর থেকে 'বাতাসী, বাতাসী' বলে চিৎকার করতে করতে ছুটে বেরিয়ে এল, এবং রাস্তার উপরে এক মুহূর্ত বিভ্রান্ত দাঁড়িয়ে থেকেই আবার ছুটতে ছুটতে পাশের [redacted] আর একটা বস্তিবাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল।'[১০]

'বাতাসি' কবিতার বিষয়বস্তু শহরের নয়, কিন্তু কবিতাটির উৎপত্তি হয়েছে কোলকাতা শহরের কোন একটি না জানা ঘটনার কল্পনা থেকে। হয়তো অনেক কবিতার জন্মই হয়েছে এই শহরের নানা ঘটনা থেকে, কবির অভিজ্ঞতা থেকে কিন্তু এই কবিতাটির বিষয়ে তিনি জানিয়েছেন বলেই আমরা জানতে পারলাম।।

।। ছয় ।।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ 'কলকাতার যীশু' (১৯৬৯ - ডিসেম্বর)-র জন্য কবি বহুল পরিচিতি লাভ করেছেন পাঠকমহলে। অল্প দুএকটি বাংলা কবিতাও যারা পড়েছেন তারাও 'কলকাতার যীশু' কবিতাটি চেনেন। বস্তুত পক্ষেই এই কাব্যগ্রন্থে কবিতার সংখ্যায় নয় — ভাবনার গভীরতায় কবি অনেক পরিণত। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এক গভীর মানবিকতার বোধ। দার্শনিক ভাবনা এখনো রয়েছে কিন্তু মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসাও সেই

সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। বিশেষতঃ নাম কবিতা 'কলকাতার যীশু'তে তিনি এমন এক বোধের পরিচয় দিয়েছেন যা এতাবৎ আলোচিত কবিতাতে নেই। যা হোক সে কবিতার আলোচনা পরে হবে।

'অন্য আকাশের দিকে' কবিতাটি কোলকাতা নিয়ে লেখা হলেও অন্য ধরণের। এতদিন তিনি কোলকাতায় বাস করার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি নিয়ে কবিতা লিখেছেন। তাতে কখনো ভালবাসা, কখনো বিরক্তি, কখনো দুঃখ বোধের কথা ফুটে উঠেছে। কিন্তু তিনি যে কোলকাতায় আছেন তার ধুব স্পষ্ট পরিচয় ফুটে উঠেছে কবিতাগুলিতে। আর এই কবিতাটিতে তিনি জানিয়েছেন দেহগতভাবে কোলকাতায় থেকেও তার মন থাকে কোলকাতার বাইরে। কোলকাতায় থেকেও তাঁর মাঝে মাঝে মনে হয় তিনি আর কোথাও আছেন—

এক এক সময়
ফুটপাথ, বাজার বস্তি ধ্বসে পড়ে
চতুর্দিকে
সমস্ত কঠিন হর্ম্য বাপসা হয়ে দূরে সরে যায়,
মাথার ভিতর রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করে,
পায়ের তলায় মাঠ।

আর সেই সময়ে শহরের বস্তিতায় বাস করে যে কবি ন্যুব্জ হয়ে গেছিলেন তিনিও চান টান হয়ে সোজা দাঁড়াতে। ঘরের মধ্যে মাথা নীচু করে দিন কাটাতে থাকার সময়েও হঠাৎ মনে হয়

হঠাৎ একবার যদি উপরে তাকাই, তবে দেখতে পাব
হাট করা আকাশ।
বাতাসে পাখসাট খেয়ে নিঃসঙ্গ সম্রাট চিল ঊর্ধ্ব থেকে

আরো ঊর্ধ্বে
অন্য আকাশের দিকে চলে যায়।

কবিরও তখন মনে হয় রোদ্দুরে মাথা উঁচু করে গা ডুবিয়ে রোদে ভেসে যেতে।

এখানে যে মানুষ কোলকাতার ফুটপাথ, বাজার বস্তির সমাবেশে বদ্ধ ঘরের অনুচ্চতায় যে মানুষ ন্যুব্জ তারও যে মাঝে মাঝে মানুষের মত বাঁচার ইচ্ছে অন্তরে জাগে তারই ভাষারূপ দেওয়া হয়েছে। এই বদ্ধতা বা অনুচ্চতা কেবলমাত্র শারীরিক নয় মানসিকও। মানুষের অন্তরের ধর্ম যেখানে বিকশিত হওয়া নগর সভ্যতার ধর্ম তাকে চাপা দেওয়া। কিন্তু আকাঙ্খার মৃত্যু নেই— তাই —

কোলকাতায় আছি। তবু মাঝে মনে হয়
আর কোথাও আছি।

ঊর্ধাকাশের উড্ডীয়মান চিল এখানে মূর্তির রূপ ধরে এসেছে। খোলা আকাশ-মাঠকে তিনি কোলকাতার বিপরীতে দাঁড় করিয়েছেন।

'মুষলপর্ব' কবিতাটিতে নগরায়ণ যেভাবে প্রকৃতিকে ধ্বংস করে চলেছে এবং সেই ধ্বংসের কাছে তিনি যে কত অসহায় তাই জানিয়েছেন। মুষলপর্বে অর্জুনের সামনে যদুবংশ ধ্বংস হয়েছিল আত্মঘাতী যুদ্ধে বর্তমান সভ্যতাও উচ্চশিখরে চড়ার দুর্দমনীয় লোভে প্রকৃতিকে ধ্বংস করে চলেছে এই ধ্বংস আত্মধ্বংসেরই নামান্তর।[১১] কবির চোখের সামনেই সেই ধ্বংস হচ্ছে অথচ তিনি অসহায়। আজ-মকাল যে প্রকৃতির মধ্যে বাস করেছেন, যে ফুলের সৌরভ বুক ভরে নিয়েছেন তাদের রক্ষা করার মত উদ্যম কবির ছিল না। তিনি দেখেছেন তাঁর চোখের সামনেই

বাগানগুলি
কাঁটালতায় ছেয়ে গেল।
বিষের ধোঁয়ায় অদৃশ্য হল পাহাড়।
ক্লান্তি অপনোদনের জন্য
বার বার যে স্রোতস্বিনীর কোলে আমি ঝাঁপ দিয়েছি,
আমার চোখের সামনেই
কিঠা নিক্ষিপ্ত হল তার তরঙ্গে।

কবি কিছু বলতে পারেন নি। তিনি অসহায় দেখেছেন মানুষের অমানুষত্ব, পশুত্ব। এখন তিনি ভাবছেন এ হচ্ছে বর্তমান সভ্যতার মুমূর্ষপর্ব — জেন্ত এর ধ্বংসই হবে।

'জমেছে নতুন রঙ্গ' এও বর্তমানের মানুষের দল-নীতি বদলের কবিতা। মানুষ এখন প্রতিদিন বহুরূপীর মতই নিজেকে পাল্টে ফেলে তারই কথা লেখক আমাদের জানাচ্ছেন। কিন্তু এই মানুষেরা শহরের আরো বিশেষ করে বলতে গেলে কোলকাতা শহরের – তাই বলেন —

জমেছে নতুন রঙ্গ, কলকাতায় দর্শকের চোখে
পলক পড়ে না।

এ যেন এক নতুন নাটক যা মঞ্চস্থ হচ্ছে কোলকাতার কোন নাট্যশালায়। এই নাটক এত জমাটি যে দর্শক যারা তারা চোখের পাতা ফেলতে ভুলে যায়। যে নাট্যকার এই নাটক লিখেছেন তিনি 'প্রগতিশীল'ও পুনর্বাসনের আশায় আছেন। এই নাটক পালাবদলের কাহিনী। এতে দেখা যায় —

একজন সাহসী যুবা মুহুর্মুহু পোশাক পালটায়।
একজন বিশ্বস্ত গণতন্ত্রী আজ স্বৈর শাসনের

সমর্থনে বক্তৃতা দেবেন।
একজন প্রেমিক গিয়ে কখনো জমায় গল্প ব্যাঙের সমাজে
কখনো সাপের মুখে চুমো খায়।
একজন বক্তৃতা ভাঁড় মনস্ত্রীর ভূমিকায় মঞ্চে নেমেছেন।

শুধু মাত্র এতেই শেষ নয় এখন কুকুর চেঁচাতে চায় সিংহের গর্জনে। আদর্শবাদী অন্ধকারে গা ঢেকে চলেন অন্য শিবিরে। প্রেমিকা চলে অন্যের সন্ধানে। আর রাজনীতির পাণ্ডারা জ্যোতিষ সেজে বলে উঠেন —'আমার দাদার রাজ্যে কখনকালেও কেউ অন্যায় করেনি।" নিতান্ত সদ্যময় ভঙ্গীতে যে কথা উচ্চারণ করলেন তা আজকালকার রাজনীতি ও সমাজনীতির সাদা কথা। এই নাট্যমঞ্চ এখন কোলকাতার সীমা ছাড়িয়ে দেশ জুড়ে বসেছে। এর অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিল শহরে। সাহসীর ছদ্মবেশে ভীরু, গণতন্ত্রীয় বেশে স্বৈরতন্ত্রী, প্রেমিকের রূপে অপ্রেমিক এই কোলকাতা শহর জুড়ে বসেছে— নতুন রঙ্গ জমে উঠেছে এখানে। তীক্ষ্ণ তীর্যক ব্যঙ্গে শহরের মানুষের পোষাক পালটানোর মত দল ও নীতি বদলের কথা কবি জানিয়েছেন।

'কলকাতার যিশু' নীরেনবাবুর শ্রেষ্ঠ কবিতার একটি সমস্ত নগ্নতা, কুশ্রীতার ওপরে মানবিকতার এক আশ্চর্য পদ্ম তিনি এখানে ফুটিয়েছেন। আর মানবিকতার এই জয় ঘোষিত হয়েছে এই কোলকাতা শহরেই।

লালবাতির নিষেধ না থাকা সত্ত্বেও অতর্কিতে কোলকাতা শহর তার প্রচণ্ড গতিবেগ সংহত করে দাঁড়িয়েছে। ট্যাকসি, প্রাইভেট গাড়ি, টেম্পো ও ডাবলডেকার, ছুটে আসা ঝাঁকা মুটে আর ফিরিওয়ালা, দোকানি ও খরিদ্দার সবাই ছবির মত স্থির হয়ে গেল— স্বাই দেখল —

টালমাটাল পায়ে
রাস্তার একপার থেকে অন্যপারে হেঁটে চলে যায়
সম্পূর্ণ উলঙ্গ একটি শিশু—

স্টেট বাসের জানালায় মুখ রেখে কবিও দেখেন-ভিখারীর শিশুটি রূপ নিয়েছে মূর্ত মানবিকতার— তাই দুদিকে উদ্যত মৃত্যুকে পরোয়া না করে সে টলতে টলতে হেঁটে চলে যায়। তার সরল, মৃত্যু-ভয়হীন রূপ স্তব্ধ করে দেয় অসহিষ্ণু ড্রাইভারের গতিবেগ।

দুদিকে উদ্যত মৃত্যু, তুমি তার মাঝখান দিয়ে
টলতে টলতে হেঁটে যাও।
যেন মূর্ত মানবতা, সদ্য হাঁটতে শেখার আনন্দে
সমস্ত বিশ্বকে তুমি পেতে চাও
হাতের মুঠোয়। যেন তাই
টালমাটাল পায়ে তুমি
পৃথিবীর এক কিনারা থেকে অন্য কিনারে চলেছ।

বিষয়ের অনন্যতায় এই কবিতাটি কবির আর সকল কবিতাকে ছাপিয়ে উঠেছে নিঃসন্দেহে। সেই সঙ্গে এটাও দেখতে হবে এই ছোট্ট শিশুটি কলকাতার। কলকাতারই একটি ব্যস্ততম পথকে শিশুটি খামিয়ে দিয়েছে। চৌরঙ্গী-পাড়ার পথের যে বিবরণ দিচ্ছেন-ট্যাকসি, টেম্পো, বাঘমার্কা ডবলডেকার, ঝাঁকামুটে, দোকানী ইত্যাদি নিয়ে পরিচিত পথটি ছবির মত ফুটে উঠেছে। অসহিষ্ণু ড্রাইভারের দাঁতের ঘষটানিটুকুও কবির সতর্ক কান এড়িয়ে যায় না।

মানুষ, যান আর ভিখারীর ভিড়ে ভারাক্রান্ত এই শহর। পথে চলার সময় পথচারী, গাড়ি চালানোর সময়ে ড্রাইভার সকলেই বিরক্ত। তবুও এখানকার সতর্ক ড্রাইভার অতর্কিতে গাড়ি থামায়, লোকজন 'গেল, গেল'

রবে ছুটে আসে একটি শিশুর চাপা পড়ার সম্ভাবনায়— হোক না সে ভিখারী মায়ের শিশু— তবুও মানব শিশু। মানুষের প্রতি এই সম্ভ্রম কোলকাতার মানুষের মনে কবি যেন নতুন করে জাগিয়ে তুলেছেন এই কবিতায়। আর মানবতার যাত্রারম্ভের প্রথম সূচনাও পৃথিবীর এই কিনারে।

কবিতাটিতে যেসব ছবি শব্দের মাধ্যমে এঁকেছেন তাও যথাযথ —'ঝড়ের বেগে ধাবমান কোলকাতা শহর,' রাস্তার দুদিক থেকে ছুটে আসা মানুষেরা হঠাৎ 'স্থির চিত্রটির মত শিল্পীর ইজেলে নগ্ন হয়ে' যাওয়া অথবা বৃষ্টির পরে 'রোদ্দুরে ফের অতিদীর্ঘ বলুয়ের মত মেঘের হৃৎপিণ্ড ফুঁড়ে নেমে এসে' মায়াবী আলোয় কোলকাতাকে ভাসানো এই সব চিত্রকল্পগুলি যথাযথ ও সুন্দর। পঙক্তি পাঠের সঙ্গে সঙ্গেই ছবিও মনে ভাসে।

'কলকাতার যিশু' কাব্যগ্রন্থের আরো কিছু কবিতায় তিনি প্রাসঙ্গিকভাবে নগরের রূপ ফুটিয়েছেন। কিন্তু তার পেছনে কবির কোন সচেতন মানসিকতা কাজ করেছে বলে মনে হয় না। প্রতিদিনের অভ্যাসে তিনি যা দেখেছেন তারই বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন 'বাড়ি খুঁজতে বহুক্ষণ' কবিতাটিতে রাস্তার দুদিকে চোখ রেখে হাঁটতে হাঁটতে তিনি দেখেন, —'একতলা, দোতলা থেকে লাফে লাফে তিনতলায় উঠে যাচ্ছে বহু ঘরবাড়ি' কিংবা তিনি দেখছেন উদ্যান কিংবা বাতিস্তম্ভ, ট্র্যাফিক আইল্যানড'— এই দৃশ্যপট নগরের। 'আমি যতবার' কবিতায় তিনি দেখতে যেতে চাইছেন —

শহরময় ছড়ানো আমার
তানুক তন্ত্রিনগুলিকে।

কিন্তু ঘর থেকে বেরুনোর চেষ্টা করলেই কোথা থেকে ষণ্ডামার্কা কতগুলো জোয়ান এসে তার 'পথ খরচা, ট্রামের মানথলি' ইত্যাদি সব ছিনিয়ে নিচ্ছে। এই কবিতায় শহরের কথা, ট্রামের মানথলি শহরের প্রসঙ্গ। কিন্তু এর পেছনে কবির কোন সচেতন মন নেই— নিতান্ত বলার অভ্যাসে বলা বলেই এসব প্রসঙ্গ কোন দ্বিতীয় অর্থ নিয়ে উপস্থিত হয় না॥

॥ সাত ॥

'উলঙ্গ রাজা' নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ষষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ, প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭১ খৃষ্টাব্দ। উলঙ্গ রাজা থেকে আরো স্পষ্ট ভাবে বললে 'কলকাতার যীশু' থেকেই তাঁর কবিতার মধ্যে নূতন এক সুর যুক্ত হয়েছে। কবি হিসাবে এই সমাজ ও তার মানুষের প্রতি নীরেনবাবুর দৃষ্টি গভীর হয়েছে। শুধু সমাজ নয় বর্তমানের অস্থির সময়ের দিকেও কবির নজর পড়েছে। নাগরিক কবিতা বলতে যা বোঝায় তা হয়তো এই কাব্যগ্রন্থে নেই কিন্তু এই যে সমাজ ও সময়ের প্রতি কবির সচেতনতা তাইতো নাগরিক চেতনাকে চেনায়।

'কোন দিকে ফিরাবে চক্ষু' নামে প্রথমেই যে কবিতাটি রয়েছে তাতে অস্থির সময়ের কথা ধরা রয়েছে। এখন আমরা এমন এক সময়ে বসবাস করছি যখন প্রত্যেক মানুষের হাত রক্তে কলঙ্কিত — যখন প্রত্যেকটি মানুষ দুঃস্বপ্ন তাড়িত। এখন "যোছে না দুঃস্বপ্নগুলি, না শহরে না গ্রামে কিংবা অন্যত্র কোথাও।" সময়ের এই ঘৃণপোকা শুধু মাত্র শহরে নয় গ্রামে গঞ্জেও ছড়িয়ে পড়েছে আর সেজন্যই মানুষের 'চিত্ত কোনখানে গিয়ে রক্তহীন বিশ্রাম পায় না'।

কবিতাটিতে নগরচেতনার কথা কোথাও বলা হয় নি – বলা হয়েছে অসুস্থ সময়ের কথা কিন্তু কবি একথা জানাচ্ছেন যে এই অসুস্থতা কেবলমাত্র নগরের নয় তা এখন সর্বব্যাপ্ত।

পরের কবিতা 'লক্ষণ বিচার'– এতেও অসুস্থ সময়ের কথা আছে কিছুটা তীর্যক ব্যঙ্গে। ছোট ছেলেটির নাড়ি টিপে, জিভ টেনে বুকের শব্দ শুনেও ডাক্তার বুঝতে পারছেন না যে লক্ষণ তিনি পাচ্ছেন তা রোগের না অসুখের। তাই তিনি চিকিৎসাই বন্ধ রাখলেন। রাস্তায় এসে কবি দেখেন কোথায় কোন্ গোলমালে বাস ট্রাম বন্ধ

বাতাসে অ্যামোনিয়ার ঝাঁঝালো গন্ধ,
কাছে কোথাও আচমকা একটা পটকা ফাটতেই
কটাকট কটাকট তার জবাব পাওয়া গেল।
বলল্ম 'লক্ষণ ভাল নয়'।
ছেলে বলল্,
'রোগের না ওষুধের সেইটেই ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।'

এখানেও অশান্ত সময়ের কথা রয়েছে যে সময়ের লক্ষণ দেখে বোঝা যায় না কি হতে চলেছে। এই অশান্ত সময় দূরনির্ণেয় রোগের মত। এখনকার সময় যে ভাল নয় তা বোঝে একটি শিশুও।

'উলঙ্গরাজা' নীরেন চক্রবর্তীর বিশিষ্ট কবিতার একটি। এই কবিতার নামে কাব্যগ্রন্থের নামকরণও হয়েছে। কবিতাটিতে তিনি ব্যবহার করেছেন একটি লোককথা মূলক গল্প। নির্বোধ রাজা উলঙ্গ হয়ে পথে নেমেছে। ধামাধরা তাঁবেদাররা রাজবস্ত্রের সূক্ষ্মতা নিয়ে উচ্চস্বরে বলাবলি করছে। হঠাৎ ভীড় ঠেলে

এগিয়ে এলো একটি শিশু—যে সরল আর পবিত্র-হাততালি দিয়ে হেসে উঠে বলল —'রাজা তোর কাপড় কোথায় ?'

কবি বলছেন এই গল্পটা সবাই জানে, যেখানে গল্পের ভিতর প্রশস্তিবচন বলা স্তাবকমাত্র ছিল না —'একটি শিশুও ছিল। সত্যবাদী, সরল সাহসী একটি শিশু।'

কিন্তু আজ গল্পের রাজা আর গল্পে মাত্র নেই — এখন —

নেমেছে গল্পের রাজা বাস্তবের প্রকাশ্য রাস্তায়।
আবার হাততালি উঠছে মুহুর্মুহু,
জমে উঠছে
স্তাবকবৃন্দের ভিড়।
কিন্তু সেই শিশুকে আমি
ভিড়ের ভিতর আজ কোথাও দেখছিনা।

অথচ আজ শিশুটিকে বড় প্রয়োজন। কিন্তু আজকের রাজাদের চারপাশে ভিড় কেবলই স্তাবকের। মিথ্যাকে সত্য বলে যারা নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নেয়। তাই তিনি সত্যবাদী শিশুটিকে খুঁজছেন — তাকে কি লুকিয়ে রাখা হয়েছে ? না কি সে ঘুমিয়ে আছে ? তাকে খুঁজে আনা ভীষণ দরকার —

যাও তাকে যেমন করেই হোক
খুঁজে আনো।
সে এসে একবার এই উলঙ্গ রাজার সামনে
নির্ভয়ে দাঁড়াক।

সে এসে একবার এই হাততালির ঊর্ধে গলা তুলে
জিজ্ঞাসা করুক,
'রাজা, তোর কাপড় কোথায় ?

আজকের যারা রাজা, ক্ষমতাবান— তাদের ঘিরে আছে স্তাবকেরা সত্যকথা বলার মতন সাহস কারো নেই। তাই আজ দরকার নির্মল চিত্তের একটি শিশুর। যে রাজার চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবে তার নির্লজ্জতা ও নির্বুদ্ধিতাকে। বর্তমান যুগে এই রকম একটি শিশুর বড় প্রয়োজন।

এই কবিতায় শিশু সরলতা ও সাহসিকতার প্রতীক হয়ে আছে। 'কলকাতার যীশু'তে শিশু ছিল মানবতার প্রতীক। এখানে সে সত্যদ্রুটার স্থানটি নিয়েছে।

কবিতাটিতে শহরের কথা নেই কিন্তু তবু এটি নাগরিক। লোককথাকে যেভাবে যুগের প্রেক্ষিতে বসানো হয়েছে তাতে বোঝা যায় কবির নাগরিক বৈদগ্ধ রয়েছে।

'কলঘরে চিনের কান্না' কবিতাটিতে রয়েছে দনবশ মানুষের হাতে মহৎ মানুষের মৃত্যুর কথা। বলা হয়েছে রূপকের মাধ্যমে।

গগন বিহারী চিনপাখির দীপ্ত দুপুরে সম্রাটের মত ঊর্ধাকাশে সাঁতার কাটার সময় হঠাৎ গৃহস্থ বাড়ীর আঙিনায় উল্কার মত ছিটকে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে কাকের মেলা বসে গেল ছাতে। চিনটি এখনো মরে নি সে প্রাণপণে চেষ্টা করছিল আবার আকাশে ওড়ার, কখনো ঘৃণাভরে তার শত্রুদের দেখছিল।

গগন বিহারী চিল। যারা ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না, আর
পারে না বলেই যারা
পৃথিবীর
ভাগাড়ে ও আস্তাকুঁড়ে কাপুরুষ মস্তানের মতো
দঙ্গল পাকিয়ে ঘুরে বেড়ায়, তাদের
হাতে কি কখনো আমি ঊর্ধ্বচারী মানুষের
লাঞ্ছনা দেখিনি ?
দেখেছি অসংখ্যবার। বুঝেছি যে লাঞ্ছনাই স্বাভাবিক
এমন কী লাঞ্ছনা আর নিগ্রহের ফলে
মানুষের দীপ্তি ও মহিমা আরও বেড়ে যায়।

তবু তিনি চিলটিকে লাঞ্ছনার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য কলঘরে, শহরতলীর 'ছয় বাই তিন ফুট' কলঘরে বন্ধ করে রাখলেন। এক লাঞ্ছনা থেকে তিনি অন্যতর, হয়তো আরো নিষ্ঠুর লাঞ্ছনায় চিলটিকে বন্ধ করলেন। কলঘরের অন্ধকারে বন্ধ থেকে চিলটি সারারাত ঝাপটা মেরেছে দরজায়, নখ দিয়ে আঁচড়েছে মেঝে —

সারারাত
আপন সাম্রাজ্য থেকে নির্বাসিত, বিচ্যুত হবার
অপমানে, গ্লানিতে ও যন্ত্রনায়
চিৎকার করেছ।

সকালে মুক্তি দেবার জন্য দরজা খুলে দেখলেন চিলটি স্থির ও নিঃশব্দ হয়ে পড়ে আছে। কবির মনে হল —

তুমি পাখি নও, অফুরন্ত আকাশের প্রাণমূর্তি, যেন
সমস্ত আকাশ আজ
নিতান্ত ছাপোষা এক গৃহস্থের
কলঘরের ক্ষিন্ন অন্ধকারে
মরে পড়ে আছে।

এখানে চিল মুক্ত আকাশের প্রতিমূর্তি অথবা চিল তার ঊর্ধ্বাকাশে বিহারের সূত্র ধরে ঊর্ধ্বচারী মানুষ। এই সব ঊর্ধ্বচারী মানুষের অপমান করে তারা, যারা উপরে উঠতে পারে না সেই সব আস্তাকুঁড়ের মস্তানরা। কিন্তু লাঞ্ছনা আর অপমান এত স্বাভাবিক যে এতে এই মহিমময় মানুষের মহিমা ম্লান হয় না— আরো উজ্জ্বল হয়। বরং এই মহিমাকে রক্ষা করার ছলে তাকে গণ্ডীবদ্ধ করলে তার অপমানের মাত্রা বাড়ে এমন কি তার মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

এখানে ঊর্ধ্বচারী মানুষকে চিলের সঙ্গে তুলনা করেছেন, চিলের নিঃসঙ্গ একক ওড়ার সঙ্গে এই তুলনা যথাযথ হয়েছে।

কবিতাটিতে চিলটি আহত হয়ে পড়ে শহরতলীর বাড়িতে। কিন্তু শহরতলী এখানে নিতান্ত অভ্যাসের বশে বলা। শহর নয় মানুষের হাতে মহতের অপমানই বড় কথা বা বলার কথা।

'কবিতা ৭৪' কবিতা নিয়ে লেখা কবিতা। কিন্তু কবিতাটির মধ্যে রয়েছে কবির একটি স্বীকারোক্তি। তিনি জানাচ্ছেন কবিতায় তিনি বার বার নিজেকে পালটান। কখনো বদল করেন স্থানের কখনো বা ভাবের। কখনো চলে যান সুতানুটি গোবিন্দপুরের প্রাচীনতায়, কখনো সরে যান ময়দানের সবুজ থেকে। কোন কবিতায় ঝরে পরে আক্রোশ, কোনটায় প্রেম বিষফুলের মত

ফুটে ওঠে, কোন কবিতা হয়ে যায় নিয়তির কণ্ঠস্বর। তারপরেই বলেছেন —

কয়েকটি দিনের জন্য ফসুল বাংলায় সফর
সেরে নিয়ে
কবিতা আবার এই নগরের কেন্দ্রে ফিরে আসে।

এই পঙক্তি কটি কবির স্বীকারোক্তি। তিনি নগরকেন্দ্রিক কবিতা বেশী লেখেন নি— কিন্তু বার বার অন্য কবিতার ফাঁকে তিনি তা লিখেছেন। কখনো বিষয়ে কখনো শব্দ ব্যবহারে কখনো বা রূপকল্প ব্যবহারে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি এই নগরের মানুষ।

'তোমাকে কলকাতা' কবিতাতেও রয়েছে তাঁর কোলকাতা প্রীতির খবর। এই শহরকে তিনি ভালবাসেন। এই ভালবাসার পেছনে কোন কারণ নেই। কেবলমাত্র ভালবাসার জন্যই এই ভালবাসা। ভালবাসায় হৃদয় যখন পূর্ণ তখনও তিনি খবরটি গোপন করে ছিলেন। ভালবাসাকে প্রকাশিত হতে না দেওয়ার প্রবণতা ও নাগরিক প্রবণতা।

বুকের মধ্যে খাঁ খাঁ করছে প্রচণ্ড পিপাসা।
অথচ কলঘরে
জল পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায় ফোঁটায়।
অন্দরে তোর সুন্দর তোলে মাথা,
হায় রে কলকাতা,
দুধের বিন্দু শুকিয়ে আছে বুকের শুকনো বোঁটায়।

পিপাসা আর জলের সুলভতা যেমন মাঝে মাঝে এখানে দেখা যায় তেমনি হয়েছে কোলকাতার প্রতি তাঁর ভালবাসার প্রকাশে। তিনি দূরে যান, আবার কাছে আসেন

এ ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু নয়— আর তাই তিনি এত দিন গোপন করেছেন। তিনি লিপস্টিক হয়ে 'বিষন্নকলঘরে' ঘুরে বেড়ান। কবির এই তৃষ্ণা ভালবাসার। কলঘরে ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়ার' যে ছবিটি তিনি এঁকেছেন তা একজন নাগরিক। ইচ্ছা আর ইচ্ছাপূরণের মধ্যে যে সম্যক ব্যবধান রয়েছে তাই তিনি বুঝিয়েছেন এখানে।

'হ্যালো দমদম' কবিতার নামটিই বুঝিয়ে দেয় এই শহরের কবিতা। গল্প বলা ভঙ্গীতে তিনি জানান হাতে টেলিফোন আর পায়ের কাছে খেলা করছে সূর্যমণি মাছেরা—এই অবস্থায় তিনি দমদম থানায় পাঁচ মিনিট পরপর ফোন করে যাচ্ছেন। পিচ বাঁধানো সড়কের ওপর দিয়ে নৌকা বেয়ে তিনি ডাঙ্গায় যেতে চান। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বন্যায় ভেসেছে চারিদিক।

আমার মাথার উপর জ্বলছে নিয়ন বাতি,
আর আমার গোড়ালির চারপাশে চক্কর মেরে
হাঁটুর কাছে উঠে আসছে
মোহেনজোদড়োর নর্দমা থেকে উপচেপড়া
নোংরা কালো জলস্রোত।
আমার দেওয়ালে ফুটেছে সাইকেডেলিক ছবি।
সেই ছবির দিকে তাকিয়ে আমি ভাবতে থাকি যে,
আমার জুঁইলতা এখন
পাঁচফুট জলের তলায় ফুল ফোটাচ্ছে।

কিন্তু বেশী ভাবনার সময় নেই। শোবার ঘরে তাঁর মেয়ের গা জ্বরে পুড়ছে — তাই দমদম থানা থেকে প্রতিশ্রুত 'রেসকু বোটের' জন্য তিনি ফোন করেন 'হ্যালো দমদম' বলে। জল ঠেলে তিনি পাশের ঘরে যান মেয়ের 'টেম্পারেচার' দেখতে আর এই ফাঁকে দরজা খোলা পেয়ে ঘরে ঢোকে রাজ্যের কচুরিপানা ও একটি

'নেড়িকুত্তা'। তিনি কিন্তু এতে বিস্মিত বা বিরক্ত হননা।

কচুরিপানার ফুলগুলিকে আমি ফ্লাওয়ারভাসে সাজিয়ে রাখি,
এবং নেড়িকুত্তাটিকে খুব যত্ন করে আমার
সোফার উপরে বসাই।
তারপর টেলিফোনের মাউথপিসটাকে
তার মুখের কাছে এগিয়ে দিয়ে বলি,
যদি বাঁচতে চাস হারামজাদা,
তাহলে আয় আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বল্
হ্যালো দয়দয়... হ্যালো দয়দয়-হ্যালো....

কবিতাটিতে দুটি বিষয় এক-জলমগ্ন এই কলকাতা শহর। শহরের সড়কের ওপর দিয়ে নৌকা চলছে, উঠে আসছে নোংরা নর্দমার জল— সেই জলে খেলা করছে মাছেরা, ঘরে ভেসে আসছে কচুরীপানা। একই সঙ্গে অসুন্দর ও সুন্দর ছবি আর তা কবির প্রিয় শহরের।

দুই পৃথিবীর সব কিছুর ওপর ব্যাপ্ত কবির ভালবাসা। অসুস্থ মেয়ের জন্য যেমন তাঁর মমতা রয়েছে, তেমনি ভাবছেন জলের নীচে চাপাপড়া তাঁর জুঁই ফুলের কথা, আবার তুচ্ছ পানার ফুল তিনি সাজাচ্ছেন ফ্লাওয়ার ভাসে— সেই সঙ্গে সাঁতারে আসা নেড়ি কুকুরটিকেও সমাদরে সোফায় বসাচ্ছেন। এই বৃষ্টি জলে তিনি তাকে দূর করে দেন না।

আরো একটি জিনিস তিনি আমাদের শেখাচ্ছেন— তা হল বাঁচতে হলে নিজেকে জানান দিতে হবে। কুকুরটিকে ভালবাসার গান শেখে বলেছেন 'বাঁচতে হলে আমার সাথে গলা মেলা।'

ভালবাসার যে গাঢ় অনুভব তাই কবিকে এখানে বিশিষ্ট করেছে। এই ভালবাসা কেবলমাত্র মানুষ নয়— পৃথিবীর সকল কিছুর ওপরে রয়েছে। এই বোধ একান্তই নাগরিক মননের বোধ।

॥ আট ॥

আমরা সাতের দশক পর্যন্ত আমাদের আলোচনার পরিসর নির্দেশ করেছি। সেই হিসাবে 'উলঙ্গ রাজা' যা ১৯৭১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল তার আলোচনা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে করেছি। কিন্তু এই কবি এখনো সৃষ্টিশীল এবং নগরমনস্কতা তাঁর পরবর্তী কবিতাতে কিভাবে কাজ করেছে তার পর্যালোচনা দরকার। কারণ একজন কবির মনোলোকের পরিচয় সময়ের সীমায় বেঁধে দেওয়া যায় না— বিশেষত যিনি সমান সৃষ্টিশীল। তাই নগরকেন্দ্রিক কবিতা যা পরবর্তী সময়ে লেখা হয়েছে তারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা এটি।

'খোলামুঠি'— ১৯৭৪-এ প্রকাশিত হয়। এই বইটির কিছু কবিতায় আমরা কবির নাগরিক মনটির উপস্থিতি স্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য করতে পারি। 'এ কেমন বিদ্যাসাগর' 'বকুল, বকুল, বকুল' 'ধাক্কা এবং 'কায় সেপটেম্বর'।

'এ কেমন বিদ্যাসাগর'- এ শৈশব কৈশোরের সঙ্গে যৌবনের দিনগুলিকে তিনি মেলাতে পারছেন না। 'ফ্রুটপুঁটি'কে যানায় গাঁথার চেষ্টা করেন কিন্তু পারেন না। হেমচন্দ্র বা বিদ্যাসাগরকে এখন আর তিনি আলাদা করে চিনে উঠতে পারেন না। তাই তিনি অনুভব করছেন —

অতীতের সঙ্গে সম্পর্কহীন
বর্তমানের এই কবন্ধ কলকাতাই আমার নিয়তি,
যেখানে
'কবিতীর্থ' বলতে কোন কবির কথা কারো মনে পড়ে না,
এবং 'বিদ্যাসাগর' বলতে
তেজস্বী কোন মানুষের মুখচ্ছবির বদলে
ইসকুল, কলেজ, থানা, বস্তি
অটোনিকা, খাটাল, পোসটার ও পয়ঃপ্রণালী সহ
আস্ত একটি নির্বাচন কেন্দ্র
আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

প্রসঙ্গতঃ মনে রাখতে হবে 'কবিতীর্থ' এবং 'বিদ্যাসাগর' কোলকাতার দুটি নির্বাচনকেন্দ্র (ইলেকটোরাল কনসিটুয়েন্সি)। এই দুই নামের এই পরিবর্তন কবিকে আকর্ষ করেছিল নিঃসন্দেহে। তাসত্ত্বেও তিনি এও অনুভব করেছিলেন এই অসম্পূর্ণ, ভুলে ভরা অসঙ্গত কোলকাতাই তাঁর নিয়তি। একে অতিক্রম করে যাবার সাধ্য তাঁর নেই। নিয়তি বলে স্বীকার করছেন।

'বকুল, বকুল, বকুল' কবিতাটি দূর সময়ের কোন মিষ্টি ভালবাসার কবিতা। অবেলায় যখন 'সামনে রিফুকর্ম চলছে, 'পিছন দিকে রাস্তা বন্ধ'— সেই সময়ে কবির বকুলের কথা মনে হয়েছে। এই অবেলার বকুল ঝরে এই শহরেও —

এই অবেলায় বকুল ঝরে
শ্যামবাজারে, ধর্মতলা

এই স্থান দুটি কোলকাতা শহরের পরিচিত স্থান। তাছাড়া রাস্তাবন্ধ আর রিফুকর্ম ও এই শহরে যখন তখন দেখা যায়। কবি শ্যামবাজার - ধর্মতলায়ও

বকুল পেয়ে যাচ্ছেন— অবেলায় এবং অস্থানে। বরং এই কনট্রাস্টে তাঁর আধুনিক কাব্যোপলব্ধির সৌন্দর্য ধ্যানের কিছু তৃপ্তি।

'ধাক্কা' কবিতাটিতে নগরের পরিচয়জ্ঞাপক কোনো শব্দ নেই, স্থানেরও উল্লেখ নেই তবু এটিকে এই পর্যায়ের ধরা হয়েছে কিছু শব্দ ব্যবহারের জন্য— যা কোলকাতার পথে ঘাটে মাঝে মধ্যেই শুনতে পাওয়া যায় —

হঠাৎ একটা ধাক্কা লেগে গেছে,
তার জন্য অত মেজাজ দেখাচ্ছেন কেন ?
কেউ কি কাউকে ইচ্ছে করে ধাক্কা মারে ?

এই ধরণের সংলাপ কোলকাতার রাস্তায় প্রায় সময়ই শোনা যায়। কবি পথের সংলাপকে তাঁর কবিতায় ঢুকিয়ে দিয়ে প্রমাণ রাখছেন তিনি নগরের কবি।

'কামসেপটেমবর' নগরের কবিতা তবে তা স্বদেশের নয়। 'কনেটিকাট অ্যাভিনিউ' বা 'কাফেটেরিয়ার কথাগুলি নগরের। 'কামসেপটেমবর' গান বা 'চতুর্দিকে কালো মানুষের ভিড়' ও বোঝায় তা কোন বিদেশী শহরের

'কবিতার বদলে কবিতা'— ১৯৭৬-এ প্রকাশিত। এখানেও চারটি কবিতায় কবির নাগরিক মনের স্পষ্ট স্বাক্ষর রয়েছে। 'শ্যামবাজারে' 'যখন কুয়াশা, 'কালোপানক,' 'এই যেমন' কবিতাগুলিতে তিনি সেই পরিচয় রেখেছেন।

'শ্যামবাজার' কবিতার বিষয়বস্তু যাইহোক শ্যামবাজারের গলিতে ছেলেগুলি মিলিয়ে গেছে বলতে আমাদের চোখের সামনে একটি বিশেষ

স্থানের দৃশ্য ভেসে ওঠে সেই দৃশ্য এই শহরের।

'যখন কুয়াশা'— কবিতায় 'পা টিপে টিপে এগোচ্ছে মন্থটুক' বা 'বিমানবন্দরের নাউডস্পিকার'– এই পঙক্তি বা শব্দই কবিতাটির নাগরিক অবস্থান বোঝায়।

'কালো পালক' কবিতায় তিনি স্পষ্ট করেই কোলকাতার কথা বলছেন।

এই রকমই হয়।
ধান ছড়ালে ধান হয় না, ভাত ছড়ালে কাকের চিৎকার
কলকাতার চটকা ভেঙে যায়।
হাজার শিশকালো ডানা আকাশে, উঠোনে, বারান্দায়
মুহুর্মুহু ঝাপটা মারে।
যাকে লক্ষ্য বলে জানো, অকস্মাৎ তারই পরাজয়
স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কোলকাতায় ধান থেকে নতুন ধান ওঠে না হয়তো এই শহরের প্রাণহীনতা বোঝাতে চাইছেন। এখানে পাখি বলতে কালো কাক। আর লক্ষ্যেও পৌঁছানো যায় না শহরে।

তারপর আবার বলেছেন ভিখারি ভিক্ষা চায় কিন্তু ভিক্ষা এখানে নেই।

ভিক্ষা থাকে দূর
ফসলে, গাঁয়ে, তাই তুমি তো পারো না ভিক্ষা দিতে।
বরং যেজন্য তুমি নিজেও সমূহ কাড়াকাড়ি
করে থাকো, তাই দাও, এক্ষুণি দুটি পয়সা ফেলে দাও।

'ভিক্ষা' তাঁর কাছে পয়সা দেওয়া নয় — ভিক্ষা আর ভালবাসা তাঁর কাছে এক। (নিকেন তোমার জন্য কবিতায়ও তাই বলেছেন)। গাঁয়ের মানুষ যখন ভিক্ষা দেয় তখন তাতে ভালবাসা আর করুণার উত্তাপ মেশায়— শহরের মানুষ দেয় দয়া করে, বিরক্তির সাথে। এই ভালবাসার বাসা তাই শহরে নয়, গাঁয়ে। এখানে গ্রামের বিপরীত শহরকে রেখে কবি তাঁর পরিচয়কে আরো দৃঢ় করেছেন।

'এই যেমন' কবিতাটিও নগর জীবনের ছাপ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

কালকেও এখানে জোর জলসা জমেছিল,
আজ নিঝুম পাড়া।
দেখে মনে হচ্ছে যেন মাংস দম- এ ছিল
প্লেগার কুকারে, দিব্যি শোঁশোঁ
উঠছিল আওয়াজ,
কিন্তু কী যে কাণ্ড, সব হিসেবি আন্দাজ
ফাঁসিয়ে ইস্টিম গেছে বুনে।

হঠাৎ নিঝুম হয়ে যাওয়া পাড়া বোঝানোর জন্য যে তুলনা অর্থাৎ কুকারে দমে বসানো মাংসের স্টিম বুনে যাওয়া তা একান্তই নাগরিক।

'আজ সকালে'— ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত। মোট তিনটি কবিতায় নগরজীবনের প্রসঙ্গ আসছে।

'সাদাকালো — ১'— কবিতাটিতে কিছু শব্দ নগরজীবনকে চিহ্নিত করে। ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার, স্টল, কালোবাজার, সাদাবাজার ইত্যাদি শব্দ শহরেই বেশী প্রচলিত। অবশ্য গ্রামে গঞ্জেও তা একান্ত দুর্লভ নয়।

'কাঞ্চন আবার' কবিতায় তিনি কোলকাতা বা শহরের উল্লেখ করেছেন স্পষ্টাক্ষরে —

দশ বারো মাইল দূরে কলকাতা শহর
আকাশকে সন্ধ্যা থেকে মুহুর্মুহু চোখ রাঙাতে থাকে,

অথবা,

বিদ্যুতের ভাঁড়ে মা ভবানী।
গ্রামেও যাচ্ছে না আলো, শহরেও নিবেছে রোশনাই

'কালো অ্যাম্বাসাডা'র কবিতাটি কোলকাতায় কয়েকটি ডাকাতিতে ব্যবহৃত কালো অ্যাম্বাসাডার নিয়ে লেখা।[১২] অবশ্য কবিতাটিতে সেই ডাকাতির উল্লেখ নেই। কিন্তু

ল অ্যান্ড অর্ডার চাই সেইটেই এখন
সবচেয়ে জরুরি।

পঙক্তিটি সেই ঘটনাকে বোঝাচ্ছে। কবিতায় ব্যবহৃত খুন দাঙ্গা, রাহাজানি, রাষ্ট্রনীতি ইমার্জেন্সি, অন্ন চাই, বস্ত্র চাই ইত্যাদি শব্দাবলী কবিতাটির নাগরিকত্ব প্রমাণ করে।

'পাগলা ঘন্টি' — ১৯৮১তে প্রকাশিত। এখানে বেশ কিছু কবিতায় নগর জীবনের ছাপ রয়েছে।

পেঁচি নামক কবিতায় —

এই শহরে যাতনামিও বিক্রি করা যায়।
অথবা, কে যাতনামি বিক্রি করবে এসো। ইদানিং
যাতনামি প্রতিভা বলে গণ্য হচ্ছে কলকাতা শহরে।

শহর বিশেষত: কোলকাতাই এখানে কবির ব্যঙ্গের লক্ষ্য।

'পাগলা ঘন্টি' কবিতায় কিন্তু আর সেই ব্যঙ্গ নেই বরং তিনি এখানে তাঁর শহরকে পরিমার্জিত করতে চাইবেন, সুন্দর করতে চাইলেন —

চলো, কলকাতায় যাই
পাতালরেলের জন্য মাটি খুঁড়ি, সুড়ঙ্গ বানাই,
রাস্তা করি চওড়া, তাতে ছাড়ি
আরো পাঁচশো বাঘমার্কা দোতলা হাওয়া গাড়ি,
পরিচ্ছন্ন করে তুলি মানিকতলার খাল,
হটাই জঞ্জাল
রাস্তা ও ফুটপাথ থেকে,
* * * *
এখনও নিতান্ত অকারণে
গঙ্গার কিনারে আছে দ্বিধাগ্রস্ত ভঙ্গীতে যে বাঁক,
চলো, সেই দ্বিতীয় সেতুকে
ঘাড়ে ধরে হাওড়ায় পৌঁছে দিয়ে আসি।'

পুরো অংশ জুড়েই কোলকাতা শহরের অসুন্দরগুলিকে সারিয়ে সুন্দর করার পরিকল্পনা। এর মধ্যে কলকাতার প্রতি কবির ভালোবাসা ধরা পড়েছে—যত অপূর্ণতা জঞ্জাল ক্লেদই জমা থাকনাএই শহরে।

পরের কবিতা 'বেতলা'তেও তিনি প্রসঙ্গক্রমে কোলকাতার কথা বলে নিয়েছেন —

একটু কুট করে
রাত্তিরটা কাটিয়ে তুই কাল সকালে চাঁদোয়া চৌরির
পথে ফিরবি কলকাতা শহরে।

পরের কাব্যগ্রন্থ 'ঘরদুয়ার' (১৯৩৮তে প্রকাশিত)-এও কিছু কবিতায় শহর বা কখনো কোলকাতার উল্লেখ আছে। যেমন —

'ঘরদুয়ার' — কবিতায়

পঞ্চাশের মন্বন্তরে
দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার এক গ্রাম থেকে যে কিনা
এক বস্ত্রে এই শহর দেখতে এসেছিল।

'পুরনো ছবি' কবিতায় ছোটবেলার কোলকাতা প্রসঙ্গে বলছেন —

কিন্তু তারা ফিরে এলেই যে
পুরনো কলকাতার
ছবিটাকে আবার ফেরত পাওয়া যেত,
তাও নয়।

'জয়কালী' কবিতায়ও কবি যে কোলকাতার তা বোঝান। 'এসপ্ল্যানেডে বর্ষার সন্ধ্যায়—

এক নজরে দুজনেই দুজনকে চিনলুম।

অথবা,

যেন জাদুদণ্ডের ছোঁয়ায়
পালটে যায় কোলকাতার মুখছবি।

এই ধরণের পঙক্তি থেকে।

'দশ বিশটা আকাশ' কবিতায়ও তিনি কোলকাতার কথা বলেছেন, —

পাড়াগাঁয়ের মতো
কলকাতারও এখন এই একটা মস্ত সুবিধে।
আকাশ দেখবার জন্যে
শহরটাকে আজকাল আর জানালার শিকে মুখ রেখে
ঘাড় বাঁকিয়ে
উপরে তাকাতে হয় না।

নীরেন্দ্রনাথ বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চলেছেন তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে কিন্তু তাঁর নগর চেতনাও সদা জাগরূক। তাই তাঁর সকল কাব্য-গ্রন্থেই আমরা এমন কিছু না কিছু কবিতা পাই যা শহর সংক্রান্ত। অনেকক্ষেত্রেই অবশ্য শহর বলতে তিনি কোলকাতাকেই বুঝিয়েছেন। যাই হোক না কেন তিনি নিজে অথবা পাঠকেও ভুলতে দেন নি তিনি নগরের কবি। গ্রামের প্রসঙ্গ তিনি কখনো কখনো এনেছেন কিন্তু সেই সঙ্গে এও বুঝিয়েছেন গ্রামের জীবনে ফেরা আর সম্ভব নয়। আমরা আমাদের জীবনযাত্রার প্রণালীতে যেমন সেখানে থেকে দূরে সরে এসেছি, তেমনি সেই জীবনের সহজ মূল্যবোধও হারিয়ে ফেলেছি। তাই এখানেই থাকতে হবে একেই বাসযোগ্য করে তুলতে হবে। একে ভুলতে চাইলেও আমরা তা পারব না। তাই নীরেন্দ্রনাথ নগরকে বিস্মৃত হন নি তাঁর কবিতায়॥

:: সূত্রনির্দেশ ::

১. কবিতার দিকে : কবিতার দিকেও অন্যান্য রচনা : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। রামায়নী প্রকাশ ভবন' প্রথম প্রকাশ ১৯৭৬।

২. নির্বান : নীল নির্জন

৩. আকাঙ্খা তাকে : ঐ

৪. আগস্ট ১৯৬০ : নীরক্তকরবী

৫. অমল গল্প : ঐ

৬. তুমি দেখে নিও : নক্ষত্র জয়ের জন্য

৭. কবিতার দিকে : কবিতার দিকে ও অন্যান্য রচনা : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

৮. ঐ।

৯. চার্লি চ্যাপলিন :

১০. কবিতার দিকে : কবিতার দিকে ও অন্যান্য রচনা : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

১১. যদুবংশ : বিমল কর

১২. কবিতা সমগ্র ২ -এর 'আজ সকালে'র গ্রন্থ পরিচয় অংশ দ্রুটব্য।

****

॥ পঞ্চম অধ্যায় ॥

:: তিন কবি :
একটি তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ ::

সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এই তিন কবি প্রায় সমসাময়িক এবং তিনজনই নাগরিক কবি কিন্তু একথা বলাই বাহুল্য যে তাঁরা কেউ কারো কার্বনকপি নন বরং তিনজনের দৃষ্টি ভঙ্গী স্বতন্ত্র পরিপ্রেক্ষিত রচনা করেছে। অবশ্য নাগরিকতার লক্ষণে কখনো তাঁদের মধ্যে সাজুয্য সৃষ্টি করেছে। অসলে কবিতা কবির ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রের ফসল বলে সময় যেমন এক একজনের মধ্য দিয়ে পৃথক রূপ পায় কবিতায়, তেমনি নাগরিকতা বা অনুরূপ অন্যবোধও।

নাগরিকতা + সমর সেন ক

নাগরিকতা + সুভাষ মুখোপাধ্যায় খ

নাগরিকতা + নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী গ

ক, খ, গ পৃথক হতে বাধ্য নাগরিকতা তিনক্ষেত্রে সাধারণ (common) উপাদান হলেও ওঁদের ব্যক্তি-গত তিনটি স্বতন্ত্র উপাদান। তাছাড়া + চিহ্নটিও সরল সংযোগ বোঝাচ্ছে না। বোঝাচ্ছে এক জটিল ক্রি-য়া প্রতিক্রি-য়া।

সমর সেন তিনের দশকের শেষ দিক থেকে লিখতে শুরু করেছিলেন এবং মাত্র পাঁচটি কাব্যগ্রন্থে খুব অল্প সময়ে তাঁর কবি জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় চারের দশকের গোড়া থেকে আরম্ভ করে এখনো সৃষ্টিশীল। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীও চারের দশকের মাঝামাঝিতে তাঁর কাব্য জীবনের আরম্ভ করেন এবং এখনো লিখে চলেছেন। সমর সেনের কবি জীবনের সংক্ষিপ্ততার বিষয়ে নিয়ে নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করলেও কবি আশ্চর্য নীরব থেকেছেন। মনে হয় এই বিষয়ে তাঁর যা বক্তব্য তা শেষ-কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে।

এই তিনজন কবিই রবীন্দ্রনাথের দ্বারা সেভাবে প্রভাবিত নয় — অন্তত: কবিতাতে। রবীন্দ্রানুকরণ বা বর্জন করার সজ্ঞান প্রচেষ্টা (যা তখনকার কবিদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল) তাঁদের মধ্যে দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে বাংলা কবিতার জগতে কিছু করা কতদূর দুরূহ তা সম্ভবত: তাঁরা অনুভব করেছিলেন ফলে 'কল্লোল' 'কালি- কলম' এর কবিদের মত সেই পথে হেঁটেন নি। তাছাড়াও রবীন্দ্র বিরোধিতার প্রশ্ন ছিল রবীন্দ্র-প্রভাবের নিশ্ছিদ্র পরিমণ্ডলে বাস করার কালে। যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কুমুদরঞ্জন কালিদাস রায়দের অনুকরণের মধ্যে দাঁড়িয়ে রবি-বিদ্রোহী হতে চেয়েছেন মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কল্লোলের কবিরা, নজরুল ইসলাম। ১৯৩৫-এ 'ধূসর পাণ্ডুলিপির' কবি জীবনানন্দের কাছে সোচ্চার রবীন্দ্র বিরোধিতার প্রয়োজন ছিল না, কারণ তিনি ধর্মত: রবীন্দ্রনাথ থেকে স্বতন্ত্র — রবীন্দ্রোত্তর স্বতন্ত্র কাব্যাদর্শের নি:সংশয় প্রতিষ্ঠা তাঁরই হাতে রবীন্দ্র জীবৎকালেই। চার-পাঁচ দশকের কবিরা রবীন্দ্র পরবর্তী পর্যায়ের তাঁদের আর নতুন করে রবীন্দ্র বিরোধিতার যেমন প্রশ্ন ছিল না তেমনি কোথাও কিছু রবীন্দ্র ঐতিহ্য থাকলেও শঙ্কিত হবার প্রয়োজন ছিল না। আর একটি বিষয়ে এঁদের তিনজনের মধ্যে যে মিল দেখা যায় তা হল এই তিন কবির কবিতাতেই নগর বা নাগরিক বৈশিষ্ট্যের নানা স্ফুরণ যেমন দেখা গেছে তেমনি এঁদের কবিতায় গ্রাম বাংলার শান্ত-স্নিগ্ধ রূপাশ্রয়ী কবিতার সন্ধান মেলে না। সমর সেনের কবিতায় গ্রাম নিষ্করুণ ভাবে বিসর্জিত তিনি আদ্যন্ত নাগরিক কবি। এই বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে এক কঠিন শুষ্ক জীবন ভাবনার ছাপ ফেলেছে। রূঢ় বাস্তবতার বোধ তাঁর কবিতার শরীরে জড়ানো। এই বোধ থেকেই তিনি অনুভব করেছেন জীবনে প্রেম-ভালবাসা ইত্যাদি নান্দনিক বোধগুলি নিছক মূল্যহীন অথবা মূল্যের বিনিময়ে কেনা যায়। প্রেমের ছলনা এবং ব্যর্থতাই তাঁর কবিতায় রূপ পেয়েছে। সেই সঙ্গে দীর্ঘশ্বাসও আছে— আর এই দীর্ঘশ্বাস কেবলমাত্র ব্যর্থপ্রেমের জন্য নয় এই দীর্ঘশ্বাস বিগত যুগের সাবলীল প্রেমভাবনার জন্যও। সম্ভবত: এটিই তাঁর রোমান্টিকতার লক্ষণ।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থে প্রেমকে, এমনকী বসন্ত ঋতুকে পর্যন্ত দেশ ছাড়া করছেন। ফুল খেলার দিনও কিছুটা ব্যঙ্গই করেছেন কবিতায়। কিন্তু তিনি যখন এক রাজনৈতিক মনের প্রতি, দেশের প্রতি তাঁর আনুগত্যকে নিয়োজিত করেছেন তখন সেই সূত্র ধরেই অনুভব করেছেন ভালবাসার এক অপ্রতিরোধ্য শক্তিকে। তাই পরের পর্যায়ে তিনি এই ভালবাসাকে বরণ করে নিলেন কবিতায়।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায় প্রেম তার গভীরতর অর্থ নিয়ে দেখা দিয়েছে। বস্তুতঃপক্ষে তাঁর কবিদৃষ্টিতে এমন এক সদর্থকভঙ্গী রয়েছে যা থেকে ভালবাসার ব্যঞ্জনা সহজেই অনুভব করা যায়। সমর সেনের কবিতায় প্রকৃতির কথা আছে তবে তা গ্রাম বাংলার প্রকৃতি নয়। কখনো তিনি শহরের রূপ বর্ণনা করেছেন সেখানে প্রকৃতির মধ্যেও লেগেছে ক্লান্তি আর দীর্ঘ নিঃশ্বাস। তাছাড়া আছে সাঁওতাল পরগণার মহুয়ার গন্ধে ভরা শান্ত রাত্রির কথা, বাউবনের কথা অবশ্য এর মধ্যেও তিনি নগরের হাত বাড়ানোও দেখেছেন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রথমদিকে প্রেম বা প্রকৃতিকে বাদ দিয়েছেন তা আগেই বলা হয়েছে। গ্রাম বাংলা কথা তিনি লিখেছেন কিন্তু তা আমাদের জানা সুজলা সুফলা গ্রাম নয় বরং অত্যাচারে জর্জরিত এবং সংগ্রামে উজ্জ্বল গ্রামের কথা লিখেছেন। অর্থাৎ এইসব গ্রাম, গ্রাম হয়েও নাগরিকতায় আচ্ছন্ন। তাই বিশুদ্ধ গ্রামের কবিতা এদের বলা যাবে না। প্রকৃতির কবিতাও সেই অর্থে তিনি লেখেন নি— নগর জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েই তিনি তা লিখেছেন।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রকৃতি নিয়ে অনেক কবিতা লিখেছেন। সেসব কবিতার মধ্যে কখনো কখনো গ্রামের কথা বলেছেন। তবে সেই গ্রাম সাঁওতাল পরগণার বা অন্য কোন পাহাড়ী অঞ্চলের, বাংলা দেশের নয়। এবং

তাঁর অন্য কবিতার মত প্রকৃতির কবিতাতেও তিনি অন্য দুজন কবির থেকে পৃথক, অনেক কাব্যিক।

সমর সেনের কবিতায় যে দুটি নগরের কথা আছে তা হল কোলকাতা এবং পুরোনো দিল্লী। কোলকাতার কথায় তিনি এই শহরের বিকৃত এবং ক্ষয়গ্রস্ত রূপটিকে দেখেছেন। এই শহরের বিনাস বিভ্রমের মধ্য দিয়ে এর নগ্ন রূপকে দেখেছেন। আর দিল্লী তাঁর কাছে ইতিহাসের সাক্ষ্য হয়ে এসেছে। সেই পুরনো দিনগুলিতে পাপ আর অত্যাচার হয়েছে তারই মাশুল গুনছে এই শহরটি। অর্থাৎ এই দুই নগরীই তাঁকে গভীরতর ক্লান্ত করে তুলেছে তবুও তিনি জেনেছেন এই শহর তাঁর নিয়তি— তিনি একে ছেড়ে যেতে পারবেন না।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় যে কোলকাতা শহর তার পরিপ্রেক্ষিত ভিন্ন। তিনি মিছিলে মিটিং, আন্দোলনে উত্তাল এক শহরকে দেখেছেন। আবার দেখেছেন এইখানকার মানুষের দুঃখ দারিদ্র এবং বঞ্চনা। ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার নগ্ন রূপও দেখেছেন এখানে। আর এই সব কিছু নিয়েই তিনি উচ্চকিত হয়েছেন। কারণ রাজনীতি সারা দেশের হলেও, কোলকাতায় তার রক্তমুখ প্রতিফলন উঘাটিত। ফলে তাঁর নাগরিকতা আর কোলকাতা মিলে গিয়েছে।

নীরেন্দ্রনাথও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোলকাতা শহরের কথা বলেছেন কদাচিৎ কোন বিদেশের শহরের কবিতা লিখেছেন। কিন্তু কোলকাতার কথা বলতে গিয়েও সুর ভিন্ন হয়েছে। বস্তুতঃপক্ষে চারের দশকের অন্যান্য কবির থেকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্যই এর কারণ। রাজনীতি নিয়ে অধিকাংশের মত তিনি মেতে ওঠেন নি। কবিতার মধ্যে তিনি শাশ্বত কোন আবেদন ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন সব সময়। সেই চেষ্টা থেকেই শহরের আপাত রূপ ও মানুষের অন্তরের কোমল মানবিক রূপটি তিনি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন

তাঁর কবিতায়।

নাগরিক কবির কবিতায় রাজনীতি বিষয়টি খুব স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আসে। আমাদের আলোচ্য তিনজন কবির দুজনের মধ্যে তা এসেওছে। সমর সেন বরাবরই রাজনীতি সচেতন। মার্কসবাদে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন এবং এই বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর হৃদয়গত সংযোগও একটা ছিল। কিন্তু তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে সেই আন্দোলন ও ভাবধারাকে শোষণ করে নিয়েছিলেন। অতি ভাবালুতায় তিনি আচ্ছন্ন হন নি। ভাল-মন্দের বিচার করার মত দৃষ্টিভঙ্গী ছিল এবং কখনো কোন অবস্থাতেই তা বিসর্জন দেন নি। তাঁর কবিতার মধ্যে তাঁর সচেতন রাজনীতি জ্ঞানের পরিচয় যথেষ্ট পরিমানে থাকলেও কবিতাকে তিনি কবিতা হিসাবে দেখেছেন রাজনৈতিক সক্রিয়তার অংশ হিসাবে নয়।

সুভাষবাবুর ক্ষেত্রে বলা যায় একসময় তাঁর পরিচয়ই ছিল কমিউনিস্ট কবি হিসাবে। কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পদাতিক সৈনিক ছিলেন তিনি। তাই কবিতার ভাষায় আন্দোলনের স্লোগান এনেছেন এবং পার্টির কর্মী ও জনসাধারণ এই কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে উদ্বুদ্ধ হবে এইরূপ বিশ্বাস পোষণ করেছেন। তাই তাঁর কবিতা লেখা ছিল রাজনৈতিক স্লোগানের অন্তর্গত। পার্টির কর্মপদ্ধতি নিয়ে, অন্যানদেশে কমিউনিস্ট পার্টির বিজয় যাত্রা নিয়ে, সমাজতান্ত্রিক শক্তির ওপর সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অত্যাচার নিয়ে তিনি বহু কবিতা লিখেছেন। আবার যখন দ্বিধা এসেছে তিনি চেষ্টা করেছেন জোর করে পার্টিকে সমর্থন করতে— তারপর একসময় রাজনীতি থেকে সরে এসেছেন তখন এমন কবিতাও লিখেছেন যাতে তাঁর এতদিনের বিশ্বাস ঠুনকো হয়ে গেছে।

নীরেন্দ্রনাথ কবি হিসেবে রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামান নি। রাজনৈতিক ঘটনাবলীর কোন ছাপ তাঁর কবিতায় নেই— সে থেকে তাঁকে আমরা

অ-নাগরিক কবি বলতে পারি না। কারণ নাগরিকতায় এটি একমাত্র শর্ত নয়, এমনকী অত্যাবশকীয় নয়। কবিজীবনের শুরুতে তিনি এশিয়া নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন, সঙ্কীর্ণ অর্থে সেটি তাঁর জীবনের একমাত্র রাজনৈতিক কবিতা। আগেই বলা হয়েছে ঘটমান জীবনের চঞ্চলতা নয়, তার অন্তর নিহিত তাৎপর্যের অনুধাবনেই তিনি লক্ষ্য রেখেছেন।

নাগরিকতার আর একটি বিশেষ লক্ষণ প্রতিবাদ-প্রবণতা— সমর সেন এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়-এর মধ্যে যে তা ছিল তা বলাই বাহুল্য। তাঁদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে শাণিত কবিতাগুলি তো প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতিবাদই; অথবা তাঁদের বাম রাজনীতির কবিতাও তার প্রমাণ। আর নীরেন্দ্রনাথেও তা আছে - আছে বৃহত্তর ক্ষেত্রে মানুষের অমানুষ হয়ে ওঠায়, অন্ধ স্বার্থপরতায়, শহুরেপণার উৎকট প্রকাশে, মানুষের হিংসা-জিগীষায় নীরেন্দ্রনাথের প্রতিবাদী সুর শোনা গেছে। তিনি মানুষের অন্তরকে শুদ্ধ করতে চেয়েছেন— এই শুদ্ধতা কোন ধর্ম বা দলের প্রতি শুদ্ধতা নয়— এই শুদ্ধতা একান্তই মানবিক শুদ্ধতা। যেখানে তার বিচ্যুতি দেখেছেন সেখানেই তাঁর প্রতিবাদী সুর শোনা গেছে— হয়তো সেই সুর উচ্চগ্রামে বাঁধা নয় কিন্তু তা অযোঘ।

এই তিন কবির কবিতার আঙ্গিক নিয়ে বলতে গেলে বলা যায় সমর সেন গদ্যছন্দের কবি। এবং এই ছন্দ একান্তভাবে তাঁরই সৃষ্টি এবং অননুকরণীয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর কবিতা ছোট কিন্তু নিটোল। অবশ্য শেষদিকে কিছু কবিতায় প্রথাসিদ্ধ ছন্দ ব্যবহার করেছেন সেখানেও তিনি সফল।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবিজীবনের শুরুতে বরণীয় হয়ে উঠেছিলেন তাঁর ছন্দ বৈচিত্র্যের জন্য। ছন্দশব্দ মিল নিয়ে তিনি কবিতাকে স্ব বর্নাঢ্য করে তুলেছিলেন। এই সিদ্ধি যেন কবির জন্মগত, যখনই যে ছন্দ লিখেছেন তাতে পাঠকের কানকে তিনি মুগ্ধ করতে পেরেছেন।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রচলিত ছন্দেই বেশী কবিতা লিখেছেন। কবিতায় সুষমা বিস্তারের দিকে তাঁর নজর রয়েছে তাই তার কবিতা সুখপাঠ্য। বাহুল্য নয় সহজভাবেই তিনি কবিতায় আবেদনীর সৃষ্টি করেছেন যা অন্য দুই কবির মধ্যে নেই।

এই তিন কবি নাগরিক চেতনায় এক থেকেও স্বতন্ত্র ভাবদ্যুতি বিস্তার করেছেন তাঁদের কবিতার মধ্যে। ব্যক্তিত্ব, অনুভবে তাঁরা যেহেতু আলাদা মানুষ তাই তাঁদের কবিতা আমাদের কাছে আলাদা রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, আলাদা মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলেছে। যে নগরচেতনা তাঁদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য সেই চেতনাও তিনজনের চৈতন্যকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জাগ্রত করেছে॥

****

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

অরুণ সেন । ১৯৮৫। 'কবিতার দায় কবিতার মুক্তি'। কলিকাতা, প্রতিক্ষণ।

অশ্রুকুমার সিকদার । ১৯৭১ । 'আধুনিক কবিতার দিগবলয়'। কলিকাতা, সিগনেট। ১ম সংস্করণ - ১৯৭৪।

অশ্রুকুমার সিকদার । ১৯৯১ । 'নবীন যদুর বংশ'। কলিকাতা, প্যাপিরাস।

অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত দ্বিতীয় খন্ড । ১৯৮৩। কলিকাতা, মর্ডান বুক এজেন্সি।

জীবনানন্দ দাস । ১৯৮৫ । 'কবিতার কথা' । সিগনেট।

জীবেন্দ্র সিংহ রায় । ১৯৮৬ । 'আধুনিক কবিতার মানচিত্র'। কলিকাতা, দেজ।

দীপ্তি ত্রিপাঠী । ১৯৭৭ । 'আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়'। কলিকাতা, দেজ প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৫।

পরিমল চক্রবর্তী । ১৯৮৮ । তিরিশ পরবর্তী বাংলা কবিতার দিকচিহ্ন । কলিকাতা, প্রতিভাস।

ড. প্রদীপ কুমার মুখোপাধ্যায় । বাংলা কাব্যে পল্লী কবিতার ধারা । ১৯৯১। পুস্তক বিপণি।

বুদ্ধদেব বসু । ১৯৫৯। 'কালের পুতুল'। কলিকাতা, নিউ এজ। প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৪।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ,। ১৯৭৬ 'কবিতার দিকে ও অন্যান্য রচনা'। কলিকাতা, রামায়ণী প্রকাশ ভবন।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী । ১৯৮৯ । কবিতার ক্লাশ'। কলিকাতা, অরুণা প্রকাশনী। প্রথম প্রকাশ, ১৯৭০।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী । ১৯৯০ । কবিতা সমগ্র ১ । কলিকাতা, দেজ।

প্রথম প্রকাশ, ১৯৮২।

। ১৯৮৫ । কবিতা সমগ্র ২ । কলিকাতা, দেজ।

সুমিতা চক্রবর্তী । ১৯৮৭ । জীবনানন্দ সমাজ ও সমকাল । কলিকাতা,

সাহিত্য লোক।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় । ১৯৯৩ । কবিতার বোবাপড়া । কলিকাতা, আনন্দ ।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় । ১৯৯২ । কবিতা সংগ্রহ - ১ । কলিকাতা, দেজ।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় । ১৯৯৩ । কবিতা সংগ্রহ - ২ কলিকাতা, দেজ।

সমর সেন । ১৯৮৯ । 'কয়েকটি কবিতা'। কলিকাতা, অনুষ্টুপ ।

প্রথম সংস্করণ : ১৯৩৭ ।

। ১৯৮৯ । 'গ্রহণ' । কলিকাতা, অনুষ্টুপ।

প্রথম সংস্করণ : ১৯৪০।

।১৯৮৯ । 'নানাকথা'। কলিকাতা, অনুষ্টুপ, । প্রথম সংস্করণ :

১৯৪২।

। ১৯৮৯ । খোলাচিঠি । কলিকাতা, অনুষ্টুপ । প্রথম সংস্করণ,

১৯৪৩।

। ১৯৮৯ । তিন পুরুষ'। কলিকাতা, অনুষ্টুপ । প্রথম সংস্করণ,

১৯৪৪।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় । এক আলোর শিল্পীর হাহাকার : প্রসঙ্গ নীরেন্দ্রনাথের কবিতা । সাহিত্য ও সংস্কৃতি । শ্রাবণ - আশ্বিন, ১৩৯৬।

প্রদ্যোত সেনগুপ্ত । কবি প্রসঙ্গ : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী । সাহিত্য ও সংস্কৃতি মাঘ - চৈত্র - ১৩৯২।

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় । অন্বেষণের কবি নীরেন্দ্রনাথ । সাহিত্য ও সংস্কৃতি : শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮০।

অলোক রায় । সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও বাংলা কবিতা । সাহিত্য ও সংস্কৃতি : শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭৭।

অখিল মজুমদার । জনচেতনার কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় । সাহিত্য ও সংস্কৃতি মাঘ-চৈত্র, ১৩৯৫।

অখিল মজুমদার । জনচেতনার কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় । সাহিত্য ও সংস্কৃতি : কার্তিক-পৌষ, ১৩৯৫ ।

সুরজিৎ ঘোষ । সময়ের জাল এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায় । প্রমা : অক্টোবর, ১৯৮৩ ।

শঙ্খ ঘোষ । ফুল ফুটুক না ফুটুক । সারস্বত : কার্তিক, ১৩৭৫।

কার্তিক লাহিড়ী । সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা । চতুষ্কোন : সমাবর্তন সংখ্যা, ১৩৬১।

পবিত্র মুখোপাধ্যায় । সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা । রক্তকরবী : অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৯১।

Invites you to Subhash Mukhopadhyay / Sahitya Akademi/

12 August -- 1989.

Samar Sen / Indefence of the 'Decadents / - অনুষ্টুপ সমর সেন সংখ্যা (পৃ: ২৫)

A modern poet, But not progressive : Dhurjati Mukherjee.

--- অনুষ্টুপ সমর সেন বিশেষ সংখ্যা (পৃ: ১২)

প্রেমেন্দ্র মিত্র । সমর প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা । অনুষ্টুপ সমর সেন বিশেষ সংখ্যা,

পৃ : ৫।

অশোক মিত্র । সমর সেন প্রসঙ্গে (একটি কথপোকথন । ঐ । পৃ : ১২১।

অরুণ মিত্র । কবি সমর সেন । ঐ । পৃ : আলোচনা - ৩ ।

শঙ্খ ঘোষ : । নিঃশব্দতার ছন্দ । ঐ । পৃ : ১৪।

রণজিৎ গুহ । শান্তি নেই । ঐ । পৃ : ২১।

অমিয় কুমার বাগচী। সমর সেন ও ভারতীয় বুদ্ধিজীবির সমস্যা । ঐ । পৃ : ৪১।

মালিনী ভট্টাচার্য । অবক্ষয়ের কবিতা না কবিতার অবক্ষয় : সমর সেনের

কবিতা ও একটি বিতর্ক । ঐ । পৃ : ৬০ ।

Buddhadeva Bose / An acre of green grass / A Review of

Modern Bengali Literature, 1948.

R. Palme Dutta / India To-day / 1979 / Manisha -Calcutta.

****

****